হিন্দু কলেজ

ও

উনিশ শতকের বাংলার সমাজ

মনোতোষ চক্রবর্তী

সুবর্ণরেখা
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
১৯৭৯

ইন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক সুবর্ণরেখা ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড কলিকাতা ৭০০০০৯ হইতে প্রকাশিত ও শান্তিরাম দত্ত কর্তৃক মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস ৭০ নং ডাবলিউ সি ব্যানার্জী স্ট্রিট কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদপট : বিমল মজুমদার

নিবেদন

পরম শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় এই দুরূহ গবেষণা কর্ম সমাপ্ত করিতে পারিলাম।

হিন্দুকলেজের দিকপালদের বিশেষত ইয়ংবেঙ্গলদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর তথা ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতিতে আধুনিকতার প্রবর্তন ও পুষ্টি হয়। তাই কলিকাতার হিন্দুকলেজ নূতন ভাব ও নবতর জীবনবোধের পীঠস্থান। হিন্দুকলেজ সম্পর্কিতদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত প্রভাবের ঐতিহাসিক যথার্থ মূল্যায়নের প্রয়াস পাইয়াছি। বাঙালীর সমাজ সংস্কৃতিতে তাহাদের অবদান অবিস্মরণীয় এবং বর্তমান অবক্ষয়ের যুগেও তাহাদিগকে মুক্তির দিশারী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বরং বর্তমান বাঙালী জাতীয় জীবনে তাহাদের আদর্শ-নিষ্ঠা ও আদর্শ রূপায়ণের প্রচেষ্টার অনুসরণে আশার সঞ্চার হইবে।

সে-যুগ ছিল আধুনিকতার প্রস্তুতিপর্বের যুগ। প্রস্তুতিপর্বে সামাজিক সাংস্কৃতিক আলোড়নই হয় অধিক, ফলে প্রকৃত সাহিত্যিক অবদান হয় সীমিত। বস্তুতপক্ষে এই প্রস্তুতিপর্ব আধুনিক সাহিত্যের পথ প্রস্তুতির কাল। সুতরাং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে নব্যযুগের সাহিত্যের পথ প্রস্তুতির কর্মে তাহাদের বিশেষত্ব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সূচীপত্র

ভূমিকা

হিন্দু কলেজ ছিল একান্তভাবেই বঙ্গীয় হিন্দুদের শিক্ষাকেন্দ্র। কলিকাতার এই হিন্দু কলেজ হইতেই বাংলা তথা ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতিতে আধুনিকতার প্রবর্তন ও পুষ্টি হইয়াছিল। আধুনিকতার রূপায়ণে হিন্দু কলেজের দিকপাল ছাত্রদিগের বিশেষত ইয়ংবেঙ্গলদের প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুইভাবেই ক্রিয়াশীল হইয়াছিল। আরও স্পষ্টভাবে বলিলে আধুনিক জীবনের প্রস্তুতিপর্বে এই ইয়ংবেঙ্গলরাই ছিলেন পাশ্চাত্য ধারার নূতন চিন্তা, নবীনভাব ও নবতর জীবনবোধের পথিকৃৎ।

ভারতীয় জীবনে আধুনিকতার সূত্রপাতের দিনপঞ্জী লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন মতের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন, "On June 23, 1757, the middleages of India ended and her modern age began."[১] তিনি মুখ্যত পলাশী যুদ্ধের দ্বারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাগ্য পরিবর্তনের সহিত ভারতের ভাগ্য পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী যোগসূত্রের কথা চিন্তা করিয়া এবং তাহার পরিণতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই উক্তি করিয়াছেন। আবার ভারতীয় তথা বাংলার সমাজের ভূমি রাজস্বের নবরূপদানের মধ্য দিয়া শেরশাহ, আকবর, জাহাঙ্গীরের সময় হইতেই মধ্যযুগীয় সমাজ 'মুদ্রাগত অর্থনীতির' দ্বারা পরিবর্তিত হইতেছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন।[২] আবার সামন্ত-সমাজ ব্যবস্থা যে বাস্তব ও মানসিক উভয়ক্ষেত্রেই ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছিল এই যুগেই তাহারও দৃষ্টান্ত কেহ কেহ দিয়া থাকেন।[৩] কেহ কেহ আবার কর্ণওয়ালিসের সময় হইতেই অথবা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের স্থাপনার সময় হইতেই আধুনিকতার পদযাত্রার কথাও বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ রাজা রামমোহন রায়ের কলিকাতায় স্থায়ীভাবে অবস্থানের সময় অর্থাৎ ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দ হইতেই আধুনিকতার কালারম্ভ বলিয়া মনে করেন। বিমানবিহারী মজুমদারের ন্যায় কোন কোন ঐতিহাসিক আবার মারাঠাদের পরাজয়ের কাল হইতেই আধুনিক যুগারম্ভের কথা বলিয়া থাকেন।[৪] প্রত্যেকেই আপন তত্ত্বের গুরুভার চাপাইয়া এই সকল সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে ঠিকই বলিয়াছেন, "ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়।" দুই দেশের বা দুই পরিবেশের একধরনের ঘটনার মধ্যে ঠিক একই কারণের সমাবেশ, কিংবা একই প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে এমন সত্যিই বাস্তব ইতিহাসে দেখা যায় না। তথাপি কারণ ও ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও কতকগুলি মূল বিষয়ের বা ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সাদৃশ্যের সন্ধান হয়তো পাওয়া স্বাভাবিক। সমাজ-জীবনে কখনই এমন অবস্থা দেখা যায় না যখন পুরাতনধারা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া যায় এবং নূতনধারা পূর্ণরূপে আরম্ভ হয়। জীবনের বহুমুখী ধারাগুলির কখনও কোন একটির প্রয়োজন

শেষ হইয়া গিয়া ক্রমে প্রায় অজানিতভাবেই নূতনের পথ করিয়া দিয়া অপসৃত হয়। ইহার প্রকৃতপক্ষে কোন সঠিক সাল-তারিখ হয় না। কারণ অপ্রত্যাশিত আমূল পরিবর্তন মানবসমাজে ঘটে না বলিলেই চলে। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখা যায়, পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকদের প্রত্যেকের কথনের মধ্যেই কিছু যুক্তি আছে। সমাজের পরিবর্তন একএকটি বিষয়ে আরম্ভ হইয়াছে বহুপূর্বেই – কিন্তু শুধুমাত্র ঐ কারণটিই সমাজের মধ্যে মধ্যযুগকে দূরে সরাইয়া দিযা আধুনিকতার প্রবর্তন করিয়াছে বলিলে সত্যের অপলাপই হইবে। মধ্যবিত্তের জন্মের প্রমাণ মোঘল রাজত্ব কেন, খিলিজি আমলেও পাওয়া যায়। আবার পলাশীযুদ্ধের পর পঞ্চাশ বৎসরেও বাংলার সমাজব্যবস্থায় কোনও আমূল পরিবর্তন আসিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে। কারণ আধুনিকজীবনে যে সচেতনতা মানুষের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজন— সেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সম্পূর্ণ অন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী পলাশী যুদ্ধের বহু পরেও বাংলায় দেখা যায় নাই। কিন্তু একথাও সত্য যে পলাশী যুদ্ধের পর মোঘল আমল ও নবাবী যুগের অন্ত হইয়া পরিবর্তনের দিগন্ত উন্মুক্ত হইয়াছিল।

বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশেষত হিন্দুদের মধ্যে ঐ শ্রেণীর বিকাশের সূত্র পাওয়া যায়, স্পষ্টভাবে মুর্শিদকুলি খাঁর আমল হইতেই। মুসলমান ইজারাদাররা রাজস্বের তছরূপ করিতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে মুর্শিদকুলি খাঁ হিন্দুদের জমিদারি ইজারা দিতে লাগিলেন এবং বহু রাজকর্মে হিন্দুদের নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ফলে এই সময় হইতে হিন্দুসমাজের কুলগত বৃত্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা গেল। যেমন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি বিচক্ষণ কর্মচারী নূতন জমিদার হইয়া বসিতে লাগিল, তেমনি আবার ব্রাহ্মণ রঘুনন্দনের সুদক্ষ কর্মচারী তিলি জাতির দয়ারাম দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিল। এইভাবে সমাজে কৃতিত্বমুখী ব্যক্তিত্বেরও বিত্তভিত্তিক মর্যাদালাভের মধ্য দিয়া কুলবৃত্তিগত প্রথায় ভাঙন দেখা দিল। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও প্রসার হইল। ইংরাজ আগমনের পরেও হিন্দুদের ব্যক্তিগত বিত্তের নিশ্চিন্ত ভোগাধিকারের সুযোগ রইল। ইংরাজের অধীনেই কৃতিত্বমুখী হিন্দুদের প্রসার হইতে লাগিল। কলিকাতা নগরীতে বিভিন্ন কর্মের সন্ধানে নানা শ্রেণীর মানুষের দ্রুত আগমন হইতে লাগিল। পূর্বে মুসলমান রাজত্বে, হিন্দুর বিত্তের সন্ধান পাইলেই তাহা নবাবের অত্যাচারে হস্তচ্যুত হইবার ভয় ছিল। ইংরাজ রাজত্বে সেই ভীতি রহিল না। বিত্ত অর্জনের উদ্দেশ্যে হিন্দুদের নগরমুখীনতা অধিক হইল। সমাজ বিন্যাসেও আসিল পরিবর্তন। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার কোন কোন কারণের সূত্র পূর্বতন শতাব্দীতে দেখা যাইবেই। কিন্তু তাহা ছিল সমগ্র সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নগণ্য এবং সমাজস্তরে ভাসমান, অগভীর।

ইংরাজ আগমনের পূর্বেও বাংলায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ হইয়াছিল পাল রাজত্বে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে এবং মুসলমান রাজত্বে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে।

সমাজের ধর্মীয় অসাম্য কিঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া এই ভাবগত জাগরণ শুরু হইয়া যায়। তাহা সামাজিক গঠনের ও মানসিক গড়নের বিশেষ পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ হিন্দুদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজ-গঠন ও মানসিক বা ভাবগত অবস্থায় প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিয়া সমাজ-জীবনে আমূল পরিবর্তন আনিয়া দেয়। ধনাঢ্য হইবার আকাঙ্ক্ষাই শেষ অবধি বাঙালি জীবনে আনিয়া দেয় শিক্ষার উদ্যোগ। এই শিক্ষা ইংরাজি শিখিবারই আকাঙ্ক্ষা। সুপ্রিম কোর্ট হইবার পর হইতে দেশীয়দের ইংরাজি শিখিবার প্রয়োজন ও আগ্রহ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সময়ের ইংরাজি শিক্ষার অর্থই ছিল কিছু সংখ্যক ইংরাজি শব্দ মুখস্থ করা এবং তাহার দ্বারা সাহেবদিগের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করা। বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত সকলেই ইংরাজি শিক্ষার প্রসারের জন্য আগ্রহী হইয়াছিল। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এই বিষয়ে মোটেও আগ্রহ ছিল না। ১৮১৩ সালের সনদে কোম্পানি শিক্ষাখাতে এক লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিলেও তাহা প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার জন্যই নির্ধারিত হইয়াছিল।

ইংরাজি শিক্ষার জন্য আগ্রহের পাশাপাশি দেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষায় অগ্রণী তাঁহারা হিন্দুধর্মের আচার সর্বস্বতা লইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। রামমোহন রায় কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন ১৮১৪ সাল হইতে। ইহার বহুপূর্বেই হিন্দুধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার সর্বস্বতা লইয়া তাঁহার মনে সংশয় ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইসলামধর্ম ও খ্রীস্টধর্মের অনেকাংশে সংস্কারমুক্ত ভাবধারা তাঁহার চিন্তাজগতে পরিবর্তন আনিতে ছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই। তিনি হিন্দুধর্মের এই আচার সর্বস্বতার জন্য দায়ী করিলেন শাস্ত্র সম্পর্কে দেশীয় পণ্ডিতদের অজ্ঞতা ও বহু দেবদেবী সর্বস্ব হিন্দু পৌত্তলিকতাকে। ১৮১৫ সালে কলিকাতায় আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি একেশ্বরবাদী মতে উপাসনা ও সামাজিক কুসংস্কার লইয়া আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেন, অনেকাংশে অতি ঘনিষ্ঠদের সহিত ঘরোয়াভাবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও রামমোহনের প্রচেষ্টার পূর্বেও হিন্দু ধর্ম সংস্কারে একেশ্বরবাদীতার ক্ষীণ প্রভাব পড়িয়াছিল। রামরাম বসু ধর্মকে সম্পূর্ণ বিসর্জন না দিয়া অর্থাগমের জন্য খ্রীস্টধর্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন বাইবেল অনুবাদ, খ্রীস্ট স্তোত্র প্রভৃতি বাংলায় রচনা করিয়া। পৌত্তলিকতার প্রতিবাদেও তিনি রামমোহনের অগ্রণী ছিলেন। তিনি যে ব্রহ্মোপাসনার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, 'লিপিমালা' পুস্তকের ভূমিকায় (১৮০২)—

"সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।"[৫]

রামমোহন তখনও এই বিষয়ে কিছু লেখেন নাই বা প্রচার করেন নাই। অর্থাৎ পাশ্চাত্য সংস্পর্শে সমাজ পরিবর্তন অতি ক্ষীণভাবে হইলেও আরম্ভ

হইয়াছিল। সচেতন ব্যক্তিরা তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে সাড়াও দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল ধর্মীয় দ্বন্দ্ব সমাজজীবনে তখনও বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কারণ সমাজবন্ধনে মধ্যযুগীয় প্রভাব কলিকাতার নাগরিক জীবনে সেকালেও স্পষ্ট ও শক্তিশালী ছিল। রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণ সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনা করেন ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের পর। কিন্তু সে সম্পর্কে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮১৭ সালেই সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারপতিকে সংস্কৃত ভাষায় যাহা জানাইয়াছিলেন তাহার সারমর্ম এইরূপ—

"চিতারোহণ অপরিহার্য্য নয় – ইচ্ছাধীন বিষয়মাত্র। অনুগমন এবং ধর্ম্মজীবন যাপন –এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্ত্তে না।" রামমোহন রায় তাঁহার এই মতামত আপন পুস্তিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৬]

আধুনিকতা অনেকাংশেই মনের ব্যাপার, বিদ্যা-বুদ্ধিজাত চেতনা ও উপলব্ধির ব্যাপার। মনোজগতে ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেশীয়দিগের মধ্যে নবজাগরণের লক্ষণ বিশেষ স্পষ্টরূপে তখনও দেখা যায় নাই। কলিকাতার নাগর-আভিজাত্যে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় সুশিক্ষিত রুচিমান লোক বিশেষ ছিল না বলিলেই চলে। এই সময় ডেভিড হেয়ার নামে স্কটল্যাণ্ডের এক ঘড়ির ব্যবসায়ী দেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হন। তাঁহার আধুনিক, যুক্তিনিষ্ঠ, মানবপ্রেমী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভারতের ভাগ্য পরিবর্তনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা লইয়া তিনি রামমোহনের সহিত আলোচনায় উদ্যোগী হন। কিন্তু ধর্ম-সংস্কারক রামমোহন ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ায় এবং বেদান্ত ধর্মভিত্তিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টার কথা বলায় আধুনিক মনস্ক ডেভিড হেয়ার অগত্যা দেশীয় রক্ষণশীলদের মধ্যে যে অর্থকরী প্রলোভনে ইংরাজি শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল তাহাই কাজে লাগাইলেন। ক্রমে দেশীয়দের প্রচেষ্টাতেই তাঁহার ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিকল্পনা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে ২০. ১. ১৮১৭ তারিখে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা। হেয়ার নিজে কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথমাবস্থায় হিন্দু কলেজের কার্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন না। ভারতপ্রেমী হেয়ার সাহেব আজীবন হিন্দু কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। রাজা রাধাকান্ত দেব ও ডেভিড হেয়ারকে বাদ দিয়া হিন্দু কলেজের বিষয় চিন্তা করাই যায় না।

ইংরাজদের মধ্যে অন্তত তিনজনকে বাঙালিরা কখনই ভুলিতে পারিবে না আধুনিকতার রূপায়ণে তাঁহাদের অতুলনীয় অবদানের কথা স্মরণ করিয়া। ইহারা

হইলেন ডেভিড হেয়ার, জন ইলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন ও পাদ্রি লং সাহেব। হেয়ার ও বেথুন প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে ও বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেথুন সাহেবের অবদান স্মরণীয়। হিন্দু কলেজকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনিয়া ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বসাধারণের জ্ঞান আহরণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিবার প্রচেষ্টার রূপকার ছিলেন বেথুন। পাদ্রি লং সাহেব ভারতীয়দের হিতার্থে কারাবাস অবধি করিয়াছেন। হেয়ার তাঁহার সর্বস্ব দান করিয়া যান বাংলার মানুষের সেবায়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া তিনি নিঃস্ব হইয়াছিলেন। এরূপ দান দেশীয়দের মধ্যেও অনেকে করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিকতার প্রবর্তনে তাহা হেয়ারের তুলনায় অতি সীমিত। মানুষের মুক্তিই আধুনিকতার বাণী এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই আধুনিক সচেতন ব্যক্তিত্বের সকল প্রকার সংগ্রামের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। ভারতে দেশীয়দের মধ্যে ইয়ংবেঙ্গলদের কথা ছাড়িয়া দিলে আর কেহই সক্রিয়ভাবে দাস-প্রথার বিলোপের জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই। মানবপ্রেমীর সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু মানুষের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতিদানের বাণী সম্পূর্ণ আধুনিক। করুণা বা দয়া নহে, ন্যায় বিচারের মধ্য দিয়া অধিকারবোধের সঞ্চারের দ্বারাই ব্যক্তিত্বের মর্যাদাদান সম্ভব বলিয়াই সেকালে হিন্দুদের মধ্যে এই বিষয়ে উদাসীনতার ভাব পরিলক্ষিত হইত। ইহা ইচ্ছাকৃত হীনতা নহে—মধ্যযুগীয় মূল্যবোধের প্রাধান্যের জন্যই মানব মর্যাদাবোধ সমাজ মানসে সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। ডেভিড হেয়ার সম্পূর্ণভাবেই পূর্ব সংস্কারমুক্ত ছিলেন। ১৮৩৮-এর পূর্বেই তিনি মরিশাস ও অন্যান্য দ্বীপে দেশীয় দরিদ্রদের প্রলোভিত করিয়া এবং কখনও জোর করিয়া কুলিরূপে চালান দিবার বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এই উদ্দেশ্যে (১০. ৭. ১৮৩৮) তারিখে কলিকাতার টাউন হলে জনসভা হয় এবং সরকার প্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধান কমিটির হস্তক্ষেপে কুলিমজুর সংক্রান্ত একটি আইনও পাশ হয়। দরিদ্র দেশীয়দের সেবার প্রচেষ্টায় হেয়ার একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমগোত্রীয়। শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী হইয়াছিলেন একদিকে রক্ষণশীলদের সহায়তায়, অপরদিকে রামমোহনপন্থীদের সংস্কার কর্মে উৎসাহদাতারূপে। তাঁহার আধুনিক ব্যক্তিত্বের স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে ডিরোজিয়ানদের সর্বকর্মে সহযোগিতার মধ্য দিয়া। ডিরোজিও বর্তমানে এবং ডিরোজিওর মৃত্যুর পরেও তিনি ছাত্রদের স্বাধীন জ্ঞানচর্চা, সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় ছিলেন সক্রিয় সহায়ক। ১ ৫. ১৮২৬ তারিখটি হিন্দু কলেজের ইতিহাসে একটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত দিন। হিন্দুকলেজ এইদিন সংস্কৃত কলেজের নবপ্রতিষ্ঠিত গৃহে স্থানান্তরিত হইয়া সংস্কৃত কলেজকেও প্রভাবিত করিয়া হিন্দুদের মধ্যে সংস্কার মুক্তির সূচনা করিল এবং ভবিষ্যৎ ভারতের পরিবর্তনের ছন্দে অতি দ্রুতলয়ের সঞ্চার করিল—হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও নামে এক বাংলাদেশে জাত ফিরিঙ্গি কবি বিদ্রোহী প্রতিভাকে শিক্ষকরূপে নিয়োগ

করিয়া। ডিরোজিও ভারতবর্ষকেই মাতৃভূমিরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার কবিতাই প্রথম স্বদেশি কবিতার স্বীকৃতি পাইবার যোগ্য। তিনি তাঁহার 'ক্রীতদাসের মুক্তি' (Freedom to the slave) কবিতায় সকল বন্ধন হইতে ও সংস্কার হইতে মুক্তির কথাই বলিয়াছিলেন। সকল প্রকার ব্যক্তিক ও সামাজিক বন্ধন হইতে মানুষের মুক্তির স্বপ্ন তিনি আজীবন দেখিয়াছেন। তাঁহার সংস্কারমুক্ত আধুনিক মন সকল পূর্ব-সংস্কারকেই প্রশ্নদ্বারা যাচাই করিয়া লইয়া যুক্তির মাধ্যমে গ্রহণের বেকনীয় পন্থার শিক্ষা দিয়াছে ছাত্রগণকে। এই প্রশ্নবাণ জর্জরিত ও যুক্তিনির্ভর বিচার হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্বও রক্ষা পায় নাই। হিন্দু সংস্কার, আচার-আচরণ, ধর্ম, সামাজিক প্রথা, রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুই ইহার কবলে পড়ায় সমাজ মানস আমূল নড়িয়া উঠিল। ডিরোজিওর ধর্মই ছিল সত্যের প্রতিষ্ঠা করা এবং ভাবে ও কর্মে সত্যের অপলাপ প্রতিরোধ করা। ছাত্রদিগকেও তিনি নিজ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যতীত সংবাদপত্রে 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিল। পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ বলিয়াছিলেন, ডিরোজিওর সভায় ছাত্রগণ সর্ববিষয়েই নির্ভীক চিত্তে সংস্কারমুক্তভাবে প্রকাশ্যে আলোচনা করিতেন। এই আলোচনায় স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করিয়া এবং কপটতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিতে গিয়া তারুণ্যের আতিশয্যে তাঁহারা ব্যক্তির সামাজিক প্রতিষ্ঠার সংস্কার ভাঙিয়া প্রকৃত স্বরূপটি প্রকাশ করিয়া দিতেন। ফলে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজে ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হয় এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি মাত্রই মিথ্যাচারের দায়ে কঠোরভাবে সমালোচিত হইতে থাকেন। ডিরোজিওর ছাত্রগণ রামমোহনের রাজনৈতিক মতবাদেরও সমালোচনা করেন। মিশনারিদের সমালোচনাও চলিতে থাকে পূর্ণমাত্রায়। ডিরোজিও রক্ষণশীলদের রোষে হিন্দু কলেজ হইতে বিতাড়িত হন এবং শীঘ্রই মৃত্যু তাঁহাকে গ্রাস করে। তাঁহার যোগ্য শিষ্যগণ কিন্তু পুরোদমে আধুনিকতার জয়যাত্রা চালাইয়া যান। পরবর্তী শতাব্দী এই জয়যাত্রারই ইতিহাস। অতঃপর আধুনিকতার জয়যাত্রা গদাইলস্করি চাল ছাড়িয়া তুরগ গতি প্রাপ্ত হয়। 'কৃতিত্বমুখী ব্যক্তিবর্গ' পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্জন করিয়া পুরাতন সামাজিক মর্যাদাবোধের পরিবর্তন সাধন করেন। এই সচেতন, স্বতন্ত্রবাদী ব্যক্তিগত কৃতিত্ব সমাজে বিত্তবান ও জাতিমর্যাদা প্রাপ্তদের সমকক্ষতার দাবিতে মুখর হইয়া উঠে। ফলে মধ্যবিত্তের প্রাধান্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিদ্যা ও বিত্ত সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ড হইয়া উঠে। বাংলাদেশে নবজাগরণের সূচনা হয় নূতন বিদ্যা ও বুদ্ধির অনুশীলনের মাধ্যমে। এই অনুশীলনের পথেই ভারতে পাশ্চাত্য ভাবধারা, জীবনদর্শন, রাজনীতি, মূল্যবোধ ও মানসিকতার সহিত দেশীয় ঐতিহ্যের সংঘাত ও সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশে ও বিস্তারে সমাজে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই দ্বন্দ্বের স্বাক্ষর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল হিন্দু কলেজের অঙ্গনেই।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলার নব জাগৃতি বা রেনেসা

মোঘল যুগের অরাজক অবস্থার অবসান করিয়া ভারতে সর্বপ্রথম সুশৃঙ্খল ইংরেজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় বাংলার নাগরিকগণ সর্বাগ্রে উন্নত ইংরেজ সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজ সৃষ্ট নূতন জমিদার গোষ্ঠী ইংরেজদের সঙ্গে ইজারা ও অন্যান্য ব্যবসায় সম্পর্কের (ঋণ দান ইত্যাদি) মধ্য দিয়া বিত্তশালী হইয়া ওঠেন এবং সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হন। ইহা ছাড়া পাশ্চাত্য বিদ্যালাভ বিশেষত ভাষা শিক্ষার মধ্যদিয়া ইউরোপীয় সংস্পর্শে আসিয়া বিভিন্ন উপায়ে প্রভূত বিত্তলাভ করিয়া সমাজে বিশিষ্ট স্থান লাভ করে মধ্যবিত্তশ্রেণী। এই উভয় শ্রেণী বঙ্গীয় সমাজে এক নূতন শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। ইহারা কিন্তু মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সামন্ত অভিজাতদের ন্যায় সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। ইংরেজ শক্তির স্বার্থরক্ষার জন্য মুখ্যত সৃষ্টি হইলেও উন্নত ইংরেজ সমাজ ব্যবস্থার বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যমে জানিয়া (যেমন আইনের চক্ষে সবাই সমান, রাজাও স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না, ব্যক্তি সত্তার পূর্ণস্বীকরণ, নির্বিঘ্নে স্বীয় অর্জিত বিত্ত লইয়া থাকিবার অধিকার ইত্যাদি) এবং সর্বোপরি যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে ইহাদের ভূমিকা হইল অনেকাংশেই ইউরোপীয় (Reformation Leader) সংস্কারকামী নেতাদিগের ন্যায়। বিশেষত ডিরোজিও ও ডেভিড হেয়ার প্রভাবিত গোষ্ঠীতো পাশ্চাত্য নবজাগরণের নেতাদিগের ন্যায় পন্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু ইহাদের সামাজিক নেতৃত্ব লাভের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তৎকালীন অতিমাত্রায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রায় অধঃপতিত (ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল) দলপতিগণ। ইহাদের সৃষ্ট অসংখ্য বাধানিষেধের নাগপাশে আবদ্ধ তৎকালীন সমাজে ব্যক্তির প্রাণ হইয়াছিল ওষ্ঠাগত ; ব্যক্তিসত্তা, স্বাধীন চিন্তা, উন্নত শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমনকি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিল রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ দিগের কুক্ষিগত। এই সামাজিক অসহনীয় অবস্থায় নূতন বিত্তশালী পাশ্চাত্য শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর কাহারও কাহারও বিদ্রোহ ক্রমে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করিতে থাকে।

তদুপরি, দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুর হইতে উইলিয়াম কেরী ও মার্শম্যানের নেতৃত্বে মিশনারীগণ হিন্দু পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের কাজে লাগেন। বিভিন্ন বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়া হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনার আরম্ভ হয় এবং শাস্ত্রের নির্দেশাদি সর্বসাধারণের গোচর হইতে থাকে।

কেরী প্রভৃতি খ্রীস্টান মিশনারীগণ ব্যতীত ভারতীয়দিগের প্রায় সকলেই ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) প্রভাবে প্রভাবান্বিত এবং মানবতাবোধের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। ক্রমে বাংলার নূতন অভিজাত ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর অনুগামী দল প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিলেন। রামমোহন রায়ের নবধর্মীয় ভাব বিদ্রোহে সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের সংগ্রাম এবং সর্বোপরি ডিরোজিও এবং তাঁহার অনুগামী ইয়ংবেঙ্গলদের মানা বিভিন্ন ধারার বিপ্লবাত্মক সংগ্রামে বঙ্গীয় সমাজ সংস্কৃতিতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র কর্তৃক নব ভাববাহী সুশৃঙ্খল আধুনিক ভাষায় কাব্য, কাহিনী ও প্রবন্ধের সৃষ্টি হইতে থাকে, যাহাতে পাশ্চাত্যের রস আস্বাদনে জনগণের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয় এবং সমাজে স্বভাবতই পরিবর্তন আনে। দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি নাট্যকারগণ সামাজিক-রাজনৈতিক অন্যায়ের প্রতি জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ইংরেজ রাজ্যের দৃষ্টির পরিবর্তন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নব্য হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচারে সার্থক উপন্যাসের সৃষ্টি করেন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নব হিন্দু-মানবতাবাদী – চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টির মাধ্যমে ও ক্রমে রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া নূতন নূতন ভাব ও আদর্শ, অভিনব সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলার নবজাগরণ এক গভীর ও ব্যাপক সংগ্রামে পরিণত হয়।

বিদ্রোহাত্মক, ধর্মসংশয়ী ভাবধারার ও নব জাতীয়তার ভাবে উদ্বুদ্ধ ডিরোজিওর অনুগামীগণের মধ্যে এই মুক্তিবাণীর যাদুস্পর্শে বাংলায় দীর্ঘকালের সুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায়। প্রথমাবস্থায় হিন্দুসমাজের সবকিছুই বর্জন করিয়া যুক্তিবাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে তাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজের সবকিছুই একমাত্র সত্য ও আদর্শ হিসাবে বরণ করিতে লাগিলেন ।

তৎকালীন অনগ্রসর সমাজের সহিত সামঞ্জস্যহীন হওয়ায় এই প্রচেষ্টায় পরে ক্রমে দেখা দেয় সমন্বয়-বাদ নূতন ও পুরাতনের সমন্বয় সাধন। ধর্মে গোঁড়ামি ও ধর্ম-হীনতার স্থানে হয় উদারতার প্রভাব। এই নব নব চিন্তা ও আদর্শ সামাজিক রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টাকে নিম্নরূপে ভাগ করা গেল :–

১। **ধর্মীয় মিশনারীদের প্রয়াস :**—মিশনারীদের দ্বারা বাংলাদেশে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের চেষ্টার অনুসঙ্গরূপে ছাপাখানা স্থাপিত হইয়া বাইবেলের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। দেশীয়দিগের মাধ্যমে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত এবং শাসনকার্যে অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা ও দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার চেষ্টা এই যুগের একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য প্রয়াস।

২। **ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভের যুগ :**—ডেভিড হেয়ার কর্তৃক বহু 'বাংলা স্কুল' প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণশীল বিত্তবানদের সাহায্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ডেভিড হেয়ার, বিচারপতি ইষ্ট হাইড, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির উদ্যোগে 'হিন্দু কলেজ'

প্রতিষ্ঠা করা হয়। ডেভিড হেয়ার দ্বারা 'হেয়ার স্কুল' স্থাপিত হয় (১৮১৮) শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা বহু 'বাংলা-স্কুল' এবং ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে 'শ্রীরামপুর কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য দানের উল্লেখ করিতে হয়। তিনি ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। 'স্কটিশ এডুকেশনাল মিশন' ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে 'স্কটিশ চার্চ কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন।

এই যুগে রামমোহন রায়, উইলিয়ম কেরীর কর্তৃত্বে বিভিন্ন প্রকার পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করা হয়। ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির সহযোগিতায় স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী ও শ্রীরামপুর মিশনারী প্রভৃতির প্রচেষ্টায় কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রকাশ এই যুগের বিশেষ উল্লেখণীয় প্রয়াস।

৩। সমাজ সংস্কারের যুগ : রামমোহন রায় কর্তৃক সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের সূচনা ও জন সচেতনতার প্রয়াসে সংবাদপত্র, পুস্তক প্রণয়ন, সভা-সমিতি, গণ-আবেদন পত্র পেশ এবং ইংরেজ শাসকগণের দ্বারা আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা হয়। ইয়ংবেঙ্গলরা এই কর্মে জোয়ার আনিয়া দেয়। ফলে এই সময় হইতে ইয়ংবেঙ্গল কর্তৃক ব্যাপক শিক্ষা-প্রসার, স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা বিবাহের আন্দোলন, বহু বিবাহ আন্দোলন ও বাল্যবিবাহ নিবারণ আন্দোলন ও বাল্য-বিবাহ নিবারণ আন্দোলনের প্রচেষ্টা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক আইন প্রণয়ন ও সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়া এই যুগের সামাজিক আন্দোলনের রূপ অনেকাংশেই গণআন্দোলনে পরিণত হয়। এইসব আন্দোলনের বাদ-প্রতিবাদের মাধ্যমে জনগণের মনে শাস্ত্র ও পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে যে মোহ ও ভীতি ছিল তাহা অনেকাংশেই মন্দীভূত হয় এবং পরে রাজনীতিক আন্দোলনের মোহমুক্তির সন্ধান দেয়।

৪। নব হিন্দুবাদ :—খ্রীস্টধর্মের প্রবল প্রচারের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুদের যুগ্ম প্রয়াসে ও ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে নব হিন্দুবাদের অভ্যুদয় এই সময়ের এক বিশেষত্ব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধর্মীয় ভাবধারার সমন্বয়ের ভিত্তিতে উদার নব হিন্দুবাদের অভ্যুদয় হয়। ইহার মূল কথা 'বিশ্বজনীনতা, মানবতা ও গণ আবেদন'। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব শ্রীবিকাশের সুযোগ আনিয়া দেয়।

৫। জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক আন্দোলন :—১৮৫১ সালে ইয়ং-বেঙ্গল, রক্ষণশীল হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত 'বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন' ১৮৬১ সালে রাজনারায়ণ বসুর প্রচেষ্টা, নবগোপাল মিত্র রাজনারায়ণ বসু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে 'দেশপ্রেমিক সঙ্ঘ (Patriots' Association) প্রতিষ্ঠা, ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে নবগোপাল-রাজনারায়ণ-বসু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ-

দ্বিজেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'চৈত্র মেলা' বা 'হিন্দুমেলা'; আনন্দমোহন বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়—প্রথম 'ছাত্র সমিতি'। 'ভারত সঙ্ঘ' (Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হয়-১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী-আনন্দমোহন বসু—দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী-সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা। এই সঙ্ঘের দ্বারা ধারাবাহিক ভাবে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে 'মুদ্রণ আইন' 'অস্ত্র আইন', ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে 'ইলবার্ট বিল' আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৮৮৩-৮৪ খ্রীস্টাব্দে 'জাতীয় তহবিল' গঠনের আন্দোলন হয় এবং শেষ অবধি ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে আহূত নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলন (All India National Conference) প্রচেষ্টার অনুরূপ প্রয়াস ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে চলিতে থাকায় ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দেও বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গেই দেখা দেয়—কংগ্রেসের আন্দোলনের ধারাবদল—বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ।

ধর্ম ও সমাজ সংস্কার ক্ষেত্রে: ব্রাহ্ম ও আর্য সমাজ: রামমোহন রায়কেই বলা যায় সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথম সচেতন পথ প্রদর্শক। সতীদাহ প্রথা নিবারিত হয় তাঁহার জীবদ্দশায়। তাঁহার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত ব্রাহ্ম ধর্ম গোষ্ঠী তত্ত্ববোধিনী সভার মাধ্যমে 'বিধবা বিবাহ', 'বাল্যবিবাহ নিবারণ', 'বহু বিবাহ নিবারণ', 'অসবর্ণ বিবাহ', 'স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি প্রচেষ্টায় ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত সহযোগিতা করিয়া (এমন কি মিশনারী--দের সহিতও মিলিত হইয়া) সার্থকতা অর্জন করেন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বিশেষত ইহাদের প্রচেষ্টাতেই অসবর্ণ বিবাহ স্বীকৃতি লাভ করে। ১৪ বৎসরের কম বালিকা ও ১৮ বৎসরের কম বালকের বিবাহ নিষিদ্ধ হয় (সারদা আইন) যে কোন বয়সের হিন্দু বিধবাদের বিবাহের অধিকার দেওয়া হয় এবং কয়েকটি শর্তে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারও স্বীকৃত হয়। ব্রাহ্মরা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অগ্রণী পথিকৃৎ।

ব্রাহ্ম সমাজের কথা বাদ দিলে পাঞ্জাবের মহাপণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী দ্বারা আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠার সার্থক প্রয়াসকে স্মরণ করিতে হয়। ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব নাগরিক আবেষ্টনীতেই আবদ্ধ ছিল—কিন্তু আর্য সমাজের প্রভাব উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং বর্তমানেও বেশ দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা আর্য সমাজের গণভিত্তি বহুগুণ অধিক। ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে। সম্পূর্ণরূপে বেদের ভিত্তিতে (নব ব্যাখ্যানের দ্বারা হইলেও) ইহার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা ছিল অনেকাংশেই উত্তর ভারতের হিন্দু জনসাধারণের বিশ্বাস ও ঐতিহ্য সম্মত। এবং ইহার আদর্শও ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ হইতে জনসাধারণের নিকট অধিকতর সহজবোধ্য। শিক্ষা প্রসারে বিশেষত বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে আর্য সমাজের অবদান উল্লেখণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়া মানবীয়

(humanism) ধর্মের ভিত্তিতে যে নব হিন্দুধর্মের রূপ ব্যাখ্যা করেন – তাহাই শিক্ষিত হিন্দু সমাজকে প্রভাবিত করে। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ এই মতবাদের ভিত্তিতেই চিকাগোয় সভার আন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলনে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া ভারতীয়দের সম্মুখে নব আদর্শবাদের নিদর্শন স্থাপন করেন। "মানবতার সেবাই ঈশ্বরের সেবা, প্রকৃত ধর্ম"। বিবেকানন্দের দুঃস্থ ও পীড়িতদের প্রতি সহানুভূতি হইতেই দেশপ্রেমের ভাবধারা জাতীয় জাগরণে সহায়তা করে।

উন্নত শিক্ষার বিস্তার :—উন্নত ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য অভিজাত ও নবগঠিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর আগ্রহই প্রধানত ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করে। এইসঙ্গে সরকারী ও সওদাগরী অফিসের কাজে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক দেশীয় নিযুক্তিতে আর্থিক দিক দিয়া কোম্পানীর লাভ হয় বলিয়া ইংরেজ সরকারও ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের কর্মে উদ্যোগী হন। ইংরেজী শিক্ষার মারফত ভারতীয়গণ বিদেশী দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, প্রভৃতির বিরাটত্বের সন্ধান পান এবং নিজেরা ইহা দ্বারা লাভবান হইয়া ক্রমে স্বদেশীয় কৃষ্টি বিকাশের প্রচেষ্টায় নিয়োগ করেন।

এই প্রচেষ্টায় একদিকে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের প্রচেষ্টা এবং অপরপক্ষে ডেভিড হেয়ার, রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব ইত্যাদির প্রচেষ্টায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কর্ম আরম্ভ হয়। ফলে সর্বপ্রথম হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে; শ্রীরামপুরের ইংরেজী কলেজ হয় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে। হেয়ার স্কুল হয় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে। এইভাবে প্রথমে বহু স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার বাহিরেও এই প্রচেষ্টা চলে বোম্বাইতে এলফিনস্টোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে, উইলসন স্কুল ও কলেজ হয় ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে। মাদ্রাজে ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথমে এই প্রচেষ্টায় সরকারী হস্তক্ষেপ ও সহায়তা অধিক হওয়ায় স্কুল কলেজের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনটি বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন এই কর্মে এক বিরাট পদক্ষেপ।

নূতন ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম :—বাংলার নবজাগরণের পূর্বকাল প্রধানত পয়ার কবিতার সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ। মধ্যযুগের সীমিত প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এর 'পয়ার কবিতা' যথেষ্ট ছিল। তাই গদ্যের প্রয়োগ বিশেষ দেখা যায় নাই। কিন্তু নবজাগরণের বিদ্রোহে আবেগের নির্মুক্তির পন্থা হয় নানাবিধ এবং পাশ্চাত্যের সাহচর্যের সঙ্গে পুরাতন জরাজীর্ণ অষ্টাবক্র বাংলা ভাষা সম্পূর্ণ নূতনভাবে গড়িয়া উঠে, এই প্রচেষ্টার প্রয়োজনে ফার্সী আরবী প্রভাব সঙ্কোচন করিয়া অনেকাংশে বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ণ হয় এবং পাশ্চাত্য রীতি ও প্রয়োগ বিধিও বাংলাকে নবভাবে শক্তিশালী করে। বাংলা ভাষা সম্পূর্ণ নব সাজে সজ্জিত হইয়া আধুনিক প্রয়োজনসিদ্ধ সাবলীল স্বচ্ছতা লাভ করে।

বাংলা ভাষার গোড়া পত্তনের যুগ :—শ্রীরামপুর খ্যাত মিশনারী উইলিয়াম

কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একটি গোষ্ঠীকে লইয়া বাংলা ভাষার পাঠ্য পুস্তক রচনায় অগ্রসর হন। তিনি স্বয়ং বাংলা ব্যাকরণ (Bengali Grammar) (১৮০১), বাংলা অভিধান (১৮২০), কথোপকথন (Book of Dialogue (১৮০১), প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) প্রচার করেন। তাঁহার সহযোগী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু প্রভৃতি স্বাধীন গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা করেন। রামমোহন রায় ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, বাংলা পদ্যে সমালোচনা ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি দিলেন, এবং ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে সাপ্তাহিক পত্র সংবাদ কৌমুদী প্রকাশ করেন বাদানুবাদের জন্য। ইংরেজী ব্যাকরণের অনুকরণে বেঙ্গলী গ্রামার ও পরে "গোষ্ঠীর ব্যাকরণ" লিখিলেন। এই গ্রন্থের ভাষা অনেকাংশেই সাবলীল।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে দৈনিক সংবাদপত্র প্রভাকর প্রকাশ করেন। ইহার মাধ্যমে প্রথম যুগের বঙ্গীয় শিক্ষিতগণ সাহিত্য সাধনা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় এই পত্রিকার মাধ্যমে মাতৃভাষা চর্চা করেন।

এই সময় প্রতিষ্ঠিত ইয়ংবেঙ্গলদের 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা', 'Society for the Promotion of the Bengali Language and Learning', দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তের তত্ত্বাবধানে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নানাবিধ বিষয়ে—ধর্ম, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য সমাজ নীতি, রাজনীতি বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে—বাংলা ভাষার জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত করেন। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার প্রয়াসও উপেক্ষণীয় নয়। ইহার উদ্দেশ্যই ছিল ক্রমে বিভিন্ন জ্ঞানের বিস্তৃতিকরণ অনুবাদের মাধ্যমে এবং বাংলাভাষার উৎকর্ষ সাধন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুসংস্কৃতির মূল বিষয় লইয়া বিভিন্ন গবেষণামূলক কর্ম করিয়া শেষ অবধি তাঁহার অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ডক্টরেট (অনরারী) হন।

দ্বিতীয় যুগ, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ :—এই যুগের পর রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'বর্ণপরিচয়', প্রভৃতির কথা স্মরণ করিতে হয়। বাংলা গদ্য আপন ছন্দ সম্বন্ধে ও মাহাত্ম্য যেন হঠাৎ সচেতন হন।

হিন্দু কলেজের ডিরোজিও প্রবর্তিত ছাত্রগোষ্ঠীর নবজাগরণের ভাবধারায় বঙ্গীয় সমাজে আনে আমূল পরিবর্তনের ধাক্কা। এই গোষ্ঠীর প্যারীচাঁদ মিত্র কথ্য ভাষায় রচনা করেন বাংলার প্রথম নকসা জাতীয় উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সমাজের সহজ সরল সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের বোধগম্য এক নূতন ভাষা প্রয়োগের প্রয়াস পান। 'মাসিক পত্রিকা' তাহারই ফল

স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) রচিত হয় সম্পূর্ণ কথ্য ভাষায়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস ও সমালোচনা সাহিত্য সৃষ্টির নূতন পদ্ধতির ধারা প্রবর্তন করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস ও আদর্শ প্রবন্ধ সৃষ্টির প্রয়াস পান।

হিন্দু কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত নবজাগরণের বিদ্রোহের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সাহিত্য ও ভাষায় প্রচলিত রাজনীতি ও ধারণার বিরুদ্ধে পরীক্ষা চালাইলেন এবং ফলস্বরূপ আবিষ্কৃত হইল অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ভাষার বেড়ী ভাঙ্গিয়া গেল – ভাবের সহজ মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইল। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কাব্য সাহিত্যে বিপ্লব আনিয়া দিল। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' – ভাষারও মুক্তি হয় নব ছন্দে। 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) প্রথম আধুনিক বাংলা নাটকের পথ প্রদর্শন করে। বাংলা ভাষায় প্রথম ট্রাজেডিরূপে তাঁহার রচিত 'কৃষ্ণ-কুমারী'-কেই গণ্য করা হয়।

সমাজের অধঃপতিতরূপ লইয়া সৃষ্ট হয় 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা'। সমাজ সচেতনতা ও সাহিত্যিকের শিল্প সচেতনতার অদ্ভুত নিদর্শন এই দুইটি প্রহসন। এখন অবধি এই দুইটি নবজাগরণের যুগের সাহিত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাস্তববাদী নাট্য সাহিত্য সাধনার পথ ধরিয়া দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেন 'নীল দর্পণ'। এই গ্রন্থ শুধুমাত্র ভারতেই নয় ইংলণ্ডে অবধি রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সৃষ্টি করে এবং সরকার বহু নীতি সংশোধনে প্রয়াসী হন। এই যুগেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার উপন্যাসাবলী রচনা করেন। গদ্য ও উপন্যাস সাহিত্যের দিক পরিবর্তিত হয়। সামাজিক উপন্যাসেও রোমান্টিকতার ক্রমে মাত্রা কমিয়া পৃথিবীর মাটির কাছাকাছি হইবার প্রয়াস দেখা যায়। রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস স্মরণীয়।

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমের মাসিক পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদর্শনই বাংলা ভাষায় প্রথম সাংস্কৃতিক পত্রিকা। ইহার মাধ্যমেই মানবতাবাদী নব হিন্দুধর্ম ও স্বদেশ ভক্তির নূতন আদর্শের প্রকাশ করেন কমলাকান্তের চরিত্রায়ণের চেষ্টায়। 'আনন্দমঠ' ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হয়। 'বন্দেমাতরম' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হয়।

সমগ্র ভারতবর্ষে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মারাঠী, তামিল, অসমীয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য ও নবজাগরণের তরঙ্গে উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। ভারতীয় সাহিত্যের ও নব সভ্যতার উদ্ভব হইল।

মধ্যযুগের গলিত ও নিষ্পিষ্ট ভারতবর্ষের মুক্তি হইল অগ্রসরমান আধুনিক ভারতের মধ্যে।

* * * *

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ভূমিকা ও ইতিহাস ঃ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র

ইউরোপীয় সংস্পর্শে শিল্প বিপ্লব ও ইংরাজের রাজ্যবিস্তারের মধ্য দিয়া আধুনিকতার উদ্বোধন হয় বাংলায়। নবজাগরণের সূত্রপাত হইবার পূর্ব হইতেই সামাজিক জীবনে স্বপ্নের দ্বারা পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং ফলে পুরাতন সব কিছুই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব যুগকে রাজনারায়ণ বসু যেভাবে দেখাইয়াছেন তাহাতে হিন্দু ও সাহেবদিগের সম্পর্ক যে মধুর ও লাভদায়ী ছিল তাহা স্পষ্ট বুজিতে পারা যায়। "সেকালের সাহেবরা অর্ধেক হিন্দু ছিলেন।...পূর্বে মুসলমানেরা এই ভারতবর্ষকে আপনাদের গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের অনুরাগ এইখানেই বদ্ধ থাকিত। ইংরেজের আমলের প্রথম সাহেবরা অনেক পরিমাণে ঐরূপ ছিলেন।

রাজনারায়ণ সাহেবদিগের এদেশীযদের প্রতি সামাজিক সৌজন্যবোধের কথাও বলিয়াছেন। ফলে বাঙালীদিগের (সুবিধাপ্রাপ্ত) বিশ্বাস ও কৃতার্থতাবোধ ইংরাজ অনুসারী হইতে উৎসাহ দেয়। সমাজে সম্মান অর্জনের পন্থা বিত্ত ও বিদ্যা-লাভের মধ্যযুগীয় প্রথার অনেকাংশেই অবসান হইয়া পূর্ব কুল-জাতি-বিত্ত ভিত্তিক প্রতিষ্ঠার মূল পরিবর্তন হয়; ইংরাজী জ্ঞান যতই হাস্যকর ও সীমিত হউক না কেন তাহাই উন্নতির সোপান বলিয়া ধার্য্য হইল। পূর্বেই বিষয়ীদিগের মধ্যে ফারসী ও আরবী বিদ্যার প্রভাবে মুসলমান রাজত্বে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ অল্প সংখ্যক হিন্দুমনের মধ্যে স্বল্পবিস্তর সন্দেহাকুলতা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যাহার পরিচয় রামরাম বসু ও রামমোহন রায় জাতীর হিন্দুদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায় হিন্দু সামন্তদিগের মধ্যে। ইংরেজের ভাগ্যোদয়ে কলিকাতা অঞ্চলের চতুর হিন্দুদিগের মধ্যে পলাশী যুদ্ধের সময় হইতেই ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকর্ষণের কথা জানিতে পারা যায়।[১] দেওয়ান রামকমল সেন ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত তাঁহার ইংরেজী বাংলা অভিধানে লিখিয়াছেন যে ১৭৭৪ সালে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইবার কাল হইতেই ইংরাজী ভাষা জ্ঞান সম্বন্ধে দেশীয়দিগের প্রয়োজনবোধ ও ইচ্ছার উদ্রেক হয়।[২] তিনি সে কালের ইংরেজী শিক্ষার চমৎকার বিবরণ দিয়াছেন। তখন দেশীয়দিগকে ইংরাজী শিখাইতেন ইংরেজ অ্যাটর্নি ও অ্যাডভোকেটের বাঙালী কেরানীগণ। তাঁহারা একজন খাতায় বহু ইংরেজী শব্দ লিখিয়া লইতেন এবং তাহাদ্বারা কোনক্রমে ইংরেজী দরখাস্ত লিখিতে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তাহাদের বিদ্যা প্রকৃতপক্ষে একখানি **Spelling Book** ও **Word Book**-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহারা বিদ্যালয়

স্থাপন করিয়া বাঙালী ছাত্রদিগের মাসিক ৪ টাকা হইতে ১৬ টাকা বেতনে শিক্ষা দিতেন। ইহাদের মধ্যে রামরাম মিত্র সম্বন্ধে রামকমল সেন লিখিয়াছেন, "Was the first who made any considerable progress in the English language"৩

এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার দ্বারাই বাঙালীরা ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরি, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী ইত্যাদি কর্মে প্রভূত অর্থলাভের দ্বারা ভাগ্যবান হইয়া উঠেন। তাই ইংরেজী বিদ্যায় প্রায় নিরক্ষর নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ (১৮১৪) ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল যখন দৃপ্ত বিশ্বাসে ঘোষণা করেন, 'ইংরেজী শিক্ষা ব্যতীত ভারতবর্ষের অভ্যুদয়ের উপায় নাই' এবং নিজের যথাসর্বস্ব বহিবাংলায় বারাণসীতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য (ভারতে সর্বপ্রথম সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশীয় ভাষাদি শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে) বিলাইয়া দেন — তখন আমরা বিস্মিত বোধ করিতে পারিনা স্বাভাবিক কারণেই।

সেকালের হিন্দু বিত্তবানদিগের শিক্ষা

সেকালের বিত্তবানদের সন্তান প্রথমে গুরুমহাশয়ের নিকট বাংলা অর্থাৎ সংস্কৃত-সর্বস্ব-বাংলা শিক্ষা করিত। তাহাও অতি নিম্নস্তরের মান সম্পন্ন ছিল। তৎপর মুনসীর নিকট শিখিত ফারসী এবং সবশেষে সাহেবদের নিকট ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিত। এই ইংরাজী শিক্ষা অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত পন্থায় কিছু ইংরাজী শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়া সব বিদ্যালয়েই প্রায় একই পদ্ধতি অনুসারিত হইত। নামতা শিখিবার ন্যায় ঘোষা-পদ্ধতিতে সেই শিক্ষার অন্ত হইত। সর্বজন বিদিত রাজনারায়ণ উল্লিখিত ছড়াটি মনে পড়িয়া যায় :—

"পমকিন্ লাউকুমড়ো কোকোম্বর শশা।
বিঞ্জেল বার্তাকু, প্লোমেন চাষা।"

এই শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা মানের দিক হইতে প্রায় সকল সাহেবী ও দেশীয় বিদ্যালয় সমগোত্রীয় ছিল। তাহা হইলেও কলিকাতার কয়েকটি সাহেবী বিদ্যালয়ের মান সত্যই উন্নত ছিল। শেরবোর্ন, ধর্মতলা অ্যাকাডেমি (ড্রামণ্ডের বিদ্যালয়), ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি হইতে সেকালের ভাগ্যবান বাঙালী ও ইংরেজদের সন্তানেরা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। শেরবোর্নের স্কুল ছিল উত্তর কলিকাতায় চিৎপুর অঞ্চলে। কথিত আছে তাঁহার মাতা ছিলেন দেশীয় ব্রাহ্মণ কন্যা। শেরবোর্ন কড়ায় গণ্ডায় গুরুদক্ষিণা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। স্বনামধন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন শেরবোর্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র।

ড্রামণ্ড সাহেব ছিলেন খাঁটি স্কচ সাহেব। একগুঁয়ে দুর্ধর্ষ হইলেও তিনি ছিলেন দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞানে বিচক্ষণ পণ্ডিত। পিঠে একটি কুঁজ থাকিলেও উন্নত বলিষ্ঠ মনের মালিক ছিলেন বলিয়া তাহার পরিচিত কেহই তাঁহাকে ভুলিতে পারিত তিনি ছিলেন স্বাধীন চেতা ও প্রগতিপন্থী। সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া,

মানবিক রুচি বিকৃত না করিয়া আত্মতৃপ্তি ও আত্মবিকাশের জন্য ইচ্ছানুযায়ী চলার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে ড্রামণ্ড ছাত্রদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দিতেন। ডঃ জন গ্র্যাণ্ট তাহার বিদ্যালয়ের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "এর জন্য কৃতিত্ব কেবল ছাত্রদিগের প্রাপ্য নহে, শিক্ষকেরও প্রাপ্য"।[৪] তাঁহার বিদ্যালয়ের কেবল বিদ্যাদানই হইত না—ছাত্র দিগের মধ্যে বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রেরণা জাগরিত করা হইত। তাঁহার বিদ্যালয়ে দেশীয় ও ইউরোপীয় ছাত্রগণ পাশাপাশি বসিয়া শিক্ষা-লাভ করিয়া বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইতে পারিত না। হিন্দুকলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এইরূপ দুই একটি বিদ্যালয় আধুনিক শিক্ষার কিছু অবিন্যস্ত প্রচলন করিতেছিল। কিন্তু ইহাও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সম্পূর্ণ আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যালয় সমূহের অনুযায়ী ছিল না। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের কৃতিত্ব বিষয়ে কোন একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী জাতি সরকার বা দেশীয় নেতাদের একক প্রাপ্য নহে। বিভিন্ন কারণ ইহার পথ প্রশস্ত করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় ধারা

প্রাচীন হিন্দু ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় ছাত্রগণ বিদ্যা অর্জন করিত দুই প্রকার জ্ঞানের জন্য :—

১। অপরা জ্ঞান। অর্থাৎ আধিভৌতিক বা জাগতিক বিদ্যা।

২। পরাজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক বিদ্যা। ইহা ভগবৎ উপলব্ধির জন্য অর্থাৎ আত্মার মুক্তি কামনা করিয়া করা হইত। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল "আত্মোপলব্ধি"—'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'।

প্রাচীন বিদ্যালয়ের উদ্ভব হয় প্রধানতঃ বৌদ্ধপ্রভাবে। ব্রাহ্মণ্যশিক্ষা ছিল গুরুকেন্দ্রিক শিক্ষা। বৌদ্ধদিগের সংঘারাম যেমন ছিল গণতান্ত্রিক—শিক্ষাও তেমনি অনেকাংশে রাষ্ট্রপ্রভাব মুক্ত, গোষ্ঠীগত, সঙ্ঘরাম কেন্দ্রী। তাই বৌদ্ধ যুগেই দেখা যায় তক্ষশিলা, বারাণসী, কাঞ্চীপুরম (মাদ্রাজ) নবদ্বীপ, (বাংলায়), নালন্দা, বিক্রম-শীলা ইত্যাদি কেন্দ্র। শিক্ষা কেন্দ্র বারাণসী, নবদ্বীপ হিন্দু গুরু প্রধান ছিল। নবদ্বীপ কেন্দ্র সেন-রাজাদিগের দ্বারা স্থাপিত হয় ১০৬৩ খ্রীস্টাব্দে (আনুমানিক)। ইহা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। পাঠ্য ছিল বেদ-বেদাঙ্গ এবং ষড়দর্শন—বিশেষ করিয়া গুরুত্ব দেওয়া হইত ন্যায় দর্শন শিক্ষার উপর। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে N. H. Wilson নবদ্বীপের শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে ২৫টি টোল বাঁশের বেড়ায় তৈয়ারী। গুরু ঐস্থানেই থাকিতেন এবং উহা শ্রেণী পাঠের জন্য ব্যবহৃত হইত। পার্শ্বেই মাটির দেওয়াল দেওয়া কয়েকটি ঘর শিক্ষার্থীদিগের বাসের জন্য। নদীয়ার রাজার সাহায্যেই শিক্ষক, ছাত্র, সকলের ব্যয় চলিত। প্রতি টোলে ২০।২৫ জন ছাত্র ছিল। কিন্তু গুরু খ্যাতিমান হইলে ৫০ জন অবধি হইত। অবশ্য ছাত্রাগমন

নেপাল, ত্রিহুত ও আসাম হইতেও হইত। ব্যবসায়ী ও জমিদারগণও টোলের ব্যয় নির্বাহের জন্য সহায়তা করিত।

মুসলমান যুগে ভারতের শিক্ষা

দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণের আরম্ভ হইতেই শিক্ষায়তন ও ভারতীয় গ্রন্থের ধ্বংস পর্ব চলিয়াছিল। ক্রমে উগ্রতা মন্দীভূত হইলে বিশেষত বাংলায় হুসেন শাহের রাজত্বকাল হইতেই বাংলা শিক্ষার প্রভাব বর্দ্ধিত হয়—সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ চলিতে থাকে মুসলমানদিগের উৎসাহেই।

বাবর স্বীয় জীবনীতে ভারতবর্ষে মাদ্রাসার অভাব সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবাসীরা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও পশ্চাদপদ ছিল বলিয়া লিখিয়াছেন।

আকবর নিরক্ষর হইলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকাংশেই ধর্মান্ধতা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সাজাহান ও ঔরঙ্গজীবের সময় শিক্ষা প্রায় ধর্মকেন্দ্রিক ছিল।

মিশনারী প্রচেষ্টায় শিক্ষা ১৮১৩ সাল অবধি

১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দ অবধি ইষ্টই ণ্ডিয়া কোম্পানী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভাবেই ভারতে শিক্ষা সংক্রান্ত কোন কর্মেই হাত দেয় নাই। ১৬৯৮ সালে নিয়ম হয় যে প্রতি কারখানায় এবং ৫০০ টনের অধিক ভারবহনক্ষম জাহাজে একজন করিয়া ধর্মযাজক রাখিবেন এবং এই মিশনারীগণ কর্মচারীদিগকে স্থানীয় শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেন। এই মিশনারীগণ দেশীয়দের মধ্যে ধর্ম প্রচারে সচেষ্ট হন কিন্তু কোম্পানী মিশনারীদিগের ধর্মপ্রচার কার্যে অধিক উৎসাহ দিতেন না। কারণ, তাহাদের ভয় ছিল যে দেশীয়গণ বিরূপ হইতে পারে এবং ফলে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু তথাপি মিশনারীদিগের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য কেন্দ্র করিয়াই এদেশে শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা আরম্ভ হয়।

১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে রেভাঃ স্টিভেনসন প্রতিষ্ঠা করেন ৪টি চ্যারিটি স্কুল। ১৭১৭ সালে দিনেমার মিশনারীগণ ১টি পর্তুগীজ ও ১টি তামিল শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতায় ১৭১৮ সালে রেভাঃ রিচার্ড কেব্‌ল একটি চ্যারিটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৭৩১ সালে খ্রীস্টিয় শিক্ষাবিস্তার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চারিটি স্কুল স্থাপিত হয়।

এই সব শিক্ষায়তনে কোম্পানীর ইউরোপীয় ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের সন্তানই অধিক ছিল। শিক্ষাক্রম প্রধানতঃ লিখিতে ও পড়িতে সক্ষম হওয়া ও গণিত সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান এবং খ্রীস্টধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান দানের মধ্যেই সীমিত ছিল। এ সকল বিদ্যালয় কিন্তু বদান্য ব্যক্তিদিগের দানে এবং কোম্পানীর বরাদ্দ সাহায্যে স্থাপিত ও পরিচালিত হইত। ১৭৭২ সালে আরও কয়েকটি চ্যারিটি স্কুল স্থাপিত হয়। কিন্তু এদেশীয়দিগের মধ্যে ইউরোপীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য অধিক প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ানী সম্পদ লাভ করিয়া পূর্বতন শাসক সম্প্রদায়ের প্রথা অনুযায়ী এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদিগের শিক্ষা অর্জন উৎসাহ প্রদর্শনে কোম্পানী অগ্রসর হয়।

১৭৮১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এদেশীয় বিচার ব্যবস্থায় ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে বিচার করা হইত বলিয়া ভারতীয়দিগের মধ্যে অসন্তোষের ধুঁয়া দেখা দেয়। তাই এ দেশীয় আইন কানুন অনুযায়ী বিচার চালাইবার ব্যবস্থা করা হয়, প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই। ইহারই ফলে ১৭৮১ সালে কলিকাতায় মাদ্রাসা ও ১৭৯১ সালে বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতেও ভারতীয়দিগের দানই অধিক। বিচারালয়ের কার্যে সাহায্যের জন্য পণ্ডিতদিগের প্রয়োজন হইয়া পড়িল সাহেবদিগকে নির্দিষ্ট অংশটি বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং স্বভাবতই পণ্ডিতদিগকেও কিঞ্চিত আপন সুবিধার্থে ইংরেজী জানিতে হইল। ইংরাজী চর্চার প্রয়োজন ও উৎসাহ পূর্বে উল্লেখিত রামকমল সেনের মত অনুযায়ী ঐ সময় বিশেষভাবে দেখা যাইতে লাগিল। বাঙালী কেরানীদিগের সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পর্তুগীজ বা দিনেমার মিশনারীদিগের ন্যায় ইংরেজ মিশনারীগণ কিন্তু শিক্ষা প্রসারের প্রয়াসে সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই কোম্পানীর বিরোধিতায়। কোম্পানীর মতবাদের বিশেষ পরিবর্তন কার্যত দেখা যায় নাই। পর্তুগীজ ও দিনেমারদিগের প্রচেষ্টায় ১৭১৩ সালে তামিল ভাষার ছাপাখানা প্রবর্তিত হয় এবং ১৭১৬ সালে ত্রিবাঙ্কুরে শিক্ষক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

ইহারও অনেক পরে বাংলাদেশে কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ প্রটেষ্টাণ্ট মিশনারীগণ শ্রীরামপুরে ১৭৯৩ সালে কর্মারম্ভ করেন। ১৮০৬ সালে জুলাই মাসে দক্ষিণ ভারতে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ হইলে তাহা ইংরাজরা অদ্ভুত ও নির্মমভাবে দমন করিলেও মিশনারীদিগের ধর্মপ্রচারের বিষয়ে আরও অধিক ভীত হয় এবং প্রতি পদে বাধার সৃষ্টি করিতে থাকে। তথাপি ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকজন ইংরেজ ধর্মপ্রচারকের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

প্রথমেই ক্যাপ্টেন জেমস স্টিওয়ার্ট-এর নাম করিতেহয়। তিনি এদেশীযদিগের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন, পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন এবং কুসংস্কার দূরীকরণের চেষ্টা করেন।

১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে স্টিওয়ার্টের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা বিস্তারের কর্ম আরম্ভ হয় এবং তিনি ২টি বাংলা স্কুলের স্থাপনা করেন। ১৮১৮ সালে স্কুলের সংখ্যা হয় ১০টি। ছাত্র সংখ্যা এক হাজার। তাঁহাকে বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কয়েকটির উল্লেখের দ্বারা বাধা-বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। বর্ধমানে তখন ৫টি শাস্ত্রানুমোদিত বিদ্যালয় ছিল। মিশনারী বিদ্যালয়ের প্রভাবে পাছে তাহাদের বিদ্যালয় গুলি ভাঙিয়া যায়, এই ভয়ে শিক্ষকেরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত ও ইংরাজী

স্কুলের ছাত্রদের অভিভাবককে অভিশাপ বর্ষণ করিত।[৫] ক্যাপ্টেন যেখানে স্কুল স্থাপনা করিতেন সেখান হইতেই বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত কর্মঠ শিক্ষক নিয়োগ করিতেন। ১৮১৯ সালে প্রকাশিত 'মনোরঞ্জনেতিহাস'-এর লেখক তারাচাঁদ দত্ত বর্ধমানে ক্যাপ্টেন স্টিওয়ার্টের স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। তাহাতে বিরুদ্ধ বাদীদিগের কথায় লোকের অবিশ্বাস হইতে লাগিল এবং শীঘ্রই বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া যায়। ক্যাপ্টেন আপন বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে কোম্পানীর কতকগুলি আইন কানুন শিক্ষা দিতেন যাহাতে উভয়ের মধ্যে সৌহাদ্রের বৃদ্ধি হয়। তিনি সাহস করিয়া গায়ত্রী মন্ত্র একটি পুস্তকে ছাপিয়া নিজের নামে প্রকাশ করেন। তাঁহার বিদ্যালয় হইতে কয়েকটি পুস্তকও প্রকাশিত হয়। (স্কুল বুক সোসাইটির সাহায্যে) যথা: 'উপদেশ কথা',[৬] 'তমোনাশক'।

১৪।৭।১৮১৪ মিস্টার মে নামে একজন পাদরী স্বল্প আয় স্বত্বেও শিক্ষা জগতে নূতন প্রেরণা আনিলেন। বিনা বেতনে পঠন, লিখন এবং পাটীগণিত শিক্ষা দিবার জন্য নিজ বাসগৃহে বিদ্যালয় খুলিলেন। প্রথমদিন ছাত্রসংখ্যা ১৬ জন। ২য় মাসে স্থান সঙ্কুলান হইল না।[৭] জিলা কমিশনার মিঃ ফোর্বেস পুরাতন ওলন্দাজ দুর্গে তাঁহার জন্য ঘরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে শহর হইতে দূরে ইহার একটি শাখা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইল। সর্বমোট ছাত্রসংখ্যা হইল ৯৫১ জন। মিস্টার মের সাফল্যের অনেকাংশই পরিণত ছাত্র-দিগের দ্বারা শিক্ষাদানের এই পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল ছিল বলিয়া মনে হয়। মিঃ ফোবের্স সরকারের নজরে ইহা আনিয়া ৬০০ টাকা মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ক্রমে এই সাহায্যের পরিমাণ বর্ধিত হইয়া ৮৫০ টাকা হইল।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর নূতন সনদ মঞ্জুরীর কালে মানবপ্রেমী দাসপ্রথা বিরোধী উইলবারফোর্স পার্লামেণ্টে একটি সিদ্ধান্ত পাশ করাইয়া লইলেন যে, "ভারতবর্ষে শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারক প্রেরণ প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষা ও নৈতিক চেতনার উন্নতি করা হউক"। কিন্তু শেষ অবধি ডিরেক্টরদিগের বাধায় ইহা কার্যকর হইতে পারে নাই। এইসময় চার্লস গ্র্যাণ্ট যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া ভারতে আসিয়া খুবই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়েন। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতের সামাজিক অবস্থার বিষয়ে একটি বিবরণী রচনা করিয়া অভিমত দেন যে কেবল মাত্র "শিক্ষাপ্রসার দ্বারাই ইহার উন্নতি সম্ভব" শিক্ষা প্রসার পরিকল্পনার মাধ্যমে এদেশীয় ভাষায় ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া অধিকতর বুদ্ধি, অর্থ ও আগ্রহযুক্ত এদেশীয়দিগের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের কথা বলিয়াছিলেন। তিনি ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর চেয়ারম্যান হইলে এই বিষয়টি লইয়া দুইটি মতের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। গ্র্যাণ্টপন্থীদের মত ছিল ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয় শিক্ষা ও খ্রীস্টধর্মের প্রসার সাধনই কল্যাণকর। অপর পক্ষে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড মিণ্টো (১৮০৬-১৩) পন্থীরা ভারতবর্ষে

প্রচলিত শিক্ষা সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রসার সাধনে উৎসাহ দিলেই কল্যাণ হইবে বলিয়া অভিমত দিলেন। ইহার পূর্বেই লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ভারতে শাসনকর্মে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদিগের শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের স্থাপন করেন। ইহার মাধ্যমে ইউরোপীয় কর্মচারীদের জন্য ভারতীয় ভাষা ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। স্বভাবতঃই মিশনারীদিগের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যকীয় হইল। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রচেষ্টায় কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে কিছুই করিতে অগ্রসর হয় নাই বা মিশনারীদিগকে সাহায্য করে নাই। তথাপি ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ২১শে জুলাই সনদে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইল যে :—

"ভারতের প্রজাবৃন্দের সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধির চেষ্টা করিবার দায়িত্ব ইংলণ্ডের রহিয়াছে। এইজন্য যে সকল ব্যক্তি ভারতীয়দিগের শিক্ষা সংস্কৃতি ও নৈতিক উন্নতির কামনায় সে দেশে যাইতে চাহিবেন তাহাদিগকে আইনগত পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইবে।" আরও একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হইল—"ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতি সাধন, বিশ্বজ্জনের বিদ্যান্বেষণে অনুপ্রেরণা দান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জনে সহায়তা প্রদানার্থ বার্ষিক অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে।"

অর্থাৎ শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব আইনগত ভাবে স্বীকৃত হইল। শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকৃত হইলেও কর্মপন্থা লইয়া তিনটি পরস্পর বিরোধী মতের সৃষ্টি হইল। প্রাচীন পন্থীরা এবং মিণ্টোর মতানুসারী প্রাচীনপন্থী কর্মচারীগণ আরবী ও সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞান বিস্তারই কল্যাণকর মনে করিলেন। মনরোল, এলফিনস্টোন প্রমুখ ব্যক্তিগণ এদেশীয় আঞ্চলিক শিক্ষা বিস্তারই কল্যাণকর মনে করিলেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই পন্থার সমর্থক হইলেন। গ্র্যাণ্ট প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন।

বাঙলার মনীষীদিগের মধ্যে রাধাকান্ত দেব ও পণ্ডিতগণ প্রাচীনপন্থী সমর্থক হইলেন। অপরপক্ষে রামমোহন অনুরাগীগণ প্রগতিপন্থী গ্র্যাণ্টের তথ্যের সমর্থক হইলেন।

কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ কিন্তু কোন একটি মতকে পূর্ণ সমর্থন করিবার পরিবর্তে সমান সমর্থন বা অসমর্থন করিতে লাগিলেন। ফলে শিক্ষা বিস্তারের আইনগত দায়িত্ব বাস্তবে রূপায়িত হইতে বিলম্ব ঘটিল। ১৮১৪ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত 'ডেসপ্যাচে' একটি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতির ন্যায় যে জ্ঞানবিজ্ঞান আছে সেগুলি হয়তো ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সমমান বিশিষ্ট নয়। কিন্তু ঐগুলির প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করিলে উভয় দেশীয় জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্ট হইবে। তাই এ দেশীয় পণ্ডিতদিগকে সংস্কৃত শিক্ষায় ইচ্ছুক ইউরোপীয় পণ্ডিত-

গণের শিক্ষক হিসাবে উৎসাহজনক মাহিনায় নিয়োগ করা হইবে।" কিন্তু শিক্ষিত-দিগের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারের প্রস্তাব থাকিলেও শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচেষ্টা দেখা গেল না এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী কোন কর্মই আরে করা হইয়া উঠিল না।

উপযুক্ত পর্যালোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ভারতে শিক্ষা প্রসারের বিশেষত আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার কোনও সদুদ্দেশ্য কোম্পানীর ছিল না।

তথাপি এই পর্যন্ত যে সমস্ত শক্তি ও প্রয়োজন শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টার সূচনা করিয়াছিল সেগুলি নিম্নরূপ :—

১। দেশীয় প্রজাবৃন্দের সম্পত্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিচার নিষ্পত্তির দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনা করিবার নিমিত্ত এদেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির জ্ঞান আহরণ করিতে প্রাচ্য বিদ্যাসংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গঠন করিতে হইল। এই নিমিত্ত এশিয়াটিক সোসাইটির প্রধান কর্ম হয় প্রাচ্য গ্রন্থের ইংরাজীতে অনুবাদ করা।

২। মিশনারীগণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্র উর্বর করিবার নিমিত্ত শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোম্পানীকে চাপ দিতে লাগিলেন।

৩। ইংলণ্ডের সরকার শিক্ষার কর্ম ক্রমে আপন দায়িত্বের মধ্যে গণ্য করিতে লাগিল এবং কোম্পানীকে চাপ দিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু পূর্বে আলোচিত সামাজিক পরিবর্তনের চাপে এমন একটি যুগের সৃষ্টি হইয়াছিল যখন বিত্তবান ও উদ্যমশীল মাত্রই আপনাদিগের অবস্থা পরিবর্তনের প্রধান সোপান হিসাবে ইংরাজী শিক্ষাকেই ধরিয়া বসিয়াছিল এবং সেই পন্থায় বহুলাংশেই কৃতকার্যও হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং এদেশীয়দিগের প্রধানেরাও প্রগতিপন্থী রামমোহন অনুসারী ও বিত্তশালী রক্ষণশীল দলের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব ও পণ্ডিতগোষ্ঠী অনুসারী উভয় দলই কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারীদিগের মাধ্যমে ও দেশীয় হিতব্রতী ইউরোপীয়দিগের সহায়তায় (ডেভিড হেয়ার, হাইড ইস্ট, উইলসন প্রভৃতি) পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য চাপ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা অনেকেই এই কর্মে অর্থ সাহায্যের জন্যও প্রস্তুত ছিলেন। এইভাবে বাঙালীদিগের সুপ্রচেষ্টায় ও উদ্যমেই পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হইতে দেখা গেল। কোম্পানীর কর্মচারীদিগের মধ্যে লর্ড ময়রা (যিনি পরে লর্ড হেষ্টিংস) ও স্যার চার্লস মেটকাফ প্রভাবিত হইলেন। ইংলণ্ডের পুঁজিপতি শিল্প নায়কদিগের অবাধ বাণিজ্যের নীতির সার্থক প্রয়োগের দূর প্রসারী ফল সম্বন্ধে সচেতন নীতির বশবর্তী হইয়া পরিবর্তনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারে ক্রেতার জন্যও প্রয়োজন মধ্যযুগীয় স্বভাব পরিবর্তনের কারণ, ভোগ্য পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য তাহা প্রয়োজন। অপর পক্ষে আধুনিকতার মানবমুখী মতবাদের প্রাধান্যেও পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। তাই

২—১০—১৮১৫ কার্যবিবরণীতে বড়লাট লর্ড ময়রা লিখিয়াছেন—"যদিও ইংরাজ আমলের প্রথম যুগে এদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করাই প্রাধান্য পাইবার যোগ্য ছিল, তথাপি এক্ষণে শাসকরূপে শুধু এই কার্য করিলেই কর্তব্য শেষ হইবে না এই দেশের অধিবাসী দিগের শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়াও একটি অন্যতম প্রধান কর্তব্য।"

মোট কথা ইংরাজের পুরাতন চিন্তাধারা ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাইলে আমেরিকার ন্যায় তাঁহারা স্বাধীনতা দাবী করিতে পারে। অনেকের এই কুযুক্তির বিরুদ্ধে ৪-৯-১৮১৫ ডেসপ্যাচে লিখেন, "ভার:বাসীর কল্যাণ সাধনের পথেই ইংরেজগণ ভারত শাসনের ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার ও ভারতবাসীর শুভেচ্ছা পাইতে পারেন।"

১৭-৭-১৮২৩ সপরিষদ গভর্নর জেনারেল বেঙ্গল প্রেসীডেন্সীর জন্য 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন' গঠন করেন। এই কমিটিতে প্রিন্সেপ, ডঃ উইলসন প্রমুখ প্রাচ্যবিদ শিক্ষানুরাগীগণও ছিলেন। কিন্তু ঐ কমিটির কার্যত সংস্কৃত ও আরবী ফারসী শিক্ষার অগ্রগতিতেই উৎসাহ ছিলেন ও ১০ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা মাদ্রাসা ও কাশী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় পুনর্গঠিত করেন এবং আগ্রা ও দিল্লীতে দুইটি প্রাচ্য মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় অনুবাদ প্রভৃতি কার্যগুলি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তাই ১৮২৪ ফেব্রুয়ারীর ডেসপ্যাচে কোর্ট অব ডাইরেক্টর অভিমত দিলেন যে কলিকাতা মাদ্রাসা ও বারাণসী সংস্কৃত কলেজ সংসদ এবং কলিকাতার নূতন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা প্রথমাবধি ভুল করিয়া করা হইয়াছে। আসল উদ্দেশ্য 'প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা, হিন্দু বা মুসলমানী শিক্ষার ব্যবস্থা নয়।' কিন্তু কমিটির আপন কর্মের স্বপক্ষে যুক্তির অভাব হইল না। রক্ষণশীলদিগের মতনুযায়ী তাহারা জানাইলেন যে সাধারণ লোকেরা তখনও বিদেশী সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে উৎসাহী নয়; অতএব প্রাচ্যবিদ্যা উন্নয়নের কর্ম সঠিক হইয়াছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেও দেশীয় শিক্ষা মাধ্যমে বহু সমস্যার উদ্ভব হইল এবং শেষ অবধি পাশ্চাত্য শিক্ষার এবং ইংরাজী মাধ্যমে শিক্ষার অনুবর্তীদিগের পক্ষে মেকলের রায় ১৮৩৩ সালের সনদ অনুযায়ী কার্যকরী হইল। ফার্সী আর সরকারী কর্মের মাধ্যম রহিল না (বিচারালয়ে ইত্যাদিতে) এবং সেই স্থান ইংরাজী গ্রহণ করিল। সরকারী নীতিও ভারতীয়দিগকে সরকারী কর্মে অধিক নিয়োগের ব্যবস্থায় ইংরাজীর আকর্ষণ অধিক বৃদ্ধি পাইল। এমনকি শিক্ষিত দিগকে নিম্ন বেতনের কর্মেও অগ্রাধিকার দিবার ব্যবস্থা হইলে আর ইংরাজী শিক্ষার বিরোধিগণ টিকিয়া থাকিতে পারিলেন না।

দেশীয়দিগের প্রচেষ্টা ফলবতী ঃ হিন্দু কলেজ স্থাপনার প্রস্তাবনা ঃ

উপযুক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইল যে কোম্পানীর প্রাচ্যপ্রেমীদের জন্য

ও বাঙালী রক্ষণশীলদিগের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সর্ব অবস্থাতেই বাধার সৃষ্টি করিয়া দেশের পরিবর্তনের প্রতিকূলে প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। কিন্তু সমাজের প্রগতিশীলদিগের প্রচেষ্টা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বলিয়াই রামমোহনের অনুগামী দিগের ১৮১৪ সাল হইতে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা লইয়া সুচিন্তিত বিচার ধারায় প্রচারের মধ্য দিয়া পরিবর্তনের পক্ষে জনমত সক্রিয়ভাবে সংগঠিত হইতে লাগিল। রামমোহনের 'আত্মীয় সভায়' বিভিন্ন ধর্মীয়দিগের আনাগোনা হইত। ইহারই একটি সভায় ভারত-হিতৈষী ডেভিড হেয়ারের সহিত রামমোহনের হিন্দুদিগের ধর্মান্ধতা দূরীকরণের প্রচেষ্টায় বেদান্ত-বিদ্যালয় স্থাপনের সম্পর্কে আলোচনায় ডেভিড হেয়ার সময়োপ-যোগী প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই বিষয় লইয়া ডেভিড হেয়ার ক্রমে স্থির বিশ্বাসে উপনীত হইলেন যে ভারতের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাই একমাত্র মুক্তির পন্থা। দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় হেয়ার দ্বারা এই চিন্তায় প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি দেশীয় গণ্যমান্যদিগের সহিত ও পাশ্চাত্য মানব হিতৈষীদিগের সহিত এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া শেষ অবধি ১৪/৫/১৮১৬ তারিখ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার হাইড ইস্টের বাসগৃহে সকলকে একত্রিত করিয়া বিচারপতির সভাপতিত্বে প্রথম আলোচনার ব্যবস্থা করেন। সভায় সকল পণ্ডিত ব্যক্তিও অন্যান্য গণ্যমান্যগণও একবাক্যে সহযোগিতায় রাজি হইয়া যান। গণ্যমান্য উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মাধ্যমে বহু উৎসাহী হিন্দুবিত্তবানও ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও জানাইলেন।[৮] এই সভায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৫০ অধিক। প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকা চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল এবং বহু অর্থের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। বিচারপতি হাইড ইস্ট আরও জানাইতেছেন যে সপারিষদ গভর্নর জেনারেল-এর অনুমতি লইয়াই এই সভার কর্মে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সভার সমাপ্তি হইল আবার ২১/৫/১৮১৬ তারিখের মিটিং-এ বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি সৃষ্টির সিদ্ধান্তে এবং ইত্যবসরে W. C. Blaqueire and J.W. Croft-এর দ্বারা চাঁদার অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টার সিদ্ধান্ত লইয়া।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে কোম্পানীর উর্দ্ধতন কর্মচারীগণ বা অন্যান্য ইংরেজগণ সর্বদাই কোম্পানীর অনুমতি লইয়া জনহিত কর্মে অগ্রসর হইতেন। বিচারপতি মহোদয়ও তাহাই করিয়াছিলেন। ডেভিড হেয়ারও তাহাই জানাইতেছেন—"With the sanction and support of Govt. and of a few leading men of your community I endeavoured to promote the cause of education."

১৮১১ সালেও একবার সরকার নদীয়া এবং ত্রিহুতে দুটি নূতন কলেজ স্থাপনের

সিদ্ধান্ত লইয়াও কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। কারণ মফঃস্বলে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে কলিকাতায় এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে কলিকাতার জাগ্রত জনদাবীতে ইহার দ্বারা কোম্পানীয় ব্যয় বাহুল্য হইবে। পরিচালনার দিক হইতেও মফঃস্বলে তত্ত্বাবধানের অসুবিধা বিশেষ। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানী তখনও কার্যক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে ভীত ছিল। এই মিটিং সম্বন্ধে বিচারপতির আর একটি কথা লইয়া অদ্যাবধি বাক্‌-বিতণ্ডার অন্ত নাই। ইস্টের চিঠিতে রামমোহনের নামের উল্লেখ থাকিলেও কিন্তু কাগজপত্রে (কলেজায়) তাঁহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ইস্ট এই প্রসঙ্গে হিন্দু রক্ষণশীলদিগের সহিত রামমোহনের মতান্তরের ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন যে রক্ষণশীলগণ খ্রীস্টানের অনুদান ও সহযোগিতা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিলেও রামমোহনের সংস্রবে আসিতে রাজি নয়। কারণ, রামমোহনের তদানীন্তন হিন্দুধর্ম ও সামাজিক আচার বিচার সম্বন্ধে প্রায় অহিন্দু মতবাদ ও প্রচেষ্টা। অবশ্য ডেভিড হেয়ারের সহিত রামমোহনের আলোচনার মধ্যেই তাহার বেদান্ত শিক্ষার প্রতি অধিক আকর্ষণের কথাই জানা যায়। রামমোহনের চরিত্রে আপোষের মনোবৃত্তির সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায় না। পিতা-মাতার দুরবস্থার সময়ও তিনি কোন প্রকার সহানুভূতিশীল বোঝাবুঝির চেষ্টায় অগ্রসর হন নাই বলিয়াই জানা যায়। কারণ, রামমোহন ব্যক্তিগত মতবাদকে কোন অবস্থাতেই উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। যদিও তিনি ১৮২৩ সালে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি দিয়াছিলেন তথাপি তাহার পর তিনি যে ১৮২৬ সালে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন তাহাতেও পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত বেদান্ত শিক্ষার বাধ্যতামূলক অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেকালের খ্রীস্টান ও রক্ষণশীল হিন্দুগণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রথাকে অনেকাংশেই আত্মরক্ষামূলক পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে ইংরেজী জ্ঞান ও পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করিলেও ধর্মীয় শিক্ষা না থাকিলে হিন্দুদিগের সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই ধর্মাধিকারীগণ বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিলেন। তাই দেখি হিন্দু কলেজের একচ্ছত্রপতি রাজা রাধাকান্ত দেব পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেও, প্রাচ্য শিক্ষা নীতি মেকলের সময় অবধি সমর্থন করিয়া চলিয়াছেন। অন্যপক্ষে রামমোহন রায় হিন্দু কলেজের ধর্মহীন শিক্ষাকে সুনজরে কখনই দেখিতে পারেন নাই। কিন্তু খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারক গোঁড়া ডঃ ডাফের বিদ্যালয়ের জন্য সকল ব্যবস্থাই করিতেছেন। খ্রীস্টানদিগের ও মুসলমান দিগের একেশ্বরবাদীতা, সামাজিক ঐক্য এবং মানবতামুখী আচার আচরণকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিয়াছিলেন এবং হিন্দুদিগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সতীদাহ প্রথা, অন্তর্জলি প্রথা, বালক বালিকা বিসর্জনের প্রথা, নরবলির প্রথা এবং উৎকট বর্ণবৈষম্য দূরীকরণের একটি পন্থা হিসাবে ধর্মীয়

সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। ইহা বেদান্ত শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব বলিয়া তিনি মনে করিতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাহা আরও দ্রুতলয়ে সম্ভব বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্মহীন শিক্ষা তাঁহার কখনই সমর্থন পায় নাই। এই জন্যেই তিনি হিন্দু কলেজের সহিত যুক্ত নন—যদিও দেব-প্রীতিহীন খ্রীস্টান ডেভিড হেয়ার তাহাতে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া গেলেন।

হিন্দু কলেজের কোন সভাতেই তিনি কখনও আসিয়াছিলেন বলিয়া নজীর নাই। যদিও ব্যক্তিগতভাবে তিনি ডেভিড হেয়ারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন আজীবন। এমনকি ইংলণ্ডে তিনি হেয়ার পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। হেয়ার ও রামমোহনের উদ্দেশ্যই ছিল ভারতের মঙ্গল, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের মঙ্গল সাধন। তাই সর্বপ্রগতি প্রচেষ্টায় তিনি সক্রিয়ভাবেই অংশগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুকলেজ গোষ্ঠির মধ্যে নব্য ছাত্রদিগের অধিকাংশের সহিত ডেভিড হেয়ার আজীবন সম্পর্ক রক্ষা করিলেও রামমোহন তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ শঙ্কার দৃষ্টিতে দেখিতেন। ১৭/২/১৮৩১-এর মানপত্রে তাই হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ (মোট ৫৩৪ জনের মধ্যে) উল্লেখ করিয়াছেন কেবলমাত্র ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম। রামমোহন কোন প্রকারে প্রত্যক্ষভাবে প্রথম সভার পরও যুক্ত থাকিলে নিশ্চয় এই বিপ্লবী ছাত্রগণ (তাহার) ঋণ শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিতেন। তাহারা বলিতেছেন: "শিক্ষাদান করা বিজ্ঞলোকের কাজ। এই সর্বোৎকৃষ্ট দান আপনার নিকট হইতে গ্রহণ করার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছে কিভাবে আজ তাহারা উদ্বুদ্ধ হইতেছে। জগতের হিতকারীদের প্রতি সম্মানেরও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন না রাখার বহুযুগের দুর্দশা ও নিন্দা হইয়াছে। এইজন্য আমরা সতর্ক হইয়াছি—অপবাদ দূর করাই আমাদের ইচ্ছা। আমরা ইহাও বলিতে চাই যে, এদেশের যে মহদুপকার আপনি করিয়াছেন তাহার প্রতি অন্যেরা অবহিত না হইতে পারে, কিন্তু যাহারা উপকৃত হইয়াছে একথা চিরদিন তাহাদের মনে গাঁথা থাকিবে।"[১০]

ডেভিড হেয়ার সাহেবও উত্তরে বলিয়াছেন, এদেশে কিছুকাল অবস্থিতির পর এখানকার কয়েকজন অধিবাসীর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে বুঝিলাম—শিক্ষা ব্যতিরেকে হিন্দুদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইবে না। তখন ভারতবর্ষের উন্নতি সাধনের জন্য আমি আমার সামান্য শক্তি বিনিয়োগ করিলাম। সরকারের এবং সমাজপতিগণের সম্মতি ও সমর্থন পাইয়া শিক্ষাপ্রসারে সচেষ্ট হইলাম।[১১]

এই উভয়ের মধ্যেও কিন্তু বন্ধুবর রামমোহনের উল্লেখ করা হয় নাই। উপেক্ষিত হইলেও নিশ্চয় এই বিদ্রোহী নব্যদিগের সম্মুখে তিনি ভ্রম সংশোধনের প্রয়াস পাইতেন। ১৮৩১-৩৫ খ্রীস্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালীন জনশিক্ষা সম্পর্কিত পর্যালোচনায় হিন্দুকলেজের প্রথম অধ্যক্ষ প্রিন্সিপ্যাল J. Kerr হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লিখিয়াছেন:—

"ইংরাজীতে শিক্ষা লাভের ক্রমবর্ধমান চাহিদা• পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে দেশীয় অধিবাসীর নিজেরাই ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুকলেজ স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের কাজে কয়েকজন ইউরোপীয় ভদ্রলোকও সক্রিয় উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সার হাইড ইস্ট ও ডেভিড হেয়ার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ডেভিড হেয়ার জীবনে খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। তাই তাহার ভূমিকা নেপথ্যেই থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু পরিকল্পনাটির রূপায়ণে একেবারে গোড়া হইতেই যাঁহারা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদ্যম দেখাইয়াছেন, হেয়ার ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।[১২]

The Calcutta Christian Observer, June—1832, সংখ্যায় প্রকাশ করে যে, 'হেয়ার একটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবপত্র রচনা করেন এবং তাহা জনৈক এতদ্দেশীয় ব্যক্তির মাধ্যমে ও সমর্থনের জন্য বিচারপতি হাইড ইস্টের কাছে পাঠান। এই দেশীয় ব্যক্তি আর কেহই নন দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।'[১৩]

ইহা দ্বারা হিন্দু কলেজ ছাত্রদিগের মতবাদকেই স্পষ্ট করা হইয়াছে। রামমোহন হিন্দু কলেজ স্থাপনার বিরোধ করেন নাই। কিন্তু সক্রিয়ভাবে ইহার সহিত যুক্ত থাকিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া জানিতেও পারা যায় না। সেকালের বিত্তবান হিন্দুদিগের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ও বিভিন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্ব কথনই তাহাদিগকে খুব দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠ থাকিতে দেয় নাই। হয়তো ইহাও একটি কারণ যাহার জন্য রামমোহন রায় ও রাধাকান্ত দেব গোষ্ঠি একত্রে এই শুভকর্মে অগ্রসর হন নাই। ইতিহাসের এই বাধা সত্যই স্বাভাবিক কারণে মঙ্গলকারী হইয়াছিল। কারণ ভবিষ্যতে রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব বা অপরাপর ব্যক্তিদিগের দ্বারা আয়োজিত দেশীয় শিক্ষা সংস্থা অধিকদিন ধর্মীয় নীতি আঁকড়াইয়া থাকিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্তু হিন্দুকলেজ ক্রমশঃ সরকারী সাহায্য ও প্রভাবে পরিবর্তিত রূপে হইলেও প্রগতির সন্ধান দিয়া ভারতে শিক্ষার আমূল পরিবর্তনে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল এবং পরবর্তী ভারতীয়দের সার্বিক উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

শিক্ষার বিষয়সূচী :—শিক্ষার বিষয় ছিল প্রধানত বাংলা ও ইংরাজী ভাষা (ভবিষ্যতে সুযোগ হইলে হিন্দুস্থানী ভাষাও পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হইতে পারে)। ইহা ব্যতীত ব্যাকরণ ইংরেজী ও বাংলা, শুদ্ধ ভাষা লিখন, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ বিদ্যা, পাশ্চাত্য অঙ্ক শাস্ত্র (Mathematics)। ভবিষ্যতে ইংরেজী কবিতা, সাহিত্য ইত্যাদি পঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করা হইল। আর একটি বিষয়ে সবল পণ্ডিতদিগের বিশেষ অনুরাগ দেখা গিয়াছিল—তাহা হইতেছে চরিত্র (Moral) গঠন শিক্ষা। কারণ, তাঁহাদের মতে চরিত্রের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সেকালে বিশেষ ভাবেই অনুভূত হইয়াছিল। ফার্সী শিক্ষার পরিকল্পনাও করা হইয়াছিল।

২১/৫/১৮২৬ তারিখের মিটিং-এতে নিম্নলিখিত প্রধান প্রস্তাবগুলিও গ্রহণ করা হইয়াছিল :—১। কলেজ স্থাপনা করা হইবে এবং নাম হইবে।[১৩] "হিন্দু কলেজ" ২। একটি সাধারণ সমিতি (General Committee) গঠিত হইল এবং কমিটিতে সভ্য হইল ভারতীয় ২০ জন, ইউরোপীয় ১০ জন, অর্থাৎ মোট ৩০ জন। ভারতীয় সভ্যদিগের মধ্যে ৫ জন বিখ্যাত পণ্ডিত ও সংস্কৃত বিশারদ ছিলেন। (৩) জোসেফ বারেটো (Joseph Barretto) হইলেন ট্রেজারার।

এই সভার একটি বিশেষত্ব স্মরণীয়, কারণ, ইহার পর আর কোন ইংরেজ-ভারতীয় যুক্ত সমিতিতে কখনই ভারতীয় দিগের সংখ্যা অধিক থাকিতে দেওয়া হয় নাই।

২৭/৫/১৮১৬ তারিখে আবার একটি অধিবেশন হয়। এই সভার মুখ্য সিদ্ধান্তগুলি নিম্নরূপ :—লেপ্টেনেণ্ট কর্নেল ফ্রান্সিস অরভিন (Lt. Col, Francis Irvine) ইউরোপীয় (অস্থায়ীভাবে) সম্পাদক (Secretary) হইলেন। (২) দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় অস্থায়ীভাবে ভারতীয় সম্পাদক হইলেন। (৩) একটি সিলেক্ট কমিটি করা হইল—বিদ্যালয়ের জন্য সুবিধামত একটি স্থান নির্ণয়ের জন্য। আর যতদিন সে ব্যবস্থা না হইতেছে ততদিনের জন্য বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্বল্পকালের জন্য একটি বাড়ী ভাড়ার ব্যবস্থা করিতে বলা হইল।

এই সভায় কিছু নিয়মের (Rules) খসড়া তৈয়ারী করা হয় এবং সভ্যদিগকে সেই সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করিতে আহ্বান জানান হয়। তদুপরি প্রত্যেক সভ্যকে সুবিধামত প্রয়োজনীয়বোধে নূতন নিয়ম রচনার ও সমিতির সমুখে উপস্থিত করিবার অনুরোধও করা হয়।

১১/৬/১৮১৬ তারিখের সভায় একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা স্মরণীয়। এই সভায় সমগ্র ইউরোপীয় সভ্যগণ একযোগে পদত্যাগ করেন। এমনকি বিচারপতি হাইড ইস্ট এবং হ্যারিংটন সাহেবও সরকারীভাবে হিন্দুকলেজ সমিতিকে সাহায্য করিতে অপারগতার কথা জানাইয়া বেসরকারী ভাবে সর্বকর্মে সহায়তার আশ্বাস দিলেন। ইহার পরের অধিবেশনগুলি অবশ্য বিচারপতি হাইড ইস্টের গৃহেই বসিয়াছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায়িক দৃষ্টি হইতে দেশীয়দিগের কোন প্রগতিশীল কর্মে ইউরোপীয় কর্মকর্তাদিগের সহযোগিতা সুনজরে দেখিতেন না।

কিন্তু এই সমিতিতে ভারতীয়দিগের সর্ববিষয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠতার জন্য ইউরোপীয় দিগের পূর্ণ স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব খর্ব হইবার সম্ভাবনাও মনে হয়, একটি কারণ। কারণ ভবিষ্যতে আর কোনই ভারতীয় ইংরেজ যৌথ প্রচেষ্টায় ভারতীয়দিগের সংখ্যা গরিষ্ঠতা মানিয়া লওয়া হয় নাই।

২৫/৬/১৮১৬-এর সভায় একটি সাবকমিটি করা হয় তৎকালাবধি প্রতিটি ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রচেষ্টায় তৈয়ারী নিয়মাবলীর সংকলন করিবার জন্য। ইহার পর প্রায়

দুই মাস 'সাবকমিটির' অধিবেশন হয় এবং শেষ অবধি বহু বিচারের পর নিয়মাবলী প্রস্তুত হয়।

সাবকমিটি ২০/৮/১৮১৬ তারিখে কলেজের নিয়মাবলী সকল সভ্য ও চাঁদা দাতাদিগের নিকট পাঠাইলেন তাহাদের অবগতির জন্য।

২৭/৮/১৮১৬ তারিখে বিচারপতি হাইড ইস্টের বাসগৃহেই 'সাধারণ সমিতি' ও চাঁদা দাতাগণ পৃথক পৃথক মিলিত হইয়া নিয়মাবলীর সম্বন্ধে পূর্ণ বিচারের পর সর্বসম্মতিক্রমে নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করেন। সর্বশুদ্ধ নিয়ম ছিল ৩৪টি। তিনটি বিভাগে বিভক্ত।

(ক) **অধ্যয়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলী** :—১। এই শিক্ষায়তনের মূল উদ্দেশ্য হইল সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানদিগের ইংরাজী ও ভারতীয় ভাষা এবং ইউরোপ, এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। (২) ছাত্রভর্তির বিষয়ে শিক্ষায়তনের পরিচালকবৃন্দের মতামতই কার্যকরী হইবে। (৩) একটি পাঠশালা (স্কুল) এবং একটি মহা পাঠশালা (অ্যাকাডেমি) কলেজটির অন্তর্ভুক্ত হইবে। পাঠশালাটি অবিলম্বেই স্থাপিত হইবে। দ্বিতীয়টি স্থাপনের পরিকল্পনা যথা শীঘ্রসম্ভব বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে। (৪) পাঠশালাটিতে উন্নততর শিক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে ইংরেজী ও বাংলা দ্রুত পঠন, লিখন, ব্যাকরণ, পাটীগণিত ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে। সুবিধা হইলে অ্যাকাডেমি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত পাঠশালাটিতে ফার্সী শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা থাকিবে। (৫) পাঠশালাটিতে (স্কুলে) যে সমস্ত ভাষা শিক্ষার সুবিধা থাকিবে না, সেই সব ভাষা ছাড়াও অ্যাকাডেমিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি শিখাইবার ব্যবস্থা থাকিবে। ইতিহাস, ভূগোল. কালনিরূপণ বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ন এবং অন্যান্য বিদ্যা। (৬) ছাত্রদিগের পাঠশালা বা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার বয়স পরিচালকেরা নির্ধারণ করিবেন। কোন ক্ষেত্রেই পরিচালকদিগের অনুমতি ব্যতীত ৮ বৎসরের কম বয়স্ক বালকদিগের ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে না। (৭) পরিচালকদিগের দ্বারা নির্ধারিত সময়ে সাধারণ পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষার ফলাফলে যেসব ছাত্র বিশিষ্টতা অর্জন করিবে, তাহারা সম্মানিক পুরস্কারের অধিকারী হইবে। (৮) বিদ্যার উৎকর্ষ এবং সৎচরিত্রের জন্য যেসব ছাত্র বিদ্যালয়ে সুনাম অর্জন করিবে, পরিচালকেরা ইচ্ছা করিলে মহাবিদ্যালয়ে বিনা বেতনে তাহাদের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন। এইজন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে শিক্ষায়তনের অর্থকোষ যদি তাহা বহন করিতে না পারে তাহা হইলে সহৃদয় ব্যক্তিদের নিকট আহ্বান জানানো হইবে—সে অর্থ দান করিবার জন্য। (৯) পাঠশালা বা মহাবিদ্যালয় ত্যাগের সময় তত্ত্বাবধায়কগণের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি অভিজ্ঞান পত্র (certificate) ছাত্রদের দেওয়া হইবে। ছাত্রদের পরিচয় জ্ঞাপক নিম্নোক্ত বিবরণ তাহাতে থাকিবে :—নাম, বয়স, পিতার

নাম, বাসস্থানের ঠিকানা, অধ্যয়নের কাল এবং পঠিত ও অধিগত বিষয় সমূহের তালিকা।

(খ) অর্থভাণ্ডার ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত নিয়মাবলী :—

(১০—২৫) নিয়মাবলীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কলেজের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থভাণ্ডার হইবে :—(1) College Fund, (2) Education Fund.

College Fund-এর উদ্দেশ্য হইবে দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা, যাহা শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে এবং Education Fund-কে সাহায্য দিবে। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে শেষ অবধি একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া কলেজের নিমিত্ত নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করা। ইহা ছাড়া আসবাবপত্র, পুস্তক, দার্শনিক শিক্ষার জন্য এবং ক্রমে বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করিবার নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন হইবে তাহার ব্যবস্থা করা। যতদিন পর্যন্ত নিজস্ব গৃহ নির্মাণ না হয় ততদিন ভাড়া বাড়ীর খরচ নির্বাহ এবং অন্যান্য খরচ এই ফাণ্ড হইতে করা হইবে। Education on Fund-এর জন্য সাহায্যকৃত অর্থ ছাত্রদিগের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যয় করা হইবে।

২১/৫/১৮১৬ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত প্রদত্ত দান অনুযায়ী দাতাদিগের বিভিন্ন বিভাগ করা হইল :—

(অ) সর্বাপেক্ষা এককভাবে অধিক দান—প্রধান স্থাপয়িতা (Chief Founder).

(আ) ৫০০০ টাকা বা তদূর্দ্ধদান—(Principal Founder).

(ই) অন্যান্য দাতা—সাধারণ স্থাপয়িতা (Founders of the College).

(ঈ) ৫০০০ বা তদূর্দ্ধদান Heritable (কোষে ১½ দেড় লক্ষ পূর্ণ হইবার পূর্বে যাহারা Governor of the College' দান করিবেন।)

(গ) পরিচালন ব্যবস্থা সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রধানগুলি দেওয়া হইল :—

(২৬) কলেজ পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকিবে একটি পরিচালক সমিতির উপর। এই সমিতিতে থাকিবেন বংশানুক্রমিক ভাবে অধিকার ভোগী গভর্নরগণ (Heriditable Governors)। সমস্ত জীবনের জন্য নির্বাচিত গবর্নরেরা (Governors for Life) এবং একবৎসরের জন্য নির্বাচিত ডিরেক্টর অথবা ইহাদের প্রত্যেকের প্রতিনিধিগণ। (২৭) যে আইনগুলি বর্তমানে বিধিবদ্ধ হইল সেইগুলি কার্যকর করিবার পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালকদিগের হাতে থাকিবে। অতিরিক্ত আইনও তাঁহারা বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন। (২৯) পরিচালকদিগের কমিটি একজন ইউরোপীয় সম্পাদক ও দেশীয় সহকারী সম্পাদক নিয়োগ করিবেন। কমিটির নির্দেশে এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে তাঁহারা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান কারবেন। বিদ্যালয়ের যে কোন বিভাগে শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মসচিব নিয়োগের প্রয়োজন হইলে

পরিচালক সমিতি তাহা করিবেন এবং তাহাদের অপসারণের ভারও তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত থাকিবে। (৩১) উপস্থিত সদস্যদিগের অধিকাংশের মতামতেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। (৩৪) দাতাদিগের বাৎসরিক সভা হইতেই হইবে এবং ইহাতে বিদ্যালয়ের আথিক ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিবরণী পেশ করিতেই হইবে অনুমোদনের জন্য।

একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় ঃ—

বংশানুক্রমিক গবর্নর (অ) মহারাজ তেজকুমার বাহাদুর (বর্ধমান)। (আ) গোপীনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা)।

৫ জন ম্যানেজার বা ডাইরেক্টর ঃ—

(অ) গঙ্গানারায়ণ দাস,
(আ) রাধামাধব ব্যানার্জী,
(ই) জয়কিশোন সিংহ
(ঈ) গোপীমোহন দেব,
(উ) হরিমোহন ঠাকুর।

৪/১২/১৮১৬ মিটিং এতে—James Isaac D' Anselm—(চন্দন নগরের) ২০০ টাকা মাসিক বেতনে হেড মাস্টার বা প্রধান শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হইলেন। ইউরোপীয় সেক্রেটারী ও সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ৩০০ টাকা মাসিক বেতনে Lt. Col. Frances Irvine[৩] ও দেশীয় সেক্রেটারী ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাসিক ১০০ টাকা বেতনে দেওয়ান হইলেন বৈদ্যনাথ মুখার্জী। ১২/১২/১৮১৬ কয়েকজন শিক্ষক ও মনিটার নিযুক্ত হয়। Lt. Col. Frances Irvine-এর কর্মের জন্য সরকার হইতে অনুমতি প্রার্থনা করা হইল।

৬/১/১৮১৭, ১৩/১/১৮১৭

দুটি মিটিং হয়। কলেজের জন্য গৌরচন্দ্র বসাকের ৩০৪, চিৎপুর রোড স্থিত গৃহ ভাড়া লওয়া হয়। ১৩ জন বিনা বেতনে পড়িবার জন্য ছাত্রদিগের নাম অনুমোদিত হয় (Educaion Fund হতে চাঁদা দাতা দিগের নির্বাচিত)। সরকার হইতে L. Col. Francis Irvine কে অনুমতি জ্ঞাপক চিঠির বিচার হয় এবং তাহাকে কর্মে নিয়োগ করা হয় (অবশ্য সরকার বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও বিদ্যালয়ের কোন পদাধিকারীকে নিয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবেন)।

অবশেষে ২০/১/১৮১৭ তারিখে বিদ্যালয় উদ্বোধন করা হয়।

হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ-ভবনে স্থানান্তরিত হয় ১৮২৬ সালে। ইহার পূর্বে ক্রমান্বয়ে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ী এবং তৎপর টেরিটি বাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় ১৫/২/১৮২৪ সালে নূতন সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি প্রস্তর গবর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট দ্বারা প্রোথিত হইলেও মূল প্রস্তরে হিন্দু কলেজের নামই উল্লেখিত হইয়াছে।

"… …Under the Anspices of
The Right Hon'ble William Pitt Amherst
Governor General of the British Possessions in India
The Foundation Stone of this Edifice
The Hindu College of Calcutta
was laid by…………"

২১/১/১৮১৭ তারিখ হিন্দুকলেজের 'ভিজিটার্স'-ডে' পালিত হয়। এই উপলক্ষে ভারতীয় সেক্রেটারী দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখার্জী বিদ্যালয়টিকে একটি বটবৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সার্থক হইয়াছে ঐতিহাসিকভাবে।

"যেমন বটবৃক্ষ সামান্য বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত ও ফলেফুলে সুশোভিত হয়। তদ্রূপ এই বিদ্যালয়ও হইবে।"[১৫]

হিন্দু কলেজকে সেকালে কিন্তু নানা নামে ডাকা হইত। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন :—

"এই সময়ে হিন্দুকলেজকে তিন নামে ডাকা হইত, হিন্দু কলেজ, এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান কলেজ ও মহা বিদ্যালয়। উহাতে বাঙ্গালা ইংরাজি পার্সি পড়া হইত বলিয়া উহার এক নাম এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান কলেজ ছিল।[১৬] ৭/৮/১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দের ৯২ নং অভিজ্ঞানপত্রে 'এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান কলেজ' নাম ছিল। অভিজ্ঞানপত্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মেজর এটয়র ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের সহি যুক্ত :—[১৭]

আর হেলিফেক্স	জেঃ সিসি সদর্লণ্ড	প্রসন্ন কুমার ঠাকুর
হেড মাস্টার	ডেভিড হেয়ার	রসময় দত্ত
	(ভিজিটর)	এটয়র
		রামকমল সেন
		রাধামাধব বাঁড়ুজ্যে
		দ্বারকানাথ ঠাকুর
		রাধাকান্ত দেব

প্রথম কয়েক বৎসর হিন্দু কলেজের বিশেষ প্রসারের নজীর নাই। ১৮১৮ সাল অবধি কলেজের ছুটি, কলেজের কার্যকাল, ছাত্র ভর্তির নিয়ম, মাসিক বেতন, ছাত্র অনুপস্থিতিতে অভিভাবকের কর্তব্য, অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী ছাত্রের শাস্তি বিধানের তারতম্য, পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে পরীক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে কোন সঠিক নিয়ম রাজা রাধাকান্ত দেব কলেজের অন্যতম কর্মকর্তা হইয়াই ইহার নিয়মাবলী গঠন করিতে সচেষ্ট হইলেন। ২৪/৭/১৮১৯ তিনি এই সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষক মিঃ আন্‌সেল্‌ম্‌কে পত্র লিখেন :—"আমার বিবেচনার্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দয়া করিয়া পাঠাইবেন। বিদ্যালয় আরম্ভ

ও ছুটির সময়, প্রতি শ্রেণীতে ও বিভাগে শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য কিরূপ এবং শিক্ষকদিগের প্রত্যেকের কার্যই বা কি জানাইবেন"। [১৮] তিনি ইহার পর ক্রমে নিয়মাবলী গঠন করিয়া পরিচালক মণ্ডলীর দ্বারা অনুমোদিত করান।

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দেও কলেজটির আর্থিক অবস্থা সুবিধার ছিল না। তাই ডেভিড হেয়ার কমিটি মিটিং-এতে ইউরোপীয় ও দেশীয় সম্পাদকদিগের ৩০০+১০০ = ৪০০ টাকা বেতন দিবার ব্যবস্থার এই আর্থিক দুরবস্থায় ঔচিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে ইউরোপীয় সম্পাদক আরভিন পদত্যাগ করিলেন এবং দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখার্জী অবৈতনিক সম্পাদক হিসাবে কর্ম করিতে লাগিলেন।

ক্রমে বারেটো কোম্পানী দেউলিয়া হইলে কলেজের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় সরকারের সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইলে সরকার কলেজের কমিটিতে ও কার্য ব্যাপারে কিছু অংশ গ্রহণ করিয়া নানারূপ পরিবর্তন আরম্ভ করিলেন এবং সেই অর্থ সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ে পঠন পাঠন আরম্ভ হইল।

১/৫/১৮২৬ হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ নূতন দালানে স্থানান্তরিত হইল। গৃহের মধ্যভাগ দ্বিতল, নিম্নতল মধ্যস্থলে ৫০×২৫ ফুট হলঘর। উভয়তলেই উহার পার্শ্ববর্তী ৭টি করিয়া প্রকোষ্ঠ। মূলগৃহ সংলগ্ন পূর্ব ও পশ্চিম দুই অংশই একতল বিশিষ্ট। প্রত্যেকটিতে ৬৪×২২ ফুট করিয়া হলঘর এবং ৫টি মাঝারি রকমের কক্ষ। মূল গৃহের দ্বিতলের হলঘর সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজ সিনিয়র ছাত্রেরা একসঙ্গে বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য ব্যবস্থা করিত। দ্বিতীয় তলের অন্য তিনটি ঘরও হিন্দু কলেজের সিনিয়র ছাত্রদিগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ১৮৩৯-৪০ সালে পূর্ব ও পশ্চিমপার্শ্বের একতলা গৃহের প্রত্যেকটির সন্নিকটে একটি করিয়া নূতন ঘর নির্মিত হইল।

ডঃ উইলসনের নির্দেশে হিন্দু কলেজের আধুনিকদিগের সহিত সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন পন্থীদিগের কোন সংযোগ যাহাতে স্থাপিত না হয় এই উদ্দেশ্যে দুই দিকেই অতি উচ্চ লোহার রেলিং দিয়া আটকাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু অনেক শ্রেণীতে দুই কলেজের ছাত্রগণ একসঙ্গে ক্লাস করিত। তাই শেষ অবধি হিন্দু কলেজের প্রভাব হইতে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগকে দূরে রাখা সম্ভব হয় নাই।

শিক্ষা ব্যবস্থা :—

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আর্থিক অবস্থা ও নানা কারণে হিন্দু কলেজে প্রথমাবস্থায় অতি উচ্চমানের বিশেষভাবে স্মরণীয় কোন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হইতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে সরকারী সাহায্য আসিলে এবং সংস্কৃত কলেজে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইবার পরই বিজ্ঞান, অঙ্ক ইত্যাদি শিক্ষার সুব্যবস্থা সম্ভব হয়। পাঠশালা ও মহাবিদ্যালয়ের পাঠ আরম্ভ হইল নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুসারে। কলেজের নিয়ন্ত্রণেও সরকারের প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। ডেভিড হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব বিশেষ করিয়া ইহার সার্বিক উন্নতির জন্য

উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করেন। এই সময় সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকের জন্যেও দেশীয় ভাষার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকার বিষয়ে কথোপকথনের জন্য বুঝাইবার ও বুঝিবার জন্য সরকার দৃষ্টি দিতে বাধ্য হয়।

১৮২৭ সালে হিন্দু কলেজে সিনিয়ার স্কুল ও জুনিয়ার স্কুল দুই ভাগে সর্বসমেত ১৩টি শ্রেণী ছিল। জুনিয়ার স্কুলে ১৩শ হইতে ৬ষ্ঠ (অর্থাৎ ৮ম হইতে ১ম জুনিয়ার) শ্রেণী এবং সিনিয়ার স্কুলে ৫ম হইতে ১ম পর্যন্ত ৫টি শ্রেণী ছিল।[১৯]

জুনিয়ার স্কুলে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে ছাত্রগণ ইংরেজী ভাষা ও ব্যাকরণ, গণিত ও ভূগোল বিষয়ে কিছু জ্ঞান অর্জন করিবার পর ৭ম জুনিয়ার শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিত।[২০]

ছাত্রদিগের ভর্তি হইবার বয়স ছিল কমপক্ষে ৮ বৎসর ও উর্ধে ১২। কিন্তু কোন ক্রমেই বয়ঃসীমা ১৪ বৎসর অতিক্রম করিতে পারিত না। কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে উচ্চশ্রেণীতে লইবার ব্যবস্থাও ছিল। ছাত্রগণ বিশেষ কৃতকার্যের পরিচয় দিলে দুই এক শ্রেণী অতিক্রম করিয়া উচ্চতর শ্রেণীতে পড়িবার সুযোগ পাইত।[২১]

হিন্দুকলেজের ১৩টি শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করিলেও ছাত্রগণের জ্ঞান স্পৃহা তৃপ্ত করিবার জন্য এবং আরও উচ্চতর শিক্ষা পাইবার সুবিধার ব্যবস্থাও ছিল। বিশেষ বৃত্তি লইয়া উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করিতে পারিত। রাজনারায়ণ বসু এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন। এই সুবিধা ও পদ্ধতি হিন্দুকলেজের বিশেষত্ব ছিল।

১৮৩৭ সালেও হিন্দুকলেজে ১৩টি শ্রেণী ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় সরকারি রিপোর্টে। ১৮৩৭ সালের জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসনের রিপোর্টের ৪র্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত[২২]। হিন্দুকলেজের কলেজ বিভাগে ১ম হইতে ৫ম শ্রেণী এবং লোয়ার (অর্থাৎ জুনিয়ার) স্কুলে ১ম, ২য়, ও ছয়টি নিম্ন শ্রেণী ছিল।

ছাত্রদিগের পরীক্ষা আমন্ত্রিত বিজ্ঞপণ্ডিত ও গণ্যমান্যদিগের উপস্থিতিতেই হইত। কেবল উচ্চশ্রেণীর কথাই নয়, নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদিগকেও পরীক্ষার সময় ও পরে সর্বসমক্ষে আবৃত্তি, নাটকাভিনয়, বক্তৃতা, রচনা লিখন, তর্কসভা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করিয়া আপন কৃতকার্যতার প্রমাণ দানের পর পুরস্কার গ্রহণ করিতে হইত। ৭-৩-১৮৩৪ টাউন হলে হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের পুরস্কার বিতরণী সভায় সেক্সপীয়র হইতে আবৃত্তি করিতে ও কৃতকার্যতার চিহ্নস্বরূপ পুরস্কার গ্রহণ করিতে দেখা যায় মধুসূদন দত্তকে। মধুসূদন দত্ত তখন ৭ম জুনিয়ার শ্রেণীর ছাত্র। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"পুরস্কার বিতরণ। — গত শুক্রবার (৭ মার্চ ১৮৩৪) টাউনহলে হিন্দুকলেজের ছাত্রেরদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা গেল। — — — —

ইহার পরে নাট্য বিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল। — — — — —

— — — — — — ষষ্ঠ হেনরি ও গ্রাষ্টর
ষষ্ঠ হেনরি। — — — — — ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল।
গ্রাষ্টর। — — — — — — মধুসূদন দত্ত।[২৩]

১৮৪১ সালে সর্বপ্রথম সিনিয়ার ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়। সিনিয়র বিভাগের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রগণ সিনিয়র বৃত্তি এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্রগণ জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পরীক্ষায় বিশেষ কৃতকার্যতার পরিচয় দিতে পারিলে দুই এক শ্রেণী উচ্চতর মানে পড়িবার সুযোগ ছিল। মধুসূদন এবং তাঁহার সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাচরণ লাহা জুনিয়ার বৃত্তি লাভ করিয়া ৫ম শ্রেণী হইতে পর বৎসর (১৮৪২) একেবারে২য় শ্রেণীত উন্নীত হন।

শিক্ষার বিষয় ছিল নিম্নরূপ ঃ—

১। ভাষা শিক্ষা— বাংলা ও ইংরাজী।
সংস্কৃত ও ফার্সী ।। এই দুইটির পাঠ পরে বন্ধ হইয়া যায় ॥

২। গণিত — প্রথমাবস্থায় গণিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অতি সাধারণ। ক্রমে উপযুক্ত শিক্ষকের নিযোগে অবস্থার উন্নতি হয়। টাইটলার ১৮২৮ সাহেব নিযুক্ত হইলে অবস্থার পরিবর্তন হয়।

৩। বিজ্ঞান— রসায়ন—১৮২৪ সালে 'রস' সাহেবের দ্বারা বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বিশেষ জ্ঞানী বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন নাই। ছাত্রগণ তাঁহাকে 'সোডা' সাহেব' বলিয়া উত্যক্ত করিত। কারণ, তিনি সর্বদাই সোডাওয়াটারের কম্পাউণ্ড সম্বন্ধে বলিতেন।

৪। ড্রইং— ড্রইং শিক্ষণ ১৮৩১ সালে আরম্ভ হয়।

৫। পলিটিক্যাল ইকনমি— ১৮৩১ সালে শিক্ষা দেওয়া হয়।

৬। আইন— ১৮৩১ সালে পাঠের ব্যবস্থা হয়। কিছুদিন পর আইন বিভাগটি পৃথক বিভাগ রূপে গঠিত হয়।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দেই সরকারী নীতি ইংরাজী মাধ্যম ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, ব্যয় সংক্ষেপ করিতে দেশীয়দিগের কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থায়। সুতরাং ইংরাজীর উন্নতিসাধন বিশেষ কাম্য হইয়া উঠিল—শুধুমাত্র নামমাত্র জ্ঞানে তুষ্ট হওয়া সম্ভব হইল না। সুতরাং ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও মানের উন্নয়ন হইতে লাগিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৩৯ সালে সিনিয়র বিভাগে ছাত্র ছিল ৫৩৯

জুনিয়ার বিভাগে ছাত্র ছিল ৩৭২
মোট শিক্ষক— ১৪

হিন্দু কলেজে শিক্ষণীয় বিষয়ের বৃদ্ধি ও কলেজের মূলনীতির পরিবর্তন :—১৮৩৫ সালে সিনিয়ার ও জুনিয়ার বিভাগ সম্মিলিত করিয়া একই অধ্যক্ষের অধীন করিয়া দেওয়া হইল। প্রথম অধ্যক্ষ (Principal) হইলেন J. Kerr এবং ১৮৪৭ সালে জুনিয়ার বিভাগের প্রধান শিক্ষকের পদটিও উঠাইয়া দেওয়া হইল। ইহাতে হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের উৎসাহের জন্য বৃত্তি পুরস্কারের সংখ্যা অধিক করা হইল। মোট সংখ্যা দাঁড়াইল ৪৫। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন নূতন বিভাগ খোলা হইল :—

৭।	Experimental & Natural Philosophy	১৮৪৩-৪৪
৮।	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং — —	১৮৪৩-৪৪
৯।	সঙ্গীত বিদ্যা — —	১৮৪৭

উপযুক্ত বিষয়গুলি খুলিয়া হিন্দুকলেজের পরিধি আরও ছড়াইয়া পড়িল। নিয়ম করা হইল যে এই সকল বিষয়গুলিতে সকল শ্রেণীর ছাত্রগণ অংশগ্রহণ করিতে পারিবে। শুধু তাহাই নয় এমনকি কলেজ বহির্ভূত কোন উৎসাহী ছাত্রও এই সকল বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইবে। ইহা দ্বারা শুধু হিন্দুদিগের জন্যই নয় অহিন্দুদিগকেও আংশিকভাবে সুবিধা দেওয়া হইল হিন্দুকলেজের শিক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে। অর্থাৎ হিন্দুকলেজ স্থাপয়িতাদিগের মনের যে ইচ্ছা ছিল শিক্ষাকে কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যেই সীমিত রাখিবার,—তাহা ছিল কার্যত মূল্যহীন ও পশ্চাদমুখী ব্যবস্থা। সামাজিক পরিবর্তনে ইহা মূল্যহীন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে হিন্দুকলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহা সার্থক হইল। কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা শ্রেণীগত, বৃত্তিগত বা জাতিগত নয়—ইহা ধর্ম নিরপেক্ষ মানবমুখী। পরিবর্তনের চাপেই হিন্দুকলেজের গর্ব চরিত্র আর বজায় থাকা সম্ভব হইল না।

'শিক্ষক : ডিরোজিও :—১৮৩১ সালে 'জেনারেল কমিটি' (Public Instruction) হিন্দুকলেজের অতি উচ্চমানের শিক্ষণ প্রণালী ও শিক্ষামানের জন্য গর্বের সহিত লিখিলেন :—A command of the English language and a familiarity with its literature and Science (had) been acquired to an extent rarely equalled by any schools in Europe.

ইহার পূর্বেই হিন্দুকলেজের ও সর্বকালের আদর্শ শিক্ষক ডিরোজিও ছিলেন হিন্দু-কলেজের ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের শিক্ষক। তিনি স্বয়ং কবি, দার্শনিক ও স্বাদেশিক ছিলেন। তাঁহার প্রথাগত শিক্ষণ পদ্ধতির বাহিরের শিক্ষায় ছাত্রগণ জ্ঞানস্পৃহায় জাগরিত হইয়া সর্ববিষয়েই বলিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠিত।

তাঁহার দ্বারা পরবর্তী শতাব্দীতে ভারতের সার্বিক জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তনের সূচনা হয়।

রিচার্ডসন ঃ—ইহার পরই ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন ইংরাজী সাহিত্যের শিক্ষকরূপে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনিও কবি ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুও বলিয়াছেন যে 'রিচার্ডসন সাহেবের পাঠের দৌলতেই তার মধ্যে সাহিত্যিক প্রেরণা আসিয়াছে'। তিনি হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন।

থিওডোর ডিকেনস—বিখ্যাত ব্যারিষ্টার; আইন বিষয়ে অধ্যাপক।

জন পিটার গ্রাণ্ড—বিখ্যাত ব্যারিষ্টার। পরে সুপ্রিম কোর্টের জজ হন।

স্পীড সাহেব—কঠোর স্বভাবের শিক্ষক ছিলেন। তিনি 'ইণ্ডিয়ান গার্ডেনার নামে পুস্তক রচনা করেন। ভারতে এরারুটের প্রথম চাষ করেন। তিনি হিন্দু-কলেজের হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন।

হালফোর্ড—তিনি শব্দ শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কথোপকথনের সময়ও বড় বড় কঠিন শব্দ ব্যবহার করিতেন।

ক্লিণ্ট (Leonidas Clint)—গণিত ও সাহিত্য উভয় শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত। সাময়িক অধ্যক্ষ।

কর (J Kerr)—আপাত কঠোর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্নেহার্দ্র হৃদয় অধ্যাপক। ১৮৪৩ হইতে ১৮৪৮ পর্যন্ত তিনি হিন্দুকলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। Domestic Economy of the Hindus' এবং 'Glimses of India গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।

লজ সাহেব—প্রিন্‌সিপ্যাল।

সটক্লিক—প্রিন্‌সিপ্যাল।

কাউএন—
ক্রেকট—
টনি— } সার্থক অধ্যাপক।

প্যারিচরণ সরকার—সার্থক অধ্যাপক।

পিতাম্বর ভট্টাচার্য—প্রথম ভারতীয় (১৮২৭) (Senior Class)।

রসময় দত্ত—শেষ সম্পাদক (১৮৪১-৫৪)

তারিনীচরণ ঘোষ—প্রথম লাইব্রেরিয়ান (১৮৩৯) রেকর্ড অনুযায়ী)

রবার্ট হ্যাণ্ড—ইংরাজী অধ্যাপক।

রিচার্ড জোনস—হেডমাষ্টার, অধ্যাপক (১৮৪৬-৬৩) দর্শন বিভাগ।

রামচন্দ্র মিত্র—বাংলার অধ্যাপক। (১৮৪৩-৬৩)।

রস (V. L. Rus)—(১৮৩৫-৫২) অঙ্কশিক্ষক।

হিন্দুকলেজের শিক্ষা পদ্ধতির বিশেষত্ব নির্দিষ্ট পাঠক্রমে সীমিতনয় ঃ শিক্ষার মান সম্পর্কে বলিতে গিয়া রাজনারায়ণ বসু তাঁহার সেকাল আর একালে বলিয়াছেন' "পূর্বে হিন্দুকলেজে কোন নির্দিষ্ট পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত না ও গ্রন্থের একটু, এরূপ করিয়া পড়ানো হইত না, ছাত্রদিগকে নিজে কতই পড়িতে হইত, তাহার সীমা নাই। তাঁহারা নিজে যাহা পাঠ করিতেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে শিক্ষক যাহা পড়াইতেন, তাহা অতি অল্প বলিতে হইবে। এখনকার এনট্রান্‌স কোর্স, ফাষ্ট আর্টস কোর্স ও বি. এ. কোর্স সমস্ত একত্র কর, কত বড় হইবে ? ইহাতে ইংরাজী সাহিত্যে কি বিদ্যা হইতে পারে ?'[২৪]

আলোচনী সভার মাধ্যমে জ্ঞান বিস্তার—ডিরোজিও, রিচার্ডসনের মধ্যদিয়া বিদ্যা অর্জনই নয়, বিদ্যা স্পৃহা জাগ্রত হইত। অতএব পাঠের কোন সীমা ছিল না। জ্ঞানার্জনই উদ্দেশ্য হওয়াতে সীমিত বিদ্যাকে পণ্য করিয়া মূর্খতার পরিচয় দানের স্পৃহা সেকালে ছিল না বলিয়াই কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ডিরোজিওর সাক্ষাত ছাত্র না হইলেও তাঁহার সাহচর্যে ও আলোচনী সভায় অংশগ্রহণ করিযা জ্ঞানের সীমা অপার করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলীর স্ফুরণ হইতে পারিয়াছিল।

শিক্ষিত ছাত্রগণকে স্বদেশীয় সাহিত্য সংস্কৃতির উন্নয়নে প্রচেষ্টা করা—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাতাদিগের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ছাত্রদিগের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান স্পৃহা সঞ্চারিত করা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষাব দ্বারা স্বীয় সৃজনী শক্তির প্রসারণের দ্বারা ভবিষ্যতে দেশীয় সাহিত্য ও জ্ঞান ভাণ্ডারের উন্নতিসাধান করা। ডিরোজিওর শিক্ষণের দ্বারা ছাত্রদিগের মধ্যে কবিত্ব শক্তির উন্মেষ হয়। বিভিন্ন বিষয়ের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচিত হয় এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ কাব্য সৃষ্টির প্রয়াসের বৃদ্ধি হয়। হিন্দুকলেজের প্রথম যুগের ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাংলা ভাষায় রচনা না করিলেও ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই প্রথম ভারতীয় দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেন। তাঁহার রচনা "Bengal Annual, Literary Gazette" ও Calcntta Magazine"—এতে ১৮৩০ সালেই জাতীয়তাবোধের প্রচার করিতে সমর্থ হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল, ইংরাজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই দেশে শিকড় গাড়িতে আরম্ভ করে দৃঢ় ভাবেই। ১৮৩০ সালেই কাশীপ্রসাদ ঘোষ Indian Gazette এতে লিখেন—[২৫]

"Land of the Gods and lofty name ;
Land of the fair and beauty's spell ;
Land of the bards of mighty fame ;
My native land ! for ever farewell !"

ডিরোজিও হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের শিক্ষার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে উচ্চ আশাবাদী

ছিলেন। তাঁহার "To the students of the Hindoo College" কবিতায় বলিয়াছিলেন—"And how you worship truth's omnipotence,

What joyance rains upon me, when I see
Fame, in the mirror of futernity
Wearing the Chaplets you have yet to gain
And then I feel I have not lived in vain."
Chaplets you have yet to gain—
And then I feel I have not lived in vain."

শিক্ষকের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যও সার্থক এবং হিন্দুকলেজের শিক্ষা পদ্ধতির সার্থকতাও ইহাই। হিন্দুকলেজের প্রায় ছাত্রের মধ্যেই এইসকল গুণের প্রকাশ হইয়াছে। তাই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতবর্ষ সামাজিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, ধার্মিক প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই হিন্দুকলেজ সংশ্লিষ্টদিগের দ্বারা প্রভাবিত ইহাদিগের সকলেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশের সামগ্রিক উন্নতি।

এমন কি যাহারা ছাত্রাবস্থায় বাংলা ভাষার নামমাত্রও প্রকাশ্য অনুশীলনের কোন স্পৃহা দেখান নাই তাহাদেরও উদ্দেশ্য ছিল শেষ অবধি দেশে সামগ্রিক উন্নয়ন। ছাত্রাবস্থায় হিন্দুকলেজে মধুসূদন বাংলা ভাষাকে অশিক্ষিতের ও বর্বরের ভাষা বলিয়া বিস্মৃত হওয়াই ভাল বলিয়া প্রচার করিতেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যেও শিক্ষক রিচার্ডসনের প্রভাব কবিত্ব শক্তির উন্মেষে সহায়তা করিয়াছিল। রিচার্ডসন ডিরোজিওর ন্যায় ভারতপ্রেমিকতো ছিলেনই না বরং তিনি স্বাধীন উন্নত ভারত কল্পনার উগ্র বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি মূলত ছিলেন কবি ও সাহিত্য প্রেমী। তাই তাঁহার সাহচর্যে সেক্সপিয়র পাঠে ছাত্রদিগের মধ্যে সাহিত্য প্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সাহিত্য সৃজনের স্পৃহা উন্মুখ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করিয়া ব্যক্তি প্রতিভাকে জাগ্রত করা ও সৃজনমুখী করাই ছিল তাঁহার ও হিন্দুকলেজ স্রষ্টাদিগের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যেই রিচার্ডসনের উগ্র স্বাধীনচেতা ভারতীয়বাদের বিরোধী ব্যক্তিত্বও ছাত্রদিগের ব্যক্তিত্ব নির্ভর প্রতিভার উন্মেষে বাধার সৃষ্টি করে নাই। বরং তাঁহারই প্রভাবে বাংলা বিরোধী মধুসূদনের মধ্যেও কবি প্রতিভার উন্মেষ সম্ভব হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বসুও সেই স্বীকৃতিই জানাইয়াছেন।

মধুসূসদন দত্ত সিনিয়র বিভাগের পাঠ্যবস্থায় বহু ইংরেজী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কিছু কিছু' জ্ঞানান্বেষণ, "Literary Gazette" প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া প্রশংসিত হইয়াছিল। পাঠ্যাবস্থাই বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন "Oh ! how should I like to see you write my 'Life', if I happen to be a great poet, which I am almost sure I shall be, if I can go to England.' এবং শেষ অবধি মধুসূদন বাংলার

অবিস্মরণীয় কবি হইয়াছিলেন---ইংরেজী ভাষায় নয়, বাংলা ভাষায়। ইংরেজমুখী এই কবিত্বশক্তি ভাবপ্রকাশের মাধ্যমের জন্য পর্যুদস্ত হইতে পারে নাই, বরং প্রখর ও পরিশীলিত করিয়াছে। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যই তাহার স্বাক্ষর বহন করিতেছেন। ছাত্রাবস্থাতেই মধুসূদন ইংরেজীর সমান তালেই বাংলা ভাষাতেও কবিতা রচনায় পটু ছিলেন। তাহার প্রমাণ পাইতেছি ছাত্রাবস্থায় সুহৃদ গৌরদাস বসাকের অনুরোধে বর্ষাঋতু বর্ণনাচ্ছলে ইংরাজী 'acrostic' শ্রেণীর তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত বাংলা কবিতাটিতে :—

বর্ষাকাল

গভীর গর্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদ নদ ধরণী উপর।
রমনী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি দেব, যক্ষ সুসিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝনঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়॥[২৬]

ইহাতে যে কয়টি পংক্তি আছে, তাঁহার প্রথম বর্ণগুলি একত্র করিলে গউর দাস বসাক এইরূপ হয়। ইংরাজ Acrostic শ্রেণীর সুন্দর রচনা বাংলায় করা হইয়াছে। তাই রিচার্ডসনের প্রভাব সত্বেও ডিরোজিও প্রদর্শিত পথেই ছাত্রগণ কুসংস্কার অনেকাংশেই দূর করিয়া অশন-বসনের পরিবর্তন সমাধন করিলেও স্বাদেশিকতায় দৃঢ় মূল হইয়াছিলেন। মধুসূদন মাইকেল হইলেন, জীবনে সংযমহীন হইয়া দুঃখ ভোগ করিলেন, কিন্তু কখনই বিদেশী হইতে পারেন নাই। তাই তাঁহার স্বচ্ছ পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী বিচার নির্ভর দৃষ্টি কবিদিগের প্রকৃত আর্কষণীয় বস্তুটিকে গ্রহণ করিযাছে। বিদেশী বলিয়া প্রয়োজনীয় কোন কিছুতেই ত্যাগ করিতে দেখা যায় না। গৌরদাসকে লিখিত পত্রে তিনি বলেন :—"Do you dislike Moore's poetry because it is full of orientalism ; Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism ?"

বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে সমালোচনার দৃষ্টিও বিভিন্ন হওয়া উচিত। ইহাই আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার মূল বক্তব্য—তাই প্রগতিশীল। হিন্দুকলেজ ছাত্র মধুসূদনের মধ্যেও তাঁহারই প্রকাশ দেখিতে পাই—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রে—"Our social and moral developmente are of different character. We no doubt actuated by the same passion, but in us those passions assure a milder shape." তাই ভারতে সবই পাশ্চাত্যের মত হইবে এমন নহে।

১৮৭১ সালে ঢাকায় বহুবিবাহের স্বপক্ষে মন্তবচনের স্থূল উল্লেখে মধুসূদন 'মন্বাদি শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া তাহা বুড়ী গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন"।[২৭] ইহা দ্বারা হিন্দুকলেজের শিক্ষায় পাশ্চাত্য প্রেমের নিদর্শনের সন্ধান করিলে ভুল হইবে। ইহা ছিল সামাজিক বাস্তব প্রয়োজন অন্যথায় দেশের ও দশের প্রগতির পথ হইত রুদ্ধ। ইহার মাধ্যমেই ডিরোজিওর আশার সার্থকতা বাস্তব রূপ লইয়াছিল ভবিষ্যতে।

ঢাকার সম্বর্দ্ধনা সভায়—একজন যুবক বলিয়াছিলেন যে—" আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহা গৌরবান্বিত হই তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই — — —।[২৮]

সেকালের সর্বসাধারণের বুঝি হিন্দুকলেজ শিক্ষিতদিগের সম্বন্ধে এমনই ধারণা হইয়াছিল বিরুদ্ধবাদীদিগের উগ্র প্রচার কাযের জন্য। সামান্য অঙ্গসজ্জায় পরিবর্তনেই তাঁহারা উচ্চকিত হইতেন, চতুর্দিকে সাড়া পড়িয়া যাইত 'গেল গেল সব গেল'। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা কুসংস্কারের ধ্বজাধারীদিগের আর্তনাদ মাত্র। এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের সম্বর্দ্ধনা সভায় উত্তরটি প্রণীধানযোগ্য।

"আমার সম্বন্ধে আপনাদের যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ-ভ্রমটি হওয়া মহা অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি শুদ্ধ বাঙ্গালী নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটী যশোহর।[২৯]

হিন্দুকলেজের শিক্ষায় ছাত্রগণের মধ্যে কিন্তু শেষ অবধি স্বজাতিপ্রেম ও দেশীয় সংস্কার প্রীতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। স্বজাতি ও স্বদেশকে পাশ্চাত্যের সমপর্যায় ভুক্ত করিবার প্রচেষ্টা তাঁহাদের মধ্যে দৃঢ় হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা সমস্ত প্রথাকেই আঘাত করিয়া বাজাইয়া লইবার প্রচেষ্টায় ছিলেন সচেষ্ট। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা যাহা সম্ভব হয় নাই— তাহা সম্ভব হইল পাশ্চাত্য জ্ঞানসমৃদ্ধ মধুসূদনের দ্বারা এবং মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া সর্বপ্রথম হিন্দুকলেজের অপর ছাত্র কালীপ্রসন্ন সিংহই অমিত্রাক্ষর ছন্দ সার্থকভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহাব 'হুতোম প্যাঁচার নক্সার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের গোড়ায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে দুইটি কবিতা আছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন ও স্বদেশ প্রীতি—

রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছেন— "চরিত্র বিষয়ে একালে দুইটি বিষয়ে উন্নতি—— দেখা যাইতেছে। এক উৎকোচ গ্রহণে বিরতি, আর —— স্বদেশপ্রিয়তা। সেকালে ঘুষ লওয়া বড় একটা দোষ বলিয়া গন্য হইত না। কারণ ছোট বড় প্রায় সকল লোকেই উহাতে কিছু না কিছু লিপ্ত থাকিতেন। এখন সুশিক্ষিত ছেলের মধ্যে ঘুষ লওয়া বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। সেকালের লোক-দিগের স্বদেশের প্রতি একটা কর্তব্যবোধ ছিল না, এখন ক্রমে ক্রমে লোকের মনে যে কর্তব্যবোধ জন্মিতেছে বলিতে হইবে।"[৩০] এই বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক

তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ পূর্বে সমাজের মধ্যে বিশেষত উদ্যমশীল, দুঃসাহসী বিত্তবানদিগের কুসংস্কার রক্ষা করিয়া যেন তেন প্রকারেণ অর্থ উপার্জনই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আধুনিকতার জাগরণী মন্ত্রে ব্যক্তিমুখী ব্যক্তিসর্বস্ব বুদ্ধিবাদী যুক্তি মানুষকে মর্যাদা বোধ দিয়াছে এবং তাহা হইতে স্বাদেশিকতার স্ফুরণে ব্যক্তি সমাজ ও সমগ্র জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন আসিতে পারিয়াছে বলিয়াই "হিন্দু-কলেজের ছেলেরা মিথ্যা কথা বলিতে পারে না, অসদাচরণ করেনা, অসচ্চরিত্র নয়" বলিয়া সমাজে প্রচারিত। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দুকলেজ হইতে এই ভাবের প্রসার লাভ করে বলিয়াই রেনেসার কেন্দ্রই হইয়াছে কলিকাতা।

হিন্দু কলেজের শিক্ষা পদ্ধতির সহিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরবর্তী শিক্ষা পদ্ধতির পার্থক্য ঃ

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার পর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃত বিদ্যা প্রসার কমিয়া গিয়া ডিগ্রী স্পৃহা বর্ধিত করে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র পরীক্ষা মাধ্যমে ডিগ্রী প্রদায়িনী সংস্থায় পরিণত হইয়াছে। হিন্দুকলেজের আদর্শচ্যুত শিক্ষা ব্যবস্থার কি অবস্থা তাহার সম্বন্ধে সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন রাজনারায়ণ বসু ঃ--"এখন শুনিতে পাই (১৮৯০) কলেজের ছাত্রেরা কেবল শ্রোতা। শিক্ষক ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছেন, বালকেরা কেবল নোট লিখিতেছেন, বৈশম্পায়ন বক্তা, পরিক্ষিৎ শ্রোতা। না আছে বালক কর্তৃক শিক্ষককে জিজ্ঞাসা, না আছে শিক্ষক কর্তৃক বালককে জিজ্ঞাসা। আমি শিক্ষায় এই প্রণালী ঘৃণা করি। আমি বালকদিগের জন্য বিতর্ক সভা সংস্থাপন করিয়াছিলাম। তাহাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি চালনা ও বক্তৃতাশক্তি সঞ্চার হইবার জন্য তাহা স্থাপন করি।[৩১]

ডিরোজিওর ছাত্র না হইলেও দেশে ডিরোজিও প্রদর্শিত শিক্ষাদানের, শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের পন্থা তাঁহার ছাত্রগণ এমন ভাবেই অনুসরণ করিয়াছিলেন যে বহুযুগ পরেও আলোচনী সভার প্রয়োজনীয়তা ও ক্রিয়াশীলতার প্রমাণ রাজনারায়ণ আপন শিক্ষক জীবনেও অনুসরণ ও প্রবর্তন করিয়া সুফল পাইয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীতেও এই যুক্তি অকাট্য।

হিন্দুকলেজ শিক্ষা পদ্ধতিতে জ্ঞান স্পৃহা উদ্দেশ্য ছিল—

জ্ঞানস্পৃহা-যুক্ত বিদ্যার্জনের সীমা নাই। হিন্দুকলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় তাই বিদ্যাদানই উদ্দেশ্য ; সময়ের সীমা নির্ধারণের দ্বারা বিদ্যানুরাগীদিগকে স্তব্ধ করিয়া দিবার প্রথা সঠিকভাবেই অনুসারিত হয় নাই। রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন—" হিন্দুকলেজে যতদিন থাক, ছাত্রবৃত্তি উপভোগ করিয়া পড়, তাহাতে অধ্যক্ষেরা আপত্তি করিতেন না! অধিক দিন ছাত্রেরা পড়িবে বলিয়া এই সকল ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইত।[৩২] এই পন্থা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীকে সরস্বতীর একান্ত ভক্ত করিয়াছিল বলিয়াই লক্ষ্মী ও তাঁহাদের অনুগ্রহ করিতেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে

সরস্বতী ডিগ্রী দ্বারা দূরে অপসারিত হন লক্ষ্মী সেবার অতি উৎকট প্রেমে তাঁহার ফল হইয়াছে—বাঙালী বিংশ শতাব্দীতে লক্ষ্মী সরস্বতী দুই ভগিনী দ্বারাই উপেক্ষিত। ১৮২৫ সালের রিপোর্টে উইলসন হিন্দুকলেজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

'The main channel by which real knowledge may be transferred from its European sources into the intellect of Hindusthan.' তাই বিদ্যালয়ে ইহার পূর্বে অধ্যক্ষ সভার সভ্যদিগের মধ্যে উৎকট নানা বিষয়ে মতানৈক্যের জন্য অগ্রগতি না হইলেও ক্রমে পাশ্চাত্যবিদ্যার সুষ্ঠু প্রসারণে ইহার প্রভূত উন্নতি হয়। উইলসন ১৮২৮ সালে ১৮২৪ সাল অবধি শিক্ষামানের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে ইহার উন্নতি আশ্চর্যজনক।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ১৮৩৪ সালে হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—"হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্রগণ বেকন (Bacon)' লক (Locke), বার্কলে (Berkeley) হিউম (Hume) রীড (Raid) স্টুয়ার্ট (Stewart) প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের শ্রেষ্ঠ রচনার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করে। এই পরিচয়ের ফলে তাঁহাদের গতানুগতিক চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক আলোড়নের সূত্রপাত হইতে থাকে। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহারা প্রশ্ন ও তর্ক করিতে আরম্ভ করে। ফলে তাঁহাদের অনেক প্রচলিত বদ্ধমূল ধারণার মূল নড়িয়া যায়। বহুকালের বাছা বাছা সব অচল আস্থার স্তম্ভ টলমল করিয়া ওঠে।"

"তাঁহারা ঐতিহাসিক বিষয় হইলে পিবল, রাজনৈতিক বিষয়ে অ্যাডম স্মিথ ও জেরেমি বেন্থাম, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে নিউটন ও ডেভি, ধর্মীয় বিষয়ে হিউম ও টমাস-পেন, অধ্যাত্মিক বিষয়ে লক, রীড ষ্টুয়ার্ট ও ব্রাউন প্রমুখ মনীষীদিগের রচনা হইতে তর্কের মধ্যে আপন উক্তির সমর্থনে অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করিতেন।" এই প্রশস্তি ইয়ংবেঙ্গলদিগের প্রতি বীতরাগ ডাফের।

তাই পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীব তরুণদিগের দ্বারা উনিশংশতকের বাংলায় তথা ভারতবর্ষে প্রথম নবজাগরণের কালে বিস্ফারক বৈপ্লবিক পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা বিংশ শতাব্দীতেও স্মরণীয়।

হিন্দুকলেজে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কিছু পাঠ্য তালিকা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে কেন ডঃ ডাফ, ডঃ উইলসন, রাজনারায়ণ বসু ও রেঃ লাল-বিহারী দে এত প্রশস্তি গাহিয়াছেন।

ইংরেজী সাহিত্য—বেকনের রচনাবলী।

সেকস্‌পীয়রের—ম্যাকবেথ, কিংলিয়র।
ওথেলো, হ্যামলেট।
মিল্‌টন—প্যারাডাইস লষ্ট।
লিসিডাস (Lycidas) কোমাস (Comus)
L. Allegro, II Pensaroso, Sonnets etc.

পোপ—Essay on criticism,
Rape of the Look, Eloisa to Abelard.
Elegy on the Death of a young Lady, Prologue to the Satıres etc.
ইয়ং —Night thoughts,
গ্রে—Poems

ইতিহাস—পুরাবৃত্তে কোন পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত তাহা নির্দ্ধারিত না থাকাতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বৎসরের ভিতর পড়িতে হইত :—

Humes—History of England (unabridged).
Gibbon's—Roman Empire (,,)
Mitford's—History of Grecce.
Ferguson's—Roman Republic.
Elphinstones--India.
Russell's—Modern Europe.
সর্বশুদ্ধ প্রায়—৩৬ খণ্ড।
ইউক্লিড—১ম ছয় খণ্ড ও একাদশ খণ্ড।
গণিত—Euclid—First 6 Books and 11th Book.
Algebra—Plane and Spherical.
বীজগণিত—সমতল ও মাণ্ডলিক ত্রিকোণ মিতি।
Trigonometry.
Analytical Conic Sections.
(বৈশ্লেষনিক কনিক এর অংশসমূহ)।
Differential and Integral Calculus.
(অন্তরকলন এবং সমাকলন)
মিশ্রিত গণিত—Whewell's Mechanics.
(হেওয়েলের বলবিদ্যা)
Bukley's Astronomy
(বার্কলির জ্যোতিষ)
Websters' Hydrostatics.
(ওয়েবষ্টারের তরল পদার্থের স্থিতিশক্তি বিজ্ঞান)
Phelps Optics.
(ফেলপের আলোক ও চক্ষুবিদ্যা)
Calculation of Eclipses"
(গ্রহণ-এর হিসাব)

ছাত্র :—১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয় মাত্র ১৩ জন অবৈতনিক ও ৭ জন সাধারণ ছাত্র অর্থাৎ সর্বশুদ্ধ ২০ জন লইয়া।

পরবর্তী তিনমাসে ছাত্রসংখ্যা হয়—৬৯ জন।

পরবর্তী সাত বৎসর প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা, অর্থাভাব, (বারেটা সংস্থার দেউলিয়া হওয়াতে সমস্ত গচ্ছিত অর্থ ডুবিয়া যায়), সিনিয়র শ্রেণীর পাঠ তখনও সঠিকভাবে আরম্ভই হইতে পারে নাই—শিক্ষক অভাবে, কমিটিতে আত্মকলহের জন্য ছাত্রসংখ্যা বিশেষ হয় নাই। কলেজের নিজস্ব গৃহ না থাকায় ব্যয় সংক্ষেপের জন্য স্থান পরিবর্তনও ইহার একটি কারণ।

১৮২৬ সাল হইতেই সংস্কৃত কলেজের বিস্তৃত স্থানের সুবিধায় সংখ্যাবৃদ্ধি জনিত উপরোক্ত কারণগুলি অনেকাংশে দূরীভূত হয়।

১৮২৬ সাল	—	ছাত্র সংখ্যা	২২৩ জন + বিনাবেতনে ছাত্র।
১৮২৭ ,,	—	,,	৩০০ জন + বিনাবেতনে ,,।
১৮২৮ ,,	—	,,	৩৩৬ জন + ১০০ = ৪৩৬ জন।
১৭-২-১৮৩১		,,	মোট= ৫৩৪ জন।
১৮৩৯		সিনিয়র ছাত্র ৫৩৯+৩ ২	=৯১১ জন।

১৮৫০-৫১ — — ৪৫০ সিনিয়র ছাত্র — = অর্থাৎ সংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধিপায়।

হিন্দুকলেজ বন্ধ হয় ১৫-৪-১৮৫৫ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে পাঠ আরম্ভ হয় ১৫- -১৮৫৫। হিন্দুকলেজের পাঠাগারে প্রায় ৭০০০ বই ছিল।

পরীক্ষা পদ্ধতি

পরীক্ষার ব্যবস্থায় **লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার** ব্যবস্থা ছিল। পরীক্ষা হইত বাহিরের সুধী মণ্ডলীর সমক্ষে সভা মধ্যে। বক্তৃতা, আবৃত্তি, নাট্যাভিনয়, রচনা পাঠ সবই হইত। অর্থাৎ শুধু সম্ভাবিত প্রশ্নের বাছা পরীক্ষার সার্থকতার মধ্যে ডিগ্রী দানই তখনও বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হয় নাই।

হিন্দুকলেজ শিক্ষা পদ্ধতির ফলশ্রুতি— হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ অনেকেই সম্পূর্ণ পাঠ সমাপ্তির পূর্বেই জীবন সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহারা বিদ্যাচর্চার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিতেন না। আলোচনা সভায় সুযোগ পাইলেই তাঁহারা যোগদান করিতেন অনুবাদ কর্মে ও পাঠ্যপুস্তক লিখিতে, সংবাদ পত্র সেবায় ও শিক্ষা প্রসারে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও করিতেন। এইসকল কর্মে বিশেষতঃ ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়।

হিন্দুকলেজের স্মরণীয় ছাত্রদিগের ক্ষুদ্র তালিকা :—

১। প্রসন্নকুমার ঠাকুর—প্রথম যুগের ছাত্র। ভবিষ্যতে সমাজসেবা, রাজনৈতিক ও কলেজ পরিচালনায় যুক্ত। সংবাদ পত্র সেবক ও সমাজ সেবক।

২। তাঁরাচাদ চক্রবর্তী—(১৮২২) অবধি পড়িয়াছিলেন। পরে অনুবাদকের কর্মে লিপ্ত হন। লেখক, সংবাদপত্র সেবক, সমাজ সংস্কারক, রামমোহনের সহচর। ডিরোজিওর পর ইয়ং বেঙ্গলের নেতা। ভারতে রাজনীতি চর্চার পথ প্রদর্শক।

৩। শিবচন্দ্র ঠাকুর—প্রথম যুগের ছাত্র। পুরাণ ও অন্যান্য অনুবাদের কর্মে লিপ্ত। বিভিন্ন সমাজ সেবার কর্মে লিপ্ত।

৪। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮২০ হইতে ছাত্র, ডাক্তার হইয়াছিলেন।

৫। কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়—(১৮২৪-২৯) ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত। ভারতীয়দিগের মধ্যে প্রথম ডকটরেট পান প্রাচ্যবিদ্যালয় (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে)। সমাজ ও সংবাদপত্র সেবক, লেখক।

৬। গৌরদাস বসাক—১৮৪৬ ত্যাগ, সমাজ সেবক।

৭। গোবিন্দচন্দ্র বসাক—ডিরোজিও শিষ্য।

৮। রাজনারায়ণ বসু—(১৮৪০-৪৪) সমাজ সেবক, শিক্ষক, লেখক। স্বদেশী ভাবের প্রচারক।

৯। ভোলানাথ চন্দ্র—১৮৪২ ত্যাগ, লেখক।

১০। গোবিন্দচন্দ্র দত্ত—১৮৪৩ ত্যাগ, কবি ও পণ্ডিত।

১১। মধুসূদন দত্ত—(১৮৩৭-৪২) আধুনিকতার সার্থক কবি ও সাহিত্যিক।

১২। রাজেন্দ্রলাল দত্ত (১৮২৮) দানশীল।

১৩। রাজনারায়ণ দত্ত—ইংরেজী লেখক।

১৪। চন্দ্রশেখর দেব—ডিরোজিয়ান।

১৫। গিরিশচন্দ্র দেব (১৮৪১)—হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

১৬। হরচন্দ্র ঘোষ—ডিরোজিয়ান। নীরব সমাজ সেবক।

১৭। কাশীপ্রসাদ ঘোষ—(১৮২১-২৯) ইংরেজী ভাষার কবি বলিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। প্রথম ভারতীয় স্বাদেশিক কবি। সম্পাদক।

১৮। মহেশচন্দ্র ঘোষ—ডিরোজিয়ান।

১৯। রামগোপাল ঘোষ—(১৮৩২), ডিরোজিয়ান, বক্তা। সার্থক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি।

২০। রামতনু লাহিড়ী—১৮২৮ থেকে ডিরোজিয়ান, সার্থক আদর্শ, শিক্ষক।

২১। নলিনীকুমার—১৮৫৪ থেকেডিরোজিয়ান। সার্থক আদর্শ কর্মী। Science Association-এর সহিত যুক্ত।

২২। রসিককৃষ্ণ মল্লিক—ডিরোজিয়ান। সম্পাদক, জ্ঞানান্বেষণ, সরকারী কর্মচারী, সুবক্তা, সমাজ সেবক।

২৩। মাধবচন্দ্র মল্লিক—ডিরোজিয়ান।

২৪। অমৃতলাল মিত্র—সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ সেবক।

২৫। দিগম্বর মিত্র—ডিরোজিয়ান। সমাজ সেবক, সহ সভাপতি, ব্রিটিশ

ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন।

২৬। দীনবন্ধু মিত্র (১৮৫০-৫৫) নীলদর্পণ লেখক, নাট্যকার, সরকার কর্মচারী।

২৭। ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র—১৮৪৬ ত্যাগ, পণ্ডিত।

২৮। প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮৩৫) ডিরোজিয়ান, প্রথম ঔপন্যাসিক, সমাজসেবক, সাংবাদিক।

২৯। কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮৪০) ত্যাগ, লেখক সম্পাদক, সমাজ সেবক।

৩০। অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪৮) উকিল।

৩১। শিবচন্দ্র দেব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—সভাপতি। ডিরোজিয়ান, নীরব আদর্শ কর্মী।

৩২। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫) ত্যাগ, লেখক, প্রথম ভারতীয় ইন্‌সপেকটর অব স্কুল।

৩৩। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—ডিরোজিয়ান, আধুনিক উত্তরপ্রদেশের প্রগতির নেতা।

৩৪। রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—স্কুল ইন্‌সপেক্টর।

৩৫। জগদীশনাথ রায় (১৮৪১-৪৬) বিদ্বান। উচ্চ সরকারী কর্মচারী।

৩৬। কৃষ্ণচন্দ্র রায়—হেড মাষ্টার, হিন্দুস্কুল ও হেয়ার স্কুল।

৩৭। রমাপ্রসাদ রায় (১৮৩১) হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় জজ। রামমোহনের পুত্র।

৩৮। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (১৮৪১-৪৯) বিদ্বান সরকারী উচ্চপদাধিকারী।

৩৯। মহেন্দ্রলাল সরকার— (১৮৫০-৫৪) চিকিৎসক। Science Association-এর প্রতিষ্ঠাতা, সমাজ সেবক।

৪০। কেশবচন্দ্র সেন (১৮৪৫-৫৪) ব্রাহ্মসমাজের নেতা।

৪১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—লেখক, ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠাতা, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্রনাথের পিতা। ভারতবর্ষীয় সভার প্রথম সম্পাদক।

৪২। নবীনচন্দ্র সেন (১৮৫১) কবি। সরকার উচ্চ কর্মচারী।

৪৩। রাধানাথ শিকদার—ডিরোজিয়ান, এভারেষ্ট শৃঙ্গের আবিষ্কারক ও প্রথম ভারতীয় Computer ও সার্ভে বিষয়ক লেখক, সম্পাদক, মাসিক পত্রিকা'।

৪৪। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৮৪২) ত্যাগ, প্রথম ব্যারিষ্টার।

৪৫। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—(১৮৪৮) আর্টের পোষক ও উৎসাহী।

৪৬। নীলমণি বসাক—লেখক।

৪৭। হরচন্দ্র ঘোষ—ডিরোজিয়ান, সমাজ সেবক।

৪৮। উমাচরণ বসু—'এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সম্পাদক। ডিরোজিয়ান, সমাজ সেবক।

৪৯। রাজেন্দ্রলাল মিত্র—প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

অনারারী ডক্টরেট। সম্পাদক, সমাজ সেবক।

৫০। কালীপ্রসন্ন সিংহ—সম্পাদক, লেখক, সমাজ সেবক, সাংস্কৃতিক নেতা।

৫১। রামচন্দ্র মিত্র—হিন্দুকলেজের বাংলা শিক্ষক হন। সম্পাদক।

ডিরোজিও ঃ তাঁহার শিক্ষা পদ্ধতির ফলশ্রুতি—

হিন্দুকলেজে ডিরোজিও মাত্র ৫ বৎসরের শিক্ষকতার সাহচর্যের মাধ্যমে নব্য-শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনের সূচনা করেন। প্রাথমিক তারুণ্যের উচ্ছলতার অবসানে শিষ্যদের কর্মজীবনে একদা শিক্ষালব্ধ চিন্তায় নবজীবনের উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের পরবর্তী মহত্তর জীবনাদর্শের সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে। সমগ্র উনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের তীব্র সমালোচনার আক্রমণ সহ্য করিয়াও ডিরোজিওর চিন্তাদর্শ নবযুগের শিক্ষিতদের মননশীলতাকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। একমাত্র কারণ না হইলেও বলা যায় যে তাঁহার শিষ্যদের প্রচেষ্টাতেই প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, নবযুগের বিজ্ঞানমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে, সত্যানুসন্ধানের আদর্শ মধ্যশিক্ষিত মানসে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে কর্মজীবনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সংগ্রামের মধ্যদিয়া বাঙালী মনীষাকে স্বদেশ ও সংযোগ সাধনে ব্যাপৃত করিয়াছে। এইদিক হইতে ইয়ং বেঙ্গলদের বিদ্রোহেই নবজাগরণেব প্রধান ইঙ্গিত নিহিত ছিল। অন্তত. পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মুখ্য ফলগুলি জাতীয় চিত্তে সঞ্চারিত করিবার কৃতিত্ব ডিরোজিওর। ডিরোজিয়ানরাই সেকালের বাঙালী জাতির ভবিষ্যত নায়ক, নব্যধারার ধারক ও বাহক। তাহাদেরই মুক্ত মানসের স্বাদেশিকতার ও আধুনিকতার চিন্তাধারা ও সংগ্রাম প্রচেষ্টা শিক্ষিত মানসে প্রভাব বিস্তার করিয়া নূতন পথে দিশারী হইয়াছে এবং ফলে পরবর্তী বাংলা সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে সহস্র বৎসরের স্থাবরতাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নবযুগের দ্রুত গমনের ক্ষমতা দিয়াছে।

সে যুগের সমাজ জীবনের সর্বস্তরে ডিরোজিয়ানরা সততার আদর্শ স্থাপন করেন। শাসন ব্যবস্থার ও সমাজজীবনের সর্বস্তরেই দায়িত্বহীনতা, স্তাবকতা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদির নিদর্শন স্পষ্ট হইলেও ডিরোজিয়ানরা সত্যের প্রতীক বলিয়া সমাজে পরিগণিত হইতেন এ কথা তাহাদের সমালোচকেরাও বলিয়াছেন। সতীদাহ নিবারণ, বহুবিবাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন (ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বেই শাস্ত্র বিচারে ও জন সচেতনার প্রচেষ্টায় তাঁহারা ব্যাপৃত ছিলেন।) প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারের প্রচেষ্টায় তাঁহারা ছিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামী। নীল বিদ্রোহ, তথাকথিত' কালা আইন' আন্দোলন প্রভৃতিতে তাঁহারাই নেতৃত্ব করিয়াছেন। রিচার্ডসনের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত সাদা চামড়ার ধ্বজাধারীদের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিয়া দেশীয়দের সাহেব ভীতি দূর করিতে চাহিয়াছেন। আদর্শ শিক্ষক হিসাবেও ডিরোজিওর পর ডিরোজিয়ানদেরই নাম লইতে হয়।[৩৩]

ডিরোজিওর জীবনে তাঁহার গুরু ডেভিড ড্রামণ্ড নামে ডেভিড হিউমের চিন্তা-

ধারায় পক্ষপাতী ও ভারতবর্ষীয় ইংরাজদের দৃষ্টিশূল স্বাধীন চিন্তার নায়ক, এক স্কুল পরিচালকের প্রভাব ছিল গভীর। ড্রামণ্ডের স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাই ডিরোজিওর জীবনে প্রাধান্য পায়। ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারাও তাঁহার মনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাই ফরাসী বিপ্লবের পর ইংরাজী সাহিত্যে যে রোমান্টিক বন্ধন মুক্তির প্রেরণা দেখা দিয়াছিল ডিরোজিওর মানসিক ভিত্তি তাহাতেই গড়িয়া উঠে। সেদিনের অতি আধুনিক দুর্মূল্য বইয়ের আগ্রহী ক্রেতা ছিলেন তিনি। বাস্তব জীবনেও তাঁহার পরিচয় বিপ্লব রূপেই। ড্রামণ্ডের বিদ্যালয়ে ইংরাজ, ভারতীয়, ইউরেশিয়ান ছাত্র সতীর্থের ন্যায় বাল্যবস্থা হইতেই ছিল একাত্ম, ফলে ফিরিঙ্গী হইয়াও ডিরোজিও ভারতবর্ষকেই আপন মাতৃভূমি রূপে গ্রহণ করেন এবং ছাত্রদেরও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করেন। ফরাসী বিপ্লবের সাম্যের ভাবধারা ভারতীয় জীবনে ছড়াইয়া পড়ে তাঁহার মাধ্যমেই। ডিরোজিওর বহু কবিতা স্বদেশ ভারতবর্ষকে লইয়াই রচিত। তাঁহার রোমান্টিক কবিসুলভ ভাবধারার প্রভাব ছাত্রদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। প্রথম দেশীয় জাতীয় কবির শিক্ষা হয় হিন্দু কলেজেই। হিন্দু ছাত্ররাও তাহার সহিত আত্মীয়ের ন্যায় হার্দিক সম্পর্কে ছিল আবদ্ধ। শেষে ছাত্ররা তারুণ্যের প্রাবল্যে নব ভাবধারায় গতিশীল ইউরোপ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতের মধ্যে পার্থক্যের সীমা নির্ধারণে অপারগ হইলেও তাঁহাদের আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। মধুসূদনের ক্লাসিক সাহিত্যের নব ব্যাখ্যা ও নব রূপায়ণের মাধ্যমে পাই জাতীয়তাবাদের স্পষ্ট প্রগতিশীল রূপ পরাধীনতার জ্বালা সেখানে অন্তরের অন্তস্থলে সূচীবৎ বিদ্ধ করে। তাই আধুনিক মানের প্রথম স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় মেঘনাদ বধ কাব্যের মধ্যদিয়া পুরাতন আদর্শ পরিবর্তনে—' রাবণাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম নতুরামাদিবৎ''। পুরাতন আদর্শ ছিল রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম নতুরাবণাদিবৎ'।

ড্রামণ্ড যে প্রগতিশীল স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদের জন্য বাংলার ইউরোপীয় সমাজে একঘরে' ছিলেন— সেই একই কারণের আরও বিস্তৃত ও গভীর সার্থক ব্যবহারিক রূপায়ণের সাফল্যের জন্যই ডিরোজিও তদানীন্তনকালের প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয়দের দৃষ্টিশূল ছিলেন। তাহার প্রগতিবাদী ভাবধারা দেশীয়দের মধ্যে প্রসারিত হইয়া মধ্যযুগীয় অচলায়তন সমাজে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিলে প্রতিক্রিয়াশীলরা পাশ্চাত্য শিক্ষিত নব্য ব্যক্তিত্বের উপর সর্বপ্রকার অত্যাচার করিতে বদ্ধ পরিকর হয় এবং প্রগতিবাদীদের গুরুতেই সমূলে উৎপাটনের প্রয়াসে সার্থক হয়। ডিরোজিও হিন্দুকলেজ হইতে বিতাড়িত হন এবং সেই বৎসরই মৃত্যু হঠাৎ তাঁহাকে গ্রাস করে। কিন্তু সর্বকালের আদর্শ শিক্ষক, আধুনিকতার উদ্‌গাতা, ডিরোজিওর প্রচেষ্টা বিফল হয় নাই। পূর্বে যে সংগ্রাম সমাজ সংস্কারের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমিত ছিল ডিরোজিওর মন্ত্রশিষ্যদের উৎসাহে তাহা দেশীয়দের মধ্যে সংগঠিত আন্দোলনের পথ প্রদর্শন করে। হিন্দু

কলেজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতারূপে ছাত্ররা কলেজীয় পরিচালকদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ডেভিড হেয়ারকে সম্মানিত করেন। শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে অজ্ঞানতার দূরীকরণের কর্মে তাঁহারা গুরুর আদর্শকেই অনুসরণ করেন। ভবিষ্যতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনেও তাঁহারা অগ্রণী। ডিরোজিওর প্রভাবে দুর্বৃত্ত ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ হন চরিত্রবান আদর্শ পুরুষ। আবার কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় খৃষ্টান হইয়াও হিন্দু দর্শন ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ গবেষক এবং প্রথম দেশীয় ডকটরেট। রাজনৈতিক আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয় ইয়ংবেঙ্গলদের ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে স্বার্থ ও সম্মানের সমানাধিকারের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ক্রমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভাবে দেশীয়দের সচেতন করিয়া তুলিয়া রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠার সূচনা করে। ধর্মীয়ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধি পুষ্ট ভাবধারা তাঁহাদের সমাজ সংস্কারে সর্বদাই করিয়াছে উন্মুখ। ডিরোজিয়ান হিন্দু সন্ন্যাসী কাথিয়াওয়ার রাজ্যে সুশাসনের আন্দোলন করেন এবং আজীবন গুরু ডিরোজিওর নামে শ্রদ্ধাবনত ছিলেন।[৩৪] তাঁহাদের বিদ্রোহ ছিল দেশাচারের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে এবং সেক্ষেত্রে তাঁহারা হিন্দু খৃষ্টান দুই ধর্মীয়দের বিরুদ্ধেই ছিলেন সমালোচক।[৩৫] ভারতে নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে নারীর আত্মচেতনতা জাগ্রত করা সম্ভব, তাই তাহারা সেক্ষেত্রে আর্থিক সামাজিক প্রভৃতির সহায়তা করিয়াছেন অযাচিতভাবে। অপর পক্ষে নারীর আর্থিক অধিকার দানের প্রচেষ্টাতেও তাহারা সরকারের সহায়তা করিয়াছেন।

রেনেসার সাংস্কৃতিক অগ্রগতির স্বাক্ষর হিন্দুকলেজীয়দের মাতৃভাষায় উন্নয়নের প্রয়াসে স্পষ্ট। সংস্কৃতের বেড়াজাল হইতে সর্বপ্রথম ইয়ংবেঙ্গলরাই ভাষার সংস্কারের প্রচেষ্টায় ব্যবহারিক ভাষার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হন। প্যারীচাঁদ মিত্রের নক্‌সাজাতীয় উপন্যাস ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে ভবানীচরণের উন্নত সংস্করণ মাত্র নয়, চিন্তায় ও আদর্শে সম্পূর্ণ নূতন, স্বাভাবিক ও আধুনিক। কারণ প্যারীচাঁদের সৃষ্টি, সমগ্র সমাজের স্বার্থরক্ষাকারী, প্রগতিবাদী আধুনিকদের সমাজকে গতিশীল করিয়া সহস্র বৎসরের নিশ্চলতার জগদ্দল পাথরের বোঝা দূর করিয়া দেশকে অগ্রসর করিবার প্রচেষ্টা।

নবজাগরণের প্রভাবে পুরাতনের সহিত আধুনিকতার যে বিচ্ছেদ হয় তাহার স্পষ্টরূপ প্রকাশিত হয় সংবাদপত্র ও সভাসমিতির মাধ্যমে। প্রথমটির মাধ্যমে নব নব চিন্তাধারার প্রসার সম্ভব হয় এবং বিভিন্ন বাক্‌বিতণ্ডার মাধ্যমে পুরাতনের অচলতাকে আঘাত করিয়া নূতনের পথ করিয়া লইবার প্রচেষ্টায় প্রসার হয়। প্রথমাবস্থায় শিক্ষিত এবং ক্রমে সর্ব সাধারণের মধ্যেও অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আসে মানসিকতার সামগ্রিক পরিবর্তন।

দ্বিতীয়টির অর্থাৎ সভাসমিতিব মাধ্যমেও গোষ্ঠি সংযোগ হয়। কিন্তু সে যুগে

স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদীতার প্রসারে নব আদর্শ ও নূতন জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় সভা সমিতির আলোচনা, বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে ডিরোজিও জন-সংযোগের পথ প্রদর্শক।

ব্যক্তিগত চরিত্রকে আদর্শাশ্রয়ী উন্নত করিয়া তুলিবার চিরন্তন প্রচেষ্টা ডিরোজিয়ানদের মধ্যে ছিল প্রবল। ভিক্টোরিয়ান নীতিবাদী ভাবধারার প্রভাব তাহাদের মধ্যেই অধিক। মদ খাওয়ার ও তাহার আনুসঙ্গিক দোষের অপবাদ ছিল সে কালের বাবু সমাজের। ডিরোজিয়ানরা অপরিমিত পানদোষে ও অশিষ্ট ব্যবহারিক আচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হন নাই। সেদিক হইতে তাঁহারা সেকালের বাবু সমাজের মধ্যে অদ্ভুত পিউরিটান।

ডিরোজিওর শিক্ষায় হিন্দু কলেজীয়দের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্য দিয়া বাঙালীর মানসক্ষেত্রে প্রধানত নিম্নলিখিত ভাবধারারই প্রকাশনা ও প্রসার হয়—

১। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ। ইহা সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ।

২। অন্যায়ের প্রতি স্পষ্ট ঘৃণা ও দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা।

৩। যুক্তিবাদী এবং স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী।

৪। জ্ঞানচর্চা ও মননশীলতার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ।

৫। ধর্মের মৌলিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা।

৬। ব্যক্তিগতভাবে চরিত্রবান হইবার চেষ্টা।

৭। শিক্ষাপ্রসার ও নারীর মুক্তি।

৮। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জীবনাদর্শনের প্রতি অনুরাগ এবং দেশীয় সংস্কৃতির ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি এবং অপব্যাখ্যার প্রতি তীক্ষ্ণ আঘাত এবং অবজ্ঞা।

৯। পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শে দেশীয় সাহিত্য ও ভাষার সংস্কার ও প্রসার প্রচেষ্টা।

১০। পাশ্চাত্য আদর্শের বশে তাঁহারা কেবলমাত্র সাহেব ও দেশীয়দের মধ্যেই পার্থক্য মাপিয়া লইতে পারেন নাই এমন নয়, দেশীয়দের মধ্যেও ব্যবহারিকভাবে জাতি-ধর্ম-বিত্ত-সামাজিক পার্থক্য দূরীকরণের প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষভাবে সচেষ্ট হন।

১১। যে কোন প্রকারের দাসত্ব হইতে মানুষের মুক্তির প্রচেষ্টা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দেশীয় সমাজে সমস্যা দেখা দেয় এই ভাবধারাকে কেন্দ্র করিয়াই। রামমোহন রায় ধনিক ও প্রতিষ্ঠিতদের জন্য ভিন্নশ্রেণীর বিচার ধারার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শবাদী ডিরোজিয়ানরা আসিয়াছিলেন বিভিন্ন কুল বিত্তগত সামাজিক পরিবেশ হইতে। ডিরোজিয়ানদের পাশ্চাত্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা জ্ঞান, কুল-বিত্তগত সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনিয়া মিশ্রিত বুদ্ধিবাদী মধ্যবিত্তের সামাজিক মর্য্যাদা ও প্রাধান্য দান করে। মধ্যযুগীয় কুল বিত্ত গত সীমারেখার বন্ধন মুক্ত হয় বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ। সর্বত্রই সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং সমাজ হয় অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন। পরিবর্তন হয় অবশ্যম্ভাবী।

ডিরোজিও ছিলেন আদর্শ জাত-শিক্ষক এবং জাত-রোমান্টিক কবি। ভাগলপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশে তাঁহার কাব্য প্রতিভার বিকাশ হয়। "ইণ্ডিয়া গেজেট" পত্রিকায় তাঁহার রচিত বহু কবিতা প্রকাশিত হয়। পরে তিনি 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন এবং হিন্দু কলেজের সহকারী শিক্ষক পদেও নিযুক্ত হন। ব্র্যাডলি বার্ট পরবর্তী কালে তাঁহার কাব্যগুচ্ছ প্রকাশ করেন এবং একটি মনোজ্ঞ আলোচনান্তে মন্তব্য করেন :—

"তাঁর কবিতায় অসীম উৎসাহ-উদ্দীপনা, চিত্রকল্পের ঐশ্বর্য্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও মৌলিকতার অভাব আছে, এবং তিনি নিঃসন্দেহে সমকালীন বায়রণ ও মুরের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে অকালমৃত্যু তাঁহার রচনাবলীর সুনিশ্চিত সম্ভাবনাকে ব্যাহত করিয়াছে। .. ...তাঁহার কবিতা পড়িয়া এ কথা বেশ বোঝা যায় যে, সহজ সুখের জন্য তাঁহার জন্ম হয় নাই। জীবনকে তিনি বড় বেশী নিবিড় ভাবে অনুভব করিতেন, তাঁহার সহানুভূতি ছিল অতি বিস্তৃত, তাঁহার স্পর্শ সচেতন মন সব বস্তুকেই দেখিত অন্তরের পটভূমিকায়। তাই তাঁহার পক্ষে সমকালীন অন্যান্য লোকদের মত সাধারণ জীবন যাপন করা অসম্ভব ছিল।"[৩৬]

এই মন্তব্য ডিরোজিওর মানসপ্রকৃতির সার্থক ব্যাখ্যা। 'ফকির অফ জাঙ্গিরা' কাহিনী কাব্যের প্রথমে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্য তাঁহার দেশপ্রেমের পরিচিতির স্বাক্ষরবাহী কবিতাই সর্বপ্রথম স্বদেশী কবিতা। এই কবিতা তদানীন্তন কালের ছাত্রদেরই নয়, পরবর্তী যুগের স্বাদেশিকদেরও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাই এ কবিতার অনুবাদ করেন ঠাকুর পরিবারের হিন্দু মেলার উদ্যোক্তা স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ডিরোজিওর প্রতি সেকালের সাংস্কৃতিক পুরোধাদেরও যে অসীম শ্রদ্ধা ছিল তা বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ আধুনিকতার স্পর্শ যাহারা পাইয়াছিলেন এবং যাহাদের ধর্মীয় অন্ধতা মন্দীভূত হইয়াছিল তাঁহারা হিন্দু কলেজ-গোষ্ঠিকেও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে বিচার করিতেন। অনুবাদটি উদ্ধৃত করা গেল :—

"স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার ; হায় সেই দিন যবে
দেবতা-সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্যপদ। মহিমা কোথায় !
গগন বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দিগণ-বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিপুল রতন

কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি ;
তব শুভধ্যায় লোকে অভাগা জননি।"

২০-১২-১৮২০ তারিখ এক পরীক্ষায় "ড্রামণ্ডের স্কুলে' 'ইণ্ডিয়া গেজেট' সম্পাদক ডক্টর জন গ্রাণ্ট উপস্থিত থাকিয়া ছাত্র ডিরোজিওর আবৃত্তি, পাণ্ডিত্য ইত্যাদির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ভবিষ্যত জীবনে তাঁহার সুনিপুণ অধ্যাপনা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, যুক্তিবাদী অগাধ জ্ঞান, সর্বসংস্কার মুক্ত ভাবধারা তাঁহার তরুণ বয়স এবং রোমান্টিক স্বাদেশিকতার ভাবধারার কবিখ্যাতি হিন্দু ছাত্রদের সহিত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনে সহায়তা করে। তাঁহার গুণমুগ্ধ শিষ্যদের মধ্যে অনেকে তাঁহার সমবয়স্ক বা বয়োঃজ্যেষ্ঠ ছিল, অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার ছাত্রও নয়। কিন্তু নিরলস জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে তিনি গড়িয়া তুলিলেন 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' (১৮২৮)। ডিরোজিও স্বয়ং সভাপতি, উমাচরণ বসু সম্পাদক। তাঁহার শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল স্বাধীন চিন্তাশক্তির জাগরণের মধ্য দিযা ছাত্রদের মৌলিক মানসিকতা গড়িয়া তোলা। অনুরাগী ছাত্ররা তাহার নিবাসস্থল ও পথে ঘাটে অবধি তাহার সাহচর্যে আলোচনায় ব্যস্ত থাকিত। ছাত্রদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হইত। ভবিষ্যতে ডিরোজিযানরা এই পন্থা অবলম্বন করিয়া শিক্ষক হিসাবে বিখ্যাত হন।

হিন্দু কলেজের অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলা বাগান বাড়িতে একাডেমিক এসোসিয়েশনের অধিবেশন হইত এবং দেশীয় ও বিদেশীয় নানা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার, সুপ্রিমকোর্টের বিচারক এডোয়ার্ড রায়ান, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মিল প্রভৃতি ইহাতে যোগদান করিতেন। তাঁহারা সভায় আলোচনার উন্নতমান ও আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র্য ও গুরুত্বে মুগ্ধ হন। কাব্য দর্শনাদির সহিত ধর্ম ও সমাজমূলক নানা প্রশ্ন-স্বদেশপ্রেম, পাপ-পুণ্য, সত্যবাদিতা, পৌত্তলিকতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ হইত। দু-একটি আলোচনার নজীর হইতে বিষয়ের বৈচিত্র্যের ও গুরুত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—

১। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বনাম অদৃষ্টবাদ।
২। ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি।
৩। পুতুল পূজা ও পুরোহিত তন্ত্রের অসারতা।
৪। হিন্দু সমাজে সতীদাহ।
৫। স্ত্রী-শিক্ষার অভাব।
৬। বিধবাদের দুর্দশা।
৭। জাতিভেদ।

৮। প্রাচীন দেশাচারের বাড়াবাড়ি।

ইত্যাদি বিষয়ের স্বাধীন আলোচনায় হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্রগণ যোগদান করিতেন এবং এইসকল আলোচনার দ্বারা জ্ঞাত তথ্য ও তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ণে সচেষ্ট হইতেন। ডিরোজিও স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলে (হেয়ার স্কুল) প্রতি সপ্তাহে নীতি ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা দিতেন এবং ইহার ফলও হইয়াছিল সুদূর প্রসারী।

তাঁহার শিক্ষা পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল তরুণদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগাইবার প্রচেষ্টা।[৩৭] কু-শিক্ষা দানের অভিযোগের উত্তরে পদত্যাগ পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—

"আমি ছেলেদের শিক্ষার ভার লইয়া তাহাদের মন হইতে সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূর করিতে তৎপর হই। আমি দুই একটি বিষয় লইয়া স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি যুক্তি থাকা সম্ভব, তা বুঝাইয়া দিতাম। এই বিষয়ে মনীষী বেকনই আমার আদর্শ। তিনি বলিতেন, 'কেহ যদি কোন বিষয় নিশ্চিত ধরিয়া লইয়া আলোচনা আরম্ভ করে, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত তাহার সন্দেহ থাকিয়াই যায়। সন্দেহ নিরাকরণের উপায় থাকে না।'

…মনে একটি সন্দেহের পর আর একটি সন্দেহ জাগিবে, ফলে সকল বিষয়েই অবিশ্বাস জন্মাইবে। কাজে কাজেই আমি কলেজের ছাত্রদের যেমন হিউমের ক্লিন্থিস ও ফিলোর কথোপকথন পড়াইয়া আস্তিক্যের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম মতবাদগুলির সহিত পরিচিত করিয়াছি, তেমনি হিউমের বিরুদ্ধপন্থী ডক্টর রীড ও ডুগাল্ড স্টুয়ার্টের আস্তিক্যের স্বপক্ষে সূক্ষ্মতর জবাবগুলির সহিতও তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছি। ……যদি কয়েকজনের নাস্তিক্যের জন্য আমাকে দায়ী করা হয় তবে অন্যান্যদের নাস্তিকতার জন্য আমার কৃতিত্বও স্বীকার্য।"[৩৮] ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিবাদীতা, অনুসন্ধিৎসা ও স্বাধীন চিন্তার অনুবর্তী হইবার প্রচেষ্টায় তিনি সফল হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাই সত্যের জন্য জীবন ধারণ ও মৃত্যুবরণ করিতে এবং সর্বপ্রকার পাপবর্জন করিতে আমরণ প্রয়াসী হন। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন—

"প্রায়ই প্রাচীন ইতিহাস হইতে ন্যায়বিচার, দেশপ্রেম, মানব কল্যাণ ও আত্ম-ত্যাগের উদাহরণ পড়িয়া শুনাইতেন। যেভাবে তিনি এই বিষয়গুলি বুঝাইয়া বলিতেন তাহাতে ছাত্রদের মনে সেগুলি গভীর প্রভাব বিস্তার করিত। কোন ছাত্র হয়তো ন্যায় বিচারের মহিমায় মুগ্ধ হইত,- কেহবা সত্যনিষ্ঠার পরম গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইত, কেহবা মানবকল্যাণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত।"[৩৯]

ডিরোজিও স্বীয় প্রচেষ্টার প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তিনি ছাত্রদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সংগ্রামীদের দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের ভাবী মনীষার স্পষ্ট রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াই হিন্দুকলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর চতুর্দশপদী কবিতায়

লিখিয়াছেন :

"What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity
Wearing the choplets you are yet to gain
And then I feel I have not lived in vain"

এই স্বপ্ন সার্থক হইয়াছিল। ব্যবহারিক জীবনে ছাত্রগণ যেন সৎ, সত্যবাদী ও ঋজুচরিত্র হয় তাহা ছিল তাঁহার লক্ষ্য। রাজনারায়ণ বসু ডিরোজিওর প্রশংসায় লিখিয়াছেন :

"ডিরোজিওর স্বদেশানুরাগ তাঁহার সদাশয়তা, তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ও জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার কতকগুলি ছাত্র এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাঁহারা সর্বদাই তাঁহার সহবাসে থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ পূর্বক বাঙালীদিগের সংসর্গে এমন বাঙালী হইয়া যান যে তিনি যে সাহেবের পুত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।"[৪০]

হিন্দু কলেজের কেরানী শ্রীহরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যে ছাত্রদের উপর ডিরোজিওর প্রভাব সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে"—প্রায় প্রতিদিনই বিদ্যালয় আরম্ভ হইবার পূর্বে বা ছুটির পরে আলোচনা সভা বসিত। কর্তৃপক্ষের অগোচরে অথবা বিনা অনুমতিতেই এই অধিবেশনগুলি হইত। কিন্তু ছাত্রদের সাহিত্য ও দর্শনে কৃতবিদ্য করিয়া তুলিবার কাজে ডিরোজিওর নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও উৎসাহ ছিল অপরিসীম। এ উৎসাহের মূলে যে ভালবাসা ও মানবপ্রীতির প্রেরণা ছিল তেমন প্রেরণা আজ অবধি কোন শিক্ষকের মধ্যে দেখা যায় নাই। ...ডিরোজিও তাহাদের সাহিত্য রুচি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাহাদের নৈতিক ধারণা ও অনুভূতিকে সমসাময়িক অন্ধতার অনেক উর্ধ্বে তুলিয়াছিলেন। ......তখনকার লোকেরা একথা বিশ্বাস করিতেন যে, 'কলেজের ছাত্র কখনও মিথ্যাবাদী হইতে পারে না।"[৪১]

ডিরোজিয়ানদের দ্বারা পরিচালিত দ্বিভাষী 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকার ১/৯/১৮৪৩ তারিখের সংখ্যা অনুসারে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের স্বাধীন মতামত সর্বপ্রথম তাহাদের সম্পাদিত 'পার্থেনন' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়। আহারাদি, ধর্ম, আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তাহাদের সভায় যে সত্যে উপনীত হওয়া যাইত তাহা ডিরোজিও এবং তাঁহার শিষ্যগণ অনুসরণ করিতেন। সকল বিষয়েই প্রচলিত রীতি মানিয়া চলিতে তাঁহারা অস্বীকার করেন। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের উৎসাহে পার্থেনন প্রকাশিত হয় ১৫/২/১৮৩০ তারিখে। পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুর ঘরে জন্মাইলেও যাহারা শিক্ষা দীক্ষায় ইউরোপীয় মনোভাবাপন্ন তাহারা নিজেদের মনোভাবের আদানপ্রদানের জন্য এমন একটি পত্রিকা প্রকাশ প্রয়োজন মনে করিলেন যেখানে তাহারা নিজেদের চিন্তাধারা প্রকাশ করিতে পারিবেন।"[৪২]

শিক্ষকতা ও পত্র পত্রিকা মাধ্যমে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের দ্বারা দেশের আমূল পরিবর্তনের প্রযাসই ছিল প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের উদ্দেশ্য। বেঙ্গল স্পেকটেটর ১/৯/১৮৪৩ তারিখে লিখিয়াছেন—

উক্ত (ডিরোজিও) মহাত্মা ব্যক্তির সাহায্যে 'পারথিনন' নামক ইংরাজী সমাচার পত্র বাঙ্গালীদিগের দ্বারা প্রথমে প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'স্ত্রী শিক্ষা' এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক ভারতবর্ষে বাস— এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল এবং হিন্দুধর্ম ও গভর্ণমেণ্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল।[৪৩] উপরের অংশ হইতেই ডিরোজিয়ানদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও রক্ষণশীলগণ খুবই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া পত্রিকাটি বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু ছাত্রদের পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সংস্কার সংগ্রাম বন্ধ হয় নাই। ১৮৩১ সালেই 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'এন্‌কোয়ারার' নামে ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশ করিয়া বাংলার সমাজে তীব্র আলোড়নের সঞ্চার করেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক 'জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ' নামে একটি দার্শনিক আলোচনার নিমিত্ত পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইয়ং বেঙ্গলের গুরু ডিরোজিও স্বয়ং 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান' সমাজের সমস্যা লইয়া আলোড়ন সৃষ্টি করেন সংবাদ পত্রের মাধ্যমে এবং স্পষ্ট কথার জন্য অত্যাচারিত হন সেকালের ইংরাজ জনবুলদের দ্বারা।

প্রখ্যাত দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ কাণ্টের গ্রন্থের সমালোচনায় ডিরোজিও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।[৪৪] ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় স্বাধীনতার স্বপ্নও তিনি দেখিয়াছেন। ডিরোজিয়ানরা সেই পথ অনুসরণ করিয়া ভারতে রাজনীতি চর্চার সূচনা করেন। ১৮৩৩ সালে কোম্পানীর নূতন সনদের সমালোচনা করিয়া সেযুগে ভারতীয় সমাজে বিস্ময়ের সঞ্চার করেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি, সাহসিকতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন।

নবজাগরণের প্রথম পদে শিক্ষার মাধ্যম লইয়া দেশীয় ও ইউরোপীয়দের উভয় সমাজই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—ইংরাজী পন্থী ও সংস্কৃত আরবী-ফার্সী-প্রাচ্য পন্থী। ডিরোজিয়ানরা ইংরাজীকে আপদ্ধর্ম রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইংরাজী সাহিত্য সংস্কৃতির মাধ্যমেই নব ভাব ও রূপের সন্ধান করিয়া বাংলা ভাষাকেই কালক্রমে শিক্ষার সুষ্ঠু মাধ্যমে পরিণত করাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ইহারই ফলশ্রুতি রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, নীলমণি বসাক, মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বারা বাংলা ভাষার দিক পরিবর্তনের প্রয়াসে সার্থকতা।

কবি দার্শনিক ডিরোজিওর উপর রুশো, টমাস পেইন, বেনহাম, মিল, লক, বেকন হিউম ইত্যাদির প্রভাব পড়িয়াছিল গভীরভাবে। আধুনিক পাশ্চাত্য যুক্তিনির্ভর স্বাতন্ত্র্যবাদী জ্ঞানকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া সর্ব প্রকারের

কুসংস্কারের অন্ত করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যই ডিরোজিয়ানরা টমাস পেইনের Age of Reason গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করিয়া প্রচার করিলে খ্রীস্টান মিশনারীগণও শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার মাধ্যমে ইহা জানিতে পারা যায়।[৪৫] ডঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ এই সম্বন্ধে বিষোদ্গার করিয়াছেন।

কবি দার্শনিক ডিরোজিও ছাত্রদের নিকট স্বাদেশিকতার প্রতীক হইয়া উঠিয়াছিলেন, যাহারা তাহার নির্দিষ্ট পন্থায় উগ্রভাবে সমাজ সংস্কারে ঝাঁপাইয়া পড়েন নাই। তাহারাও তাহার প্রভাবে সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজের প্রগতি ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্বদেশপ্রেমের বহু কবিতা 'Bengal Annual' 'Literary Gazette' ইত্যাদিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। গদ্যেও তাঁহার প্রবন্ধ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের চিন্তাধারার পরিচয় বহন করে। Indian Gazette পত্রিকায় তাহার এক কবিতাংশের মধ্যে দিয়া ডিরোজিওর মনেরই ছাপ পড়িয়াছে :—

'Land of the Gods and lofty name ;
Land of the fair and beauty's spell ;
Land of the bards of mighty fame ;
My native land ! for ever farewell ![৪৬]

'এই কবিতাকেই ভারতীয়দের প্রথম দেশভক্তির গান বলা যায় এবং ইহায়ই পরিণতি বন্দেমাতরমে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।[৪৭] পাশ্চাত্য সভ্যতার সংসর্গে আসিয়া অতীত ঐতিহ্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তব ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিবার কথা সেকালে বাতুলতা মাত্র। কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে কত গভীর ছিল তাহা প্রথমে বাঙালী স্বদেশী কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের শেষ জীবনের কাব্যে স্পষ্ট :

'But woe me ! I never shall live to be hold,
That day or thy triumph, when firmly and bold,
Thou shall mount on the wing of an eagle on high,
To the region of knowledge and blest liberty'.[৪৮]

ডিরোজিওর প্রভাব কেবল ইয়ং বেঙ্গলদের উপরই পড়িয়াছিল এমন নয় হিন্দু-কলেজের তরুণদের এবং নব্য বাঙালী সমাজের উপরও তাহার প্রভাব স্পষ্ট। কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং এইরূপ অনেকেই প্রভাবিত হইয়াছিল, যদিও তাঁহারা ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ভুক্ত হন নাই। নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবাদীদের প্রভাবিত করিয়া বাঙালী সমাজেও সংস্কৃতিতে আমূল পরিবর্তন আনিয়া দেয়।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক

সিন্দুরিয়াপটির ধনিক পরিবারের নবকিশোর মল্লিকের পুত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিক

৯ বৎসর বিদ্যার্জনের পর ১৩/৩/১৮৩০ তারিখ হিন্দু কলেজ কমিটির প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট পাইয়া কলেজ ত্যাগ করেন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক হিন্দু কলেজ শিক্ষক ডিরোজিওর সাক্ষাৎ ছাত্র না হইলেও ডিরোজিওর প্রভাবে অতি গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়া আজীবন ডিরোজিও নির্দেশিত পথেই পরিচালিত হন। রসিককৃষ্ণ 'একাডেমিক এসোসিয়েশনে' তাহার বক্তৃতায় সকল পণ্ডিত ব্যক্তিদেরই প্রশংসা পাইয়াছেন।[৪৯] ১৮৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একাডেমিক এসোসিয়েশনে'র আনুকূল্যে ডিরোজিওর সাহায্যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ হিন্দুকলেজ ছাত্ররা 'পার্থেনন' নামে প্রথম দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন।[৫০] এই প্রথম প্রয়াসে স্ত্রী শিক্ষা, ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপন ও সরকারের বিচার বিভাগে ব্যয় বাহুল্য বিষয়ে তীব্র আলোচনা হয় এবং দেশীয় ও বিদেশীয় সকলেই ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ও কার্য প্রণালীতে শঙ্কিত হইয়া পত্রিকাটি বন্ধ করিয়া দেন। তথাপি সমাজে স্থিতাবস্থার পরিবর্তনের সূচনা হয়। রসিককৃষ্ণ আজীবন ছাত্র আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। ডেভিড হেয়ার দেশীয়দের হিন্দু কলেজে পড়াইবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে (১৮/১১/১৮২৪) বলিয়াছেন—

"সোসাইটির তরফ হইতে হিন্দু কলেজে ছাত্র পাঠাইবার উদ্দেশ্য হইল এমন একদল সুশিক্ষিত যুবক সৃষ্টি করা যাহারা পরে তাহাদের স্বদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করিবে।"[৫১]

মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের আশা সফল হইয়াছিল। যখন কোন দেশেই অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, তখন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে ডিরোজিও শিক্ষকগণ ব্যাপকভাবে এরূপ বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে শহরের উপকণ্ঠে—বেহালায়, আন্দুলে এবং অন্যান্য স্থানে তাঁহারা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিকও এ প্রচেষ্টায় অগ্রণী ছিলেন। সমাচার পত্র তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ :—"সম্প্রতি পরম্পরায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত রসিককৃষ্ণ মল্লিক শিমুলিয়াতে হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে বিনা বেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন প্রায় ৮০ জন বালক ঐ স্থানে শিক্ষা করণার্থ গমন করিয়া থাকেন তথায় কেবল পুস্তকের অর্ধ মূল্য লন আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে ইঁহারা বিদ্যা উপার্জন করিয়া আপনার দেশের উপকারের জন্য কি শ্রম করিতেছেন।[৫২] মহাত্মা ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও ও রামমোহনের আশা কার্যত রূপ পাইয়াছিল রসিককৃষ্ণ প্রভৃতি ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্য দিয়া। পরবর্তী যুগে বিদ্যাসাগরের মধ্যেও একই ভাবের রূপায়ণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। কেবল অর্থ ই নয়, আদর্শও জীবনের আরাধ্য বস্তু হইতে পারে—ইহা প্রমাণিত হইয়াছে ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্য দিয়া। বিদ্যালয় ত্যাগের পরই হিন্দুকলেজের কৃতী ছাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। রসিককৃষ্ণ স্কুল

সোসাইটির পটলডাঙ্গার স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গার স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়। রসিক কৃষ্ণের পাণ্ডিত্যে কলেজ কমিটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট ডঃ হোরেস হেম্যান উইলসন সাহেবও মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

পুরাতন নীতিবোধকে ডিরোজিয়ানরা আধুনিক দৃষ্টিতে যাচাই করিয়া আধুনিক সমাজের অগ্রগমনের প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করিলে বিরোধিতা করিয়াছেন তীব্রভাবে এবং কখনও কোন কারণেই অন্যায়কে মানিয়া লন নাই।

ডিরোজিয়ান রসিককৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহন শিক্ষকতায় সর্বজন স্বীকৃত পটুতা ও সততা সত্ত্বেও অভক্ষ্যভক্ষণের জন্যই রাধাকান্ত দেব কর্তৃক যেন-তেন-প্রকারেণ কর্ম বিচ্যুত হন। ডেভিড হেয়ার রাধাকান্ত দেবকে পত্র দেন, "শিক্ষক হিসাবে তাঁহারা এরূপ গুণ সম্পন্ন যে, তাঁহাদের হারাইতে তিনি (হেয়ার) বাস্তবিকই দুঃখিত।[৫৩]

আদর্শের বাস্তবাশ্রয়ী যুক্তিশীল অনুসরণ সেকালের ডিরোজিয়ানদের মধ্যে ছিল প্রবল তাই রসিককৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহন স্কুল ত্যাগ করিলেও ছাত্র সম্পর্ক আজীবন রক্ষা করেন এবং হিন্দুদের অখাদ্য ভক্ষণের জন্য আত্মীয় স্বজন দ্বারা পরিত্যক্ত হইলেও দুঃখ প্রকাশ করিয়া দ্বিচারী বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সুযোগ্য ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত ও উমাচরণ শেঠ মেডিক্যাল কলেজের উচ্চতম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সর্বপ্রথম অপরিচিত শবব্যবচ্ছেদ করিয়া হিন্দুদের পুরাতন কুসংস্কার ভাঙ্গিয়া সংসাহসের পরিচয় দিয়া শল্য চিকিৎসার প্রসারের পথ করিয়া দেন।[৫৪]

কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে পৌত্তলিকতা অগ্রগতির প্রতিবন্ধক এবং ন্যূনপক্ষে রাজনৈতিক প্রয়োজনেও হিন্দুদের ধর্মের ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সংশোধন করা আবশ্যক বলিয়া রামমোহন মনে করিয়াছেন। ফলে কালক্রমে ব্রাহ্মসমাজে মূর্তিপূজা উঠিয়া যায়। কিন্তু ডিরোজিয়ানরা যুক্তি নির্ভর স্বাধীন মতবাদের প্রতিষ্ঠায় কুসংস্কারের দূরীকরণে আমূল পরিবর্তনের প্রয়াসী হন। আদর্শবাদী ডিরোজিয়ান রূপে রসিক কৃষ্ণ সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া বিচারালয়ে শপথ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। 'আমি গঙ্গার পবিত্রতায় বিশ্বাস করিনা,' বলিয়া তিনি সুনির্দিষ্ট পন্থায় শপথ গ্রহণ করায় ইংরাজ বিচারপতিও স্তম্ভিত হইয়া যান। সমাজপতিরা হিন্দু সমাজে এইরূপ স্পষ্ট নির্ভীক প্রতিবাদের কথা পূর্বে কল্পনাও করিতে পারিতেন না। কিন্তু আধুনিকতার পদযাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া নব অর্থনৈতিক পরিবেশে এই সব উগ্র সংস্কার পন্থীদের সমাজ-চ্যুত করিয়াও পর্যুদস্ত করা সম্ভব হয় নাই। কোম্পানী এই সকল নবশিক্ষিতদেরই বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্মে নিযুক্ত করিতে থাকেন। রসিককৃষ্ণও জুরির কর্মে নিযুক্ত হইয়াই হিন্দুসংস্কারে চরম আঘাত হানিলেন।

চরিত্রগঠনই আধুনিক শিক্ষার আদর্শ। তাই প্রথম সরকারী প্রচেষ্টায় দেশীয়দের সরকারী কর্মে নিযুক্তির ব্যবস্থায় রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের ন্যায় হিন্দু কলেজের ছাত্র-

দলই সেই সকল পদে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। সেকালে যেনতেন প্রকারেণ কেবল অর্থ উপার্জনই ছিল অধিকাংশ ভারতীয় ও ইংরাজদের উদ্দেশ্য : সাহেব-দের সন্তুষ্ট করিবার জন্য দুর্গামণ্ডপে বাইজী নাচের ব্যবস্থা, সুরাপানের ও অখাদ্য ভক্ষণের ব্যবস্থা করিতে রক্ষণশীলরা পিছু পা ছিলেন না। উৎকোচ গ্রহণ সামাজিক ধর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আধুনিকতার অগ্রদূত ডিরোজিয়ানদের মনে চরিত্রের মর্যাদা নূতন মানদণ্ডে বিচার হইতে লাগিল। সর্বত্রই মস্তক উন্নত করিয়া ন্যায়পথে সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইবার পন্থা তাঁহারা জীবনে বাছিয়া লইলেন। রসিককৃষ্ণ রাজকার্যে শুচিতা আনিলেন। 'সমাচার দর্পণে' একপত্রে লিখিত হইয়াছে (২/১২/১৮৩৭) "আমি শুনিতেছি শ্রীযুত উডকাক সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক আমলাদের কর্মেতে নিয়ত চক্ষু রাখেন এবং সর্বদাই তাঁহারদিগের ইচ্ছা যথার্থ বিচার করেন অতএব আমি প্রার্থনা করি সকল বিচার কর্তারা এইরূপ মনোযোগ করুন।"[৫৫]

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আরও স্পষ্ট কবিয়া লিখিয়াছেন, "তাঁহার (রসিককৃষ্ণ মল্লিক) ধর্মভীরুতার বিশেষ সুখ্যাতি প্রচার হয়। এরূপ শুনিয়াছি বর্ধমানের রাজসরকারের লোক অনেকবার তাঁহাকে উৎকোচাদি দ্বারা বশীভূত করিবার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিছুতেই তাঁহাকে স্ব-কর্তব্য সাধনে বিমুখ করিতে পারেন নাই। রসিককৃষ্ণ ঘৃণাপূর্বক সেই সকল প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেন; এবং ন্যায় বিচার হইতে রেখামাত্র বিচলিত হইতেন না।"[৫৬]

সর্বক্ষেত্রেই একটি মানবিক যুক্তিবাদী আদর্শ স্থাপনার কর্মে ডিরোজিয়ানরা যে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার মধ্য দিয়াই প্রাচীন চিন্তাধারারও পরিবর্তন আসে। সৎভাবে জীবন যাপন করা, কেবল ধর্মের দোহাই দিয়া নয়, সমাজের বাস্তব প্রয়োজনের জন্যই অবশ্য কর্তব্য। তাই বিচারশীল পাশ্চাত্যদের দৃষ্টিতে ডিরোজিয়ানরা বিদ্রোহী উদ্দাম হইলেও ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্রবান এবং তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা হইয়াছে গুণের প্রকাশে। রসিককৃষ্ণ সমাজ সংস্কারক। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবেই যোগদান করেন। হিন্দু নারীর সম্পত্তিতে অধিকার, বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ ইত্যাদির সংযোগ সাধনের চেষ্টা করিয়া বিধবা-বিবাহ আইন সম্বন্ধে তাঁহাদের গভীর বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় দেন। তিনি উইলে ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিকে পাঁচ হাজার টাকা বন্দোবস্ত করিয়া যান সেবা কর্মের জন্য।

রাজা রাধাকান্ত দেব ও অপরাপর রক্ষণশীল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসার প্রয়াসীগণ সর্বদাই জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য নয়, রক্ষণশীলতাকেই প্রাধান্য দিতেন। শিক্ষার মাধ্যম লইয়া বিরোধের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পন্থীদের মধ্যে ডিরোজিয়ানদের দৃষ্টির বিশেষত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে রসিককৃষ্ণের ও কৃষ্ণমোহনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তাঁহারা 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'এনকোয়ারার' পত্রিকায় বিতর্ক

চালাইয়া যান এবং জনসভার মাধ্যমেও সরকারের প্রতি কর্তব্যের নির্দেশ করেন। তাঁহারা ইংরাজীর মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে প্রকৃত পাশ্চাত্য জ্ঞানের আহরণ করিয়া ক্রমে মাতৃভাষার উন্নয়নের দ্বারা মাতৃভাষায় সকল বিষয়ে শিক্ষা দানের পক্ষপাতী ছিলেন।

৩/৮/১৮৩৫ তারিখ স্যার চার্লস মেটকাফ আইন দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারপ্রাপ্ত হন। দেশীয় ও বিদেশীয়দের মিলিত সভায় অসবোর্ন নামে এক সাহেব দেশীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিলে রসিককৃষ্ণ অতি শ্লেষপূর্ণ ভাষায় তাঁহার যুক্তিখণ্ডন করেন এবং সাহেবের অজ্ঞতার ও সংকীর্ণ মনের জন্যই যে দেশীয়দের প্রতি এই বিদ্বেষ তাহা প্রমাণ করেন। ১৮৩৩ সালের কোম্পানীর সনদ প্রাপ্তির সম্বন্ধে ৫/১/১৮৩৫ তারিখে সভা হইলে তিনি এই সনদের অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া ইংরাজের কূট স্বার্থবাদের মুখোশ খুলিয়া দেন। ডিরোজিয়ানরা নানাদিক হইতে সংবাদপত্রেও ইংরাজের স্বার্থবাদীতার মুখোশ খুলিয়া দিতে সচেষ্ট হওয়াতে দেশীয়দের মধ্যে ক্রমে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহার বক্তৃতার প্রশংসায় ২১/১/১৮৫৮ তারিখে হিন্দু পেট্রিয়ট লিখিয়াছে, "তিনি কদাচ বক্তা হিসাবে জনসমক্ষে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু যখনই বক্তৃতা করিতেন, তখনই তাঁহার বিশুদ্ধ ইংরাজী এবং বক্তৃতার প্রশংসনীয় অবাধ গতি লোকের চিত্ত হরণ করিত।"[৫৭]

৩১/৮ ১৮৩৫ তারিখে কলিকাতা টাউন হলে ইংরাজ ও বাঙালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক সভা হয়, সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার জন পিটার গ্রান্টের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হইলে তাহাতে বাঙালীদের মধ্যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রসময় দত্ত সভ্য নিযুক্ত হন। এই পাব্লিক লাইব্রেরীই বর্তমানের জাতীয় গ্রন্থাগার। দরিদ্র ছাত্রদের পাঠের সুবিধার জন্য টিকিটের ব্যবস্থাও তাহার প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক 'জ্ঞানান্বেষণে' এবং অপরাপর সংবাদপত্রের মাধ্যমে আন্দোলন করিয়া নব্যশিক্ষিতদের রাজকার্যে নিয়োগের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়া দেন যে সরকারী কর্মে নিম্নবেতন, অনুপযুক্ত অশিক্ষিত হীনচরিত্র লোকের নিয়োগই ভারতীয়দের অযোগ্যতার নজীর সৃষ্টি করিয়াছে।

তাহার কটু ইংরাজদের স্বার্থবাদীতার সমালোচনায় ব্যবসায়ী কোম্পানী সরকার তাহার প্রতি অন্যায় অবিচার করিয়াছিল। 'সম্বাদ ভাস্কর' ২৮/২/১৮৫৪ তারিখ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছে, "ডেপুটি কালেক্টরদিগকে একাদিক্রমে শ্রেণীবদ্ধকরণ।...... এতকাল নিরপেক্ষভাবে বিশ্বাসী রূপে গভর্ণমেণ্টের প্রচুর লাভ দেখাইয়াছেন তাঁহাকে ৩৬ সংখ্যায় পাতালে ফেলিয়া দিয়াছেন।[৫৮] কিন্তু তথাপি ডিরোজিয়ান

রসিককৃষ্ণ মল্লিক আদর্শচ্যুত হন নাই। আমরণ সচ্চরিত্রতা ও কর্ম কুশলতার সহিত কর্ম করিয়াছেন এবং স্বদেশের মঙ্গল সাধনের চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন।

'সম্বাদ ভাস্কর' ১৪/১/১৮৫১ তারিখের সংখ্যায় রসিককৃষ্ণ মল্লিকের আদর্শ ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি জানাইয়াছে—"শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক বর্দ্ধমানের ডেপুটি কালেক্টর যিনি হুগলি অবধি পেড়ুয়া পর্যন্ত রেইল রোডের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারি শ্রীযুত বুসবি সাহেব অনুরোধ করিয়া ইহাকে ডেপুটি কালেক্টরি কর্মে নিযুক্ত করেন, গভর্ণমেণ্টের অচিহ্নিত ভৃত্যদিগের মধ্যে বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের তুল্য লোক অল্প আছেন, রসিকবাবু সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, দয়াশীল, বিদ্বান এমত ব্যক্তির হস্তে রেইল রোডের ব্যয় বিষয়ে তঞ্চকতা হইবে না আমরা নিশ্চিত বলিতেছি।"[৫৯]

সরকার তাঁহার স্বীকৃতি না দিলেও তিনি স্বাদেশিকদের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

"আমরা হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও গোঁড়ামিকে আক্রমণ করিয়াছি, ভবিষ্যতে আরও করিব। যতদিন না আমরা জয়ী হইব, ততদিন পর্যন্ত সব নির্যাতন নীরবে সহ্য করিয়া আক্রমণ চালাইয়া যাইব"।'' কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইয়ং বেঙ্গলের 'এনকোয়ারার' পত্রিকায় এইভাবেই লিখিয়াছিলেন রক্ষণশীলদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, দৃঢ়তার সহিত। তিনি ক্রমান্বয়ে হিন্দু রক্ষণশীলদের মুখোশ খুলিয়া দিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৩২ সালের আগষ্ট মাসে হিন্দু কলেজের ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তিনি 'এনকোয়ারারে' লিখিলেন—

"হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফলে মহেশচন্দ্র হিন্দু ধর্মকে কুসংস্কারের আবর্জনা স্তূপ মনে করিয়া বর্জন করিতে পারিয়াছেন।···আমরা আশা করি অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেকে মহেশচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।" এবং ১৮৩২-এর অক্টোবর মাসেই কৃষ্ণমোহন স্বয়ং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ডাফ সাহেব India and India's Missions গ্রন্থে বলিয়াছিলেন যে, একা বা একহাজার জন নিম্নবর্ণের অশিক্ষিত হিন্দু ধর্মান্তরিত হইলেও, তাহা লইয়া একটুও সাড়া পড়িত বিনা সন্দেহ······কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা লইয়া কলিকাতার হিন্দু সমাজের মূল পর্যন্ত সজোরে নাড়া দিয়াছিলেন।'

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধুদের অবিবেচকতার জন্য কষ্ট পাইলেও হিন্দুদের মিথ্যা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছেন। ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই।[৬০] বরং গৃহত্যাগ করিয়াছেন। আত্মীয়স্বজন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। ১৮৪০ সালে সেণ্টপল ক্যাথিড্রেল গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হইলে, গীর্জার প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ বিশপ দ্বারা প্রথম 'ক্যানন' বা আচার্য পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ঐ ধর্মাধ্যক্ষ ইংলণ্ড প্রত্যাবৃত হইয়া একজন ইউরোপীয়কে আচার্যপদে মনোনীত করিয়া পাঠান। কৃষ্ণমোহন দেশীয় খ্রীস্টানদেরই পাদ্রী হইয়া থাকিলেন। শাসক গোষ্ঠী ইংরাজের

আচার্য দেশীয় খ্রীস্টান হইতে পারে না।[৬০]

আপোষহীন ডিরোজিয়ান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মস্থানেও বৈষম্য দেখিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছিলেন। প্রতিবাদে তিনি সেই পদ ত্যাগ করেন। অন্যায় অন্ধ সংস্কার তাহা ধর্মীয় সংস্কারই হউক বা জাতীয় সংস্কারই হউক তাহার বিরোধিতা করা ইয়ংবেঙ্গলদের নীতি। তিনি স্বজাতীয়দের দ্বারা পরিত্যক্ত ও ক্রমান্বয়ে অত্যাচারিত হইয়াই খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কখনই স্বজাতির এবং স্বদেশের অপমান করেন নাই।

তিনি The Persecuted বা উৎপীড়িত নামে ইংরাজী নাটক লিখিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের চরিত্রের অসঙ্গতি ও কদর্যতা তরুণদের চোখের সামনে প্রকাশ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তাই তিনি আবার মাইকেল মধুসূদন দত্তের উৎকট সাহেবিয়ানা ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য স্বীয় কন্যার সহিত বিবাহ দেন নাই।

কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ শান্তিরাম সিংহের সভা পণ্ডিত রামজয় বিদ্যা-ভূষণের দরিদ্র ঘর জামাই জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণমোহন তাঁহার মাতা পৈতা কাটিয়া, দড়ি পাকাইয়া সংসারের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অভুক্ত, অর্ধভুক্ত অবস্থায়ও তিনি বিদ্যার্জনের জন্য হাস্যমুখে মনোযোগ সহকারে পাঠাভ্যাস করিতেন। জননীর দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বদাই তিনি সহায় হইয়াছেন—একবেলা রন্ধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া। বিদ্যালয় প্রত্যাগত কৃষ্ণমোহন সর্বদাই রন্ধনের কর্মে ব্যস্ত থাকিলেও পীঠস্থানে অমনোযোগের দুর্নাম কখনই হইতে দেন নাই, বরং সর্বদাই শ্রেণীতে ছিলেন শ্রেষ্ঠ। ১৮২৮ সালেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

কালীতলায় ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্কুল সোসাইটির একটি পাঠশালা স্থাপিত হইলে তিনি সেখানে ভর্তি হন। হেয়ার সাহেব তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া হিন্দুকলেজে সোসাইটির অবৈতনিক ছাত্ররূপে ভর্তি করিয়া দেন। ১৮২৯ সালে হিন্দুকলেজ হইতে পাশ করিয়া হেয়ারের প্রচেষ্টায় হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু খাদ্যাখাদ্যের সংস্কারমুক্ত ছিলেন বলিয়া স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক হিন্দুসমাজের মুখপাত্র রাজা রাধাকান্ত দেব কমিটির কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেন (২/৯/১৮৩১), আপনারা পটলডাঙ্গা স্কুলের দুইজন শিক্ষকের (রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) আহারাদি সম্বন্ধে সকল তথ্য হয়তো জানিতে পারিয়াছেন। আপনারা এই ব্যভিচারীদের স্কুলের কর্ম হইতে অবসর দিতে, না ইহাদিগকে স্কুলে রাখিয়া হিন্দু ছাত্রদের নষ্ট করিতে মনস্থ করিয়াছেন — জানিতে ইচ্ছা করি।[৬১] সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে বাদানুবাদ হইলেও শেষ অবধি রক্ষণশীলদের অন্যায় দাবীরই জয় হয়। দুঃখের সহিত কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণকে কর্ম হইতে বিদায় দেওয়া হয়। এইরূপ অন্যায় অত্যাচারের জন্যই

কৃষ্ণমোহন হিন্দুরক্ষণশীল নেতাদের উপর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া ওঠেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর নিকট পাঠ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ডিরোজিওর ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা স্নাত চরিত্রের আকর্ষণে তিনি একাডেমিক এসোসিয়েশন-এর একজন নেতা হইয়া পড়েন। তিনি বিভিন্ন প্রাচ্য পাশ্চাত্যের জ্ঞান ভাণ্ডারের সন্ধান পান। স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিনির্ভরতা এবং সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভাবধারা তাঁহার মধ্যে গভীরভাবে সংক্রমিত হয় ডিরোজিওর প্রভাবে এবং আজীবন সেই প্রভাবে তাঁহাকে দেশের দশের উন্নয়নে ও সংস্কার কর্মে আলোড়ন সৃষ্টি করিতে উৎসাহ দিয়াছে আপোষহীন ভাবে।

সমাজ সংস্কার কর্মে তাঁহার মাধ্যম ছিল ইয়ংবেঙ্গলদের সভা সমিতি ও সংবাদ-পত্র। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া স্বয়ং পুরস্কৃত হন। বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কর্মেও ইয়ংবেঙ্গলদের পার্শ্বেই তিনি ছিলেন। এমনকি এই বিষয়ে তিনি রাজা রাধাকান্ত দেবের অবদানেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। সংস্কার কর্মের প্রচেষ্টা যে সূত্র হইতেই আসুক না কেন যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিবাদী ডিরোজিয়ান তাহার সহিত নির্বিবাদে যুক্ত হন। ডেভিড হেয়ারের স্মৃতি বার্ষিকীতে কৃষ্ণমোহন ১৮৪৯ সালে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতায় বলেন, Are we to hear in 1849 objection which were so ably refuted as early as 1824 by the President of the Dharma Sabha himself ?[৬২]

কৃষ্ণমোহন রাধাকান্ত দেবের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া বলেন, 'The successful eassy now before us proves what the Rajah Radhakant had demonstrated long before, that female education was not uncommon in India in the days of yore and that the present state of things is one of degeneracy from the former.[৬৩]

প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে ছিল রাধাকান্ত দেবের সহায়তায় গৌরমোহন কর্তৃক লিখিত 'স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক'।

ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি হিন্দু সংস্কৃতির যে সেবা করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয় এবং সেইজন্য তিনি স্বীকৃতি পাইয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ডক্টরেট অব্ লিটারেচর (রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও সেই বৎসরই ডক্টরেট হন) উপাধীর সম্মানে-ভূষিত হন।

তিনি মহাত্মা বেথুনের মৃত্যুর পর বেথুন সোসাইটির সভাপতি হন। এই সভায় ইয়ংবেঙ্গল, ব্রাহ্মসমাজ রক্ষণশীল হিন্দু- ইরাজ আমেরিকার পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইয়া সর্ববিষয়ে ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ করিতেন।

খ্রীস্টান হইয়াও তিনি শিক্ষা প্রচারের কর্মকেই বাছিয়া লইয়াছিলেন জীবিকারূপে। ১৮৫২ সালে তিনি শিবপুর বিশপ কলেজের অধ্যাপকের পদে মনোনীত হন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা হন। বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁহাকে ফেলো মনোনীত করেন। তিনি সিণ্ডিকেটের সদস্য হন এবং আর্ট বিভাগের 'ডীন' হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব বিভাগেই তাঁহার অবদানের স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে। সিলেবাস প্রণয়নে, পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তিনি সহায়তা করিয়াছেন।

দীর্ঘদিন অবহেলিত হইয়া ক্রমে তিনি দেশীয় জনজীবনে অবধারিত নেতারূপে অধিষ্ঠিত হন। কলিকাতা কর্পোরেশান গঠিত হইলে তিনি সদস্য পদে জনসাধারণ দ্বারাই অধিষ্ঠিত হন।

বাংলায় রাজনৈতিক সাংগঠনিক গণও তাঁহার অদম্য নির্ভেজাল ডিরোজিয়ান স্বাদেশিকতার স্বীকৃতি দান করেন 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি রূপে বরণ করিয়া। আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশানের নেতা তাঁহাকে সভাপতি করিয়া 'মুদ্রণ আইন' 'অস্ত্র আইন' প্রভৃতি লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল প্রয়াসের বিরুদ্ধে সভা করেন এবং তাঁহার ডিরোজিয়ান বিদ্রোহী, অকপট দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন।

তিনি ইয়ং বেঙ্গলের সর্বাপেক্ষা কৃতী পণ্ডিত। 'এনকোয়ারার' ও 'দি পারসিকিউ-টেড' হইতে সাহিত্যিক কর্মের সূচনা করিয়া 'টু এসেস অন দি এরিয়ান উইটনেস্' পর্য্যন্ত দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল তিনি ইংরাজ, বাংলা ও সংস্কৃততে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ঋগ্‌বেদ সংহিতার প্রথম অষ্টক, পুরাণ সংগ্রহ, নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদক। তাঁহার 'ষড়দর্শন সংবাদ' (১৮৬৭) প্রাচ্য-বিদ্যানুরাগের প্রমাণ এবং বাংলা ভাষারও সম্পদ। আবার বাংলা ভাষায় তিনি 'সংবাদ সুধাংশু' 'বেঙ্গল গেজেট' প্রভৃতি সংবাদপত্র সম্পাদনাও করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বিদ্যাকল্পদ্রুম্' বা এন্‌সাইক্লোপীডিয়া বেঙ্গলেন্‌সিস'। ইহার এক সংস্করণ ছিল বাঙলায়। অন্য সংস্করণে বাম দিকে ইংরাজী ও দক্ষিণ দিকে বাংলায় মুদ্রিত। বাংলা ভাষায় বাঙালীকে নানা জ্ঞানের সন্ধান দানই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহার মোট ১৩টি কাণ্ড এবং ১৮৪৬-এ এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। বিদ্যাকল্পদ্রুম্ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতে সময় লাগিয়াছিল ১৮৪৬ হইতে ১৮৫১ সাল অবধি। ইহা মুখ্যত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত; অবশ্য ইহার কোন কোন অংশ প্যারীচাঁদ মিত্রের লিখিত। তিনি অনুবাদের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকদেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

ফরাসী বিপ্লবের চিন্তা ধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ডিরোজিয়ানরা ভারতের স্থানু সমাজে মানুষের সংস্কার মুক্তির উদ্দেশ্যে ইউরোপের চিন্তানায়কদের ভাবধারাকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিতে প্রয়াসী হন। ফরাসী বিশ্বকোষে যেমন বিপ্লবের চিন্তাধারা দ্বারা উদ্বুদ্ধ নব সৃষ্টির সাধনা সুসংহতরূপে প্রকাশিত

হইয়াছে, তেমনি ডিরোজিয়ানদের মানসিক চিন্তা ধারার অনেকটাই প্রকাশ পাইয়াছে কৃষ্ণমোহনের বিদ্যাকল্পদ্রুম্ সেক্ষেত্রে বহুলাংশেই কৃষ্ণমোহনের একক প্রয়াস, প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনাও অবশ্য রহিয়াছে। ফরাসী বিশ্বকোষ পণ্ডিত-জনের উদ্দেশ্যে রচিত পরিণত ভাষায়; কিন্তু বিদ্যাকল্পদ্রুম্ বাংলায় শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় অশিক্ষিত সমাজের জন্য রচিত সম্পূর্ণ অপরিণত ভাষায় ও অপরিচিত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে।

ফরাসী বিশ্বকোষের ন্যায় কৃষ্ণমোহনের প্রয়াসও প্রধানতঃ সংকলন ও সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু নিজস্ব মৌলিক চিন্তারও প্রকাশ হইয়াছে সার্থক ভাবেই। তিনি পুরাতন জ্ঞানের সংগ্রহ করিয়াছেন। অধিকন্তু বাংলায় পুরাতনকে ধর্ম, আচার, সংস্কৃতি পুরাণ ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি) নবরূপে আধুনিক নিক্তিতে ওজন করিয়া ঢালিয়া সাজাইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত জ্ঞানের প্রসারণে। খ্রীস্টান হইলেও তৎকৃত হিন্দু দর্শনের ও পুরাণের নব ব্যাখ্যা হইয়াছে সার্থক। নব লব্ধ, শিল্প সাহিত্য, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদির নূতন নূতন ধারণাও সংযোজিত করিয়াছেন। শতাব্দীর সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের পর তাঁহাদের অবদান অপাংক্তেয় বলিয়া মনে হইলেও সেকালের দৃষ্টিতে ইহার মূল্য ছিল বৈপ্লবিক। বাংলা ভাষাকে ও বাঙালীকে সাংস্কৃতিক মর্য্যাদা সম্পন্ন করিবার প্রয়াস তাঁহাদের সমগ্র বিশ্বের উন্নত সাহিত্যের সহিত সম্পর্কিত করিয়াছে। অনুবাদের মধ্য দিয়া এই প্রস্তুতি চলিয়াছে অবিরত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, পত্র পত্রিকা মাধ্যমে, অভিধান সংকলনে ইত্যাদিতে। প্রচেষ্টায় বাংলায় উপন্যাস হয় নাই, কিন্তু উপন্যাসের পাঠক ও চরিত্র সৃষ্টি হইয়াছে, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া। তিনি আধুনিক সাহিত্যিক নন, কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ও বাঙালী সাহিত্য রসিকের পদযাত্রার সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন মধ্যযুগীয় বন্ধুর সাহিত্য পথকে সহজ সরল আধুনিক করিয়া।

কৈশোরে ভুল বাংলা গস্‌পেল অনুবাদ ও প্রচারের জন্য কৃষ্ণমোহন ও ইয়ংবেঙ্গ-লেরা পাদ্রীদের উপহাস করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতেন। পরিণত বয়সে সেই অনুবাদ সাহিত্যের অশেষ উন্নতি সাধন ইয়ং বেঙ্গলেরাই করিলেন। এই প্রয়াসে তাঁহাকে অশেষ পরিশ্রম করিয়া জ্ঞানের পরিধিকে পৃথিবীর সর্বদেশের সহিত সম্পর্কিত করিতে হইয়াছে। গ্রীসের সভ্যতা হইতে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় মনীষীদের প্রায় দুই আড়াই হাজার বৎসরের সভ্যতার সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছে। 'এন্সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা' তাঁহার পরিকল্পনা ও অন্যান্য বিষয়ে সহায়ক হয়, তথাপি বাংলা বিদ্যাকল্পদ্রুম এদেশীয় প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি ছক করিয়া রচনা করেন। দেশীয়দের দুরবস্থা যেমন দূর করিবার উদ্দেশ্যে ইহা রচিত তেমনি বিশ্বের দ্বারে দেশীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে উপস্থাপিত করিতে হইলে সর্বকালের মানুষের জ্ঞানের সহিত পরিচয়ের ও প্রয়োজন অনুভব

করিয়াছেন। তাই ডিরোজিয়ান যুক্তিবাদী মন দেশীয় ধর্মগ্রন্থের অর্থাৎ পুরাণের সর্বাংশই অগ্রাহ্য করেন নাই। অপরাপর হাজার গ্রন্থের ন্যায় ভারতীয় ধর্ম গ্রন্থেরও মূল্য আছে। যে কোন সাহিত্য ও জীবনীর ন্যায় এইসব গ্রন্থেও বহু সুখ-পাঠ্য এবং প্রয়োজনীয় কথা আছে—যদিও আধুনিক দৃষ্টিতে বহুলাংশই হাস্যকর ও অপ্রয়োজনীয়। সকল ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেই এই যুক্তি দর্শান যায়।

শিবনাথ শাস্ত্রী ঠিকই লিখিয়াছেন, "ইনি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ও লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন সুহৃদগণের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি।"

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়কুমার দত্তের পূর্ববর্তী। তাঁহার প্রবন্ধে রামমোহনের রচনার ন্যায় নীরসতা থাকিলেও স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য স্পষ্ট ছিল। যুক্তি ও বুদ্ধি প্রণোদিত ধর্মীয় তত্ত্বালোচনা তাঁহার তরুণ বয়সের অনাবশ্যক ভাবাবেগ 'পারসিকিউটেড', নাটকে ও 'এনকোয়ারার' পত্রিকায় প্রাধান্য পাইয়াছে। ইংরাজী বাগবিধি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করায়, দেশীয় ভাষার নিজস্ব ধারায় ক্রম পরিণতি দেখা যায় তাঁহার দীর্ঘদিনের বাংলা রচনায়। তত্ত্ব বিষয়ক রচনায় তাঁহার নিজস্ব চিন্তাধারার প্রকাশও সেজন্য হইয়াছে স্পষ্ট। কিন্তু অশোভন, অশালীনতা পরিহার করিয়া ধর্মীয় তত্ত্ব আলোচনায় সুরুচি ও সংযমবোধের যে পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহা পূর্বে কদাচিত দৃষ্ট হয়। আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণমোহনের রচনারীতিকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। তাঁহার 'উপদেশ কথা' (১৮৪০), 'সত্য-স্থাপন ও মিথ্যানাশন' (১৮৪১) 'ধর্মজিজ্ঞাসুদের শিক্ষার্থ প্রশ্নোত্তর' (১৮৪২), 'ধর্মপোষক বক্তৃতা' (১৮৪৭) হইতে 'ষড়দর্শন সম্বাদ' (১৮৬৭) প্রত্যেকটির মধ্য দিয়া তাঁহার নিজস্ব ভাষা ও রচনারীতির প্রকাশ পাইয়াছে। বিষয়বস্তুর জটিলতা ও গুরুত্বের জন্য সাহিত্যরস সৃষ্ট হইতে না পারিলেও তাঁহার প্রবন্ধের ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও উন্নত গাম্ভীর্যগুণমণ্ডিত। চিন্তার বলিষ্ঠতার ও নৈয়ায়িক তীক্ষ্ণতায় সমুজ্জ্বল হইয়া তাঁহার রচনা বাংলা ভাষায় হইয়াছে বিশিষ্ট।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী

প্রথম যুগে হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং ভবিষ্যতে ইয়ংবেঙ্গল নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তীর মধ্যে সংঘাতের পরিচয় পাওয়া যায় তীব্রভাবে। বিচিত্র আপাত বিরোধী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ দেখা যায় তাঁহার চরিত্রে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই আপাত বিরোধী বৈচিত্র্য একটি আধুনিক চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য-মুখিতার প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার প্রয়াস জাত, একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির ফল মাত্র। তাঁহার জীবনের এই ঘটনাবলী তাঁহার একমুখীন চরিত্রের পরিচয় দেয়:—

১। ম্যাকিন্টোস কোম্পানীর অফিসে কেরানীর কর্মে বড় সাহেবের প্রতি প্রাচ্য-ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিবার অন্যায় জিদের জন্য বিরক্ত হইয়া তাঁহার আধুনিক ব্যক্তিমর্যাদার ফলে দারিদ্র্য সত্ত্বেও চাকুরি ছাড়িয়া দেন।

২। জেহানাবাদের মুন্সেফী কর্মে সাক্ষীর জালসাজি ধরিয়াও শেষ অবধি ইংরাজ

ম্যাজিস্ট্রের মিথ্যা দোষারোপের সিদ্ধান্তে মাত্র ২০ টাকা জরিমানা দিবার জন্য তিনি ইংরাজের কোর্টের ব্যাভিচারের নিদর্শনে বিরক্ত হইয়া পদত্যাগ করেন।

৩। ৮-১-১৮৪৩ তারিখে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় অধিবেশনের সভাপতি রূপে তিনি দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ "The present state of the East India Company's Criminal judicature and Police under the Bengal Presidency" পাঠে অশিষ্টভাবে বাধাদান করিয়া দেশদ্রোহিতার অভিযোগের অজুহাতে কটুভাষায় সমালোচনা করায়, রিচার্ডসন সাহেবকে তীব্র সমালোচনা করিয়া তাঁহার মন্তব্য প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করেন।[৬২] 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এই ঘটনাকে রাজদ্রোহাত্মক বলিয়া বাটাভিয়া বা যবদ্বীপের প্রথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের নির্বাসন দণ্ডের ভয় দেখান।[৬৩] কিন্তু ইহাতে দেশীয়দের মধ্যে যথেষ্ট ও স্বাদেশিকতার ভাবনা জাগ্রত হয়।

৪। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, তিনি তারাচাঁদ "The Quill" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেন এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রাজ কার্য্যের দোষগুণ বিচার করিতেন তাহা গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় ব্যক্তিগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

৫। তিনি হিন্দুস্থানী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়াসে হিতার্থ ব্রাহ্ম সমাজ, রক্ষণশীলদের সহিত একযোগে কর্ম করিয়াছেন মিশনারীদের খৃস্টান করিবার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টাকে বিফল করিতে।

ইহার মধ্যে কিন্তু একই উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ করা যায় – তাহা হইতেছে আধুনিক ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। আত্মমর্যাদাবোধ ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে ছিল অতি সচেতন। কেবলমাত্র স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠাই উদ্দেশ্য নয় যে কোন ব্যক্তিত্বের অবমাননা তাহাকে করিয়াছে তীব্র সমালোচক এবং এইভাব হইতে প্রথমে স্বাদেশিকতার প্রসার হয় দেশীয় সমাজে। দেশীয়দের জ্ঞান ও বিদ্যার প্রসারের সঙ্গে তাঁহাদের এই দায়িত্ববোধও জাগ্রত হইয়াছে ইয়ং বেঙ্গলদের দৈনন্দিন সংগ্রামের নিদর্শন। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফল সম্বন্ধে মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে এইসব ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্য দিয়া।

"হিন্দু কলেজে ছাত্র পাঠাইবার উদ্দেশ্যই হইতেছে এমন একদল সুশিক্ষিত যুবক সৃষ্টি করা যাহারা পরে তাহাদের স্বদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করিবে।

কিন্তু তারাচাঁদ স্বভাবত ছিলেন অমায়িক, মিতভাষী নীরব কর্মী এবং সরল। ওই জন্যই তিনি সেকালের সকল প্রগতিমূলক কর্মধারার সহিত যুক্ত থাকিলেও তাঁহার নাম বিশেষ প্রচারিত হইতে পারে নাই। তিনি ঠিক প্রকাশ ধর্মী ছিলেন না। সিভিলিয়ানদের ষড়যন্ত্রে তিনি চাকুরি ত্যাগ করেন। রাজনীতিকে সংবাদপত্রের মুখ্য বিষয় করিবার প্রয়াস সচেতনভাবে তাঁহারই। নীতিজ্ঞান ইয়ংবেঙ্গলদের প্রখর এবং তাঁহাদের অনেকেই সর্বদা সরল শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হন

নাই বিদ্রোহের উদ্দামতায়। কিন্তু তারাচাঁদ সেক্ষেত্রে একান্তই অকৃত্রিম শিষ্টাচার গণ্ডিবদ্ধ। কোন স্বার্থ চিন্তাই তাঁহাকে সংস্কার কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না, তিনি দৃঢ়পদে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁহার সমালোচনা ছিল সর্বদাই নিরপেক্ষ ও বন্ধুভাবাপন্ন।

ইয়ং বেঙ্গলদের এই নেতা বয়সে তাঁহাদের গুরু ডিরোজিও হইতেও তিন বৎসরের বড় ছিলেন। স্বভাবতঃই তাঁহার নেতৃত্ব নব্যদলের সকলেই মানিয়া লইতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য স্বদেশপ্রেম, নির্ভয়চিত্ততা, শিক্ষিত অশিক্ষিত জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলের সহিত হার্দিকভাবে সম্বন্ধ সম্পর্ক স্থাপনের সরলতা ও ক্ষমতা, ইয়ং-বেঙ্গলদের সকল কর্মধারায় তাহাকে নেতৃত্বের স্থান দিয়াছে।

১৬ বৎসর বয়সেই পিতৃ বিয়োগের জন্য পরিবারে দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে আসিয়া পড়ে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি অবৈতনিক ছাত্র রূপে সেখানে শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং ১৮২২ সালে কলেজ ত্যাগ করেন। তাঁহার নাটকীয় জীবন সংঘাত পরিপূর্ণ। নিত্য নব সমস্যা লইয়া তাঁহাকে করিয়াছে ব্যতিব্যস্ত এবং সেই জন্যই তাঁহার জীবনে অভিজ্ঞতাও বিচিত্র।

হিন্দুকলেজ ত্যাগের পরই তিনি মিঃ সিল্ক বাকিংহাম সম্পাদিত 'ক্যালকাটা জার্নাল' পত্রের জন্য 'চন্দ্রিকা ও কৌমুদী'—দুইটি বাংলা সংবাদ পত্রের ইংরাজী অনুবাদের কর্মে নিযুক্ত হন। কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই অনুবাদকের কর্মের প্রয়োজন নাই জানিয়া তিনি এই কর্ম ত্যাগ করেন। ইহার পর ডঃ হোরেস হেম্যান উইলসনের তত্ত্বাবধানে বাবু রামকমল সেন ও হিন্দুকলেজের ছাত্র শিবচন্দ্র ঠাকুরের সহযোগে হিন্দু পুরাণ সমূহের সম্পদের ইংরাজী অনুবাদ কর্মে নিযুক্ত হন।

উইলসন এই অনুবাদের কর্ম দ্বারা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান প্রকাশ করিতে সাহায্য পাইয়াছিলেন। পরে রামমোহনের সহায়তায় ম্যাকিণ্টোস কোম্পানীর অফিসে কেরানীর কর্ম গ্রহণ করেন এবং আত্মসম্মান বোধের জন্য কর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ফলে ডেভিড হেয়ার সাহেব তাঁহার গুণাবলীর জন্য আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষকের কর্মে নিযুক্ত করেন।

পূর্বের অনুবাদের কর্ম বিশেষত প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের অনুবাদের কর্ম ও এই শিক্ষকতার কর্মে তিনি স্বভাবত আদর্শানুযায়ী অতি উৎসাহী ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলরা শিক্ষা প্রসারকে জীবনের এক ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং পুস্তক অনুবাদ, পুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষকতা, শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্মে তাঁহারা অযাচিতভাবে অগ্রসর হইতেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তীও স্বভাবতঃই এই কর্মে স্বীয় স্বভাবানুযায়ী প্রতিভা বিকাশের পন্থা খুঁজিয়া পাইলেন। এই সময়ে তিনি ৭৫০০ হাজার শব্দের বাংলা-ইংরাজী অভিধান সংকলন করিয়া ৭০০ শত টাকা পান। এই গ্রন্থ তিনি উইলিয়ম এডামের নামে উৎসর্গ করেন। অভিধানটি স্কুল বুক সোসাইটির আনুকূল্যে প্রকাশিত হয় ১৮২৭ সালে।

সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিস্টার মিঃ ক্লেল্যাণ্ডের সরকারী পদে অধিক বেতনে কর্ম পাইয়া তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। মিঃ ক্লেল্যাণ্ডের অধীনে কর্ম করিবার সময় তিনি স্যার উইলিয়ম জোনসের ইংরাজী অনুবাদ ও মূল সংস্কৃত মনুসংহিতা পাশাপাশি রাখিয়া মনুসংহিতার পাঁচ খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিসেন। রামমোহন রায় স্বয়ং এই গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে এই কর্ম আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। দারিদ্র তাহাকে অধিক আয়ের পদে যাইতে বাধ্য করে। এই ভদ্রমহোদয় (মিঃ ক্লেল্যাণ্ড) অতি সদয় ও সহানুভূতিশীল ছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রচেষ্টায় তারাচাঁদ জেহানাবাদের মুন্সেফী পদপ্রাপ্ত হন। কিন্তু এই পদে তিনি মাত্র এক বৎসর কর্ম করিতে পারিয়াছিলেন। সরকারী বিভাগে নানা ষড়যন্ত্রে ও ব্যাভিচারের জন্য তিনি অবশেষে এই কর্ম ত্যাগ করিতেও বাধ্য হন। দারিদ্র্য কখনই তাঁহার আত্মসম্মানের মর্যাদা রক্ষার পদে বাধা হইতে পারে নাই।

কলিকাতায় আবার ফিরিয়া আসিয়া তারাচাঁদ মিঃ থিয়োডোর ডিকেন্স সাহেবের প্রচেষ্টায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সলিসিটার মিঃ পলিনের সহ কারী নিযুক্ত হন। মিঃ পলিনের মৃত্যুর পর মিঃ লঙ্গেভিল ক্লার্কের সহকারী হন। অবশেষে ১৮৩৭ সালে মিঃ ভি সি স্মিথের অনুরোধে সদর দেওয়ানী আদালতে মোটা বেতনে কেরানীর কর্ম পান।

তারাচাঁদ পাঁচ ছয় বৎসর বর্ধমান রাজ্যের মন্ত্রীরূপে কর্ম করিয়াছিলেন। ১৮৫১ সালে তিনি সেই কর্ম ত্যাগ করেন। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ৭-২-১৮৫১ তারিখে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছে, "বর্দ্ধমানাধিপতির মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্তী বর্দ্ধমানাধিপতির মন্ত্রীরূপে থাকিয়া কতক বৎসর রাজসম্পর্কীয় কার্য্য উত্তমরূপ নির্বাহ করিতেছিলেন এবং তাঁহার গুণ গরিমায় সকলে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার গৌরব করিত। উক্ত মহাশয় কয়দিন হইল আপন পদ পরিত্যাগ করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।[৬৭]

তারাচাঁদ অপরাপর ইয়ংবেঙ্গলদের ন্যায় স্বাধীন ব্যবসায় প্রচেষ্টায়ও অগ্রসর হইয়াছিলেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আধুনিকদের স্বভাবতই ইংরেজ সরকারের কূট কৌশলে ও অন্যায় ব্যভিচার পছন্দ হইবার নয়। তারাচাঁদ যেমন দারিদ্রের প্রকোপে, তেমনি এই ব্যক্তিত্বের সম্মান রক্ষায় বহু কর্মত্যাগ করিয়াছেন এবং শেষ অবধি ব্যবসায়ে লিপ্ত হন প্যারীচাঁদ মিত্রের সহিত। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "তিনি (প্যারীচাঁদ মিত্র) একদিকে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীয়ানের কর্ম করিতেন। অপরদিকে তাঁহার বন্ধু তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সহিত সম্মিলিত হইয়া বিষয় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর কাজ করেন। ...১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর মৃত্যু হইলে, তিনি আপনার দুই পুত্রকে অংশীদার করিয়া নিজে কারবার করিতে প্রবৃত্ত হন।"[৬৮]

তারাচাঁদ চক্রবর্তী রামমোহন রায়ের অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তিনি রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় নিশ্চয় ছিলেন উৎসাহ কর্মী। ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে তাই তিনি রক্ষণশীলদের বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই যখন রামমোহন অবর্তমানে সমাজে গা-ঢাকা দিয়াছিলেন, তারাচাঁদ তখন সম-চিন্তকগোষ্ঠীর সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের কর্ণধার হইয়া বসেন। ডেভিড হেয়ার ও তাঁহার সমাজসংস্কার ও শিক্ষার প্রচেষ্টা ক্রমে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র মধ্য দিয়া ইয়ংবেঙ্গলদের সুনিশ্চিত পথে অগ্রসর করে। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' ছিল সমাজ সংস্কার, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধেও আলাপ আলোচনা, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠের মধ্য দিয়া দেশীয়দের সচেতন করিবার প্রয়াসের কেন্দ্র।

সংবাদপত্র সেবা তাঁহার হিন্দু কলেজ ত্যাগ করিবার সঙ্গেই আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮৩০ সালে তাঁহার প্রথম রচনা 'ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হয়।[৬৯]

দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত হইতে ১৮৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে ফিরিয়া আসিলেন পার্লামেন্টের সদস্য, ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের একজন নায়ক, মানবপ্রেমী ও ভারতহিতৈষী সভার প্রতিনিধি জর্জ টমসন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত বাগ্মী। ১১-১-১৮৪৩ তারিখে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' তাহাকে অভিনন্দন জানাইলেন এবং ক্রমে প্রতি সপ্তাহে সোমবার আলাপ আলোচনার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলার বাগান বাড়ীতে মিলিত হইতে লাগিলেন। পরে এই সভা ৩১নং ফৌজদারী বালাখানায় স্থানান্তরিত হইলে জর্জ টমসনের ও ইয়ং বেঙ্গলদের আলোচনা সভায় হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলেই যোগদান করিতে লাগিলেন। ফলে রাজনৈতিক সচেতনতা ক্রমে প্রসারিত হইতে লাগিল ভারতীয়ত্ব-বোধের জাগরণের মধ্য দিয়া।

ক্রমে সংঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক আলোচনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সচেষ্ট হইয়া ২০-৪-১৮৪৩ তারিখে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হইল। ইহার প্রস্তাবনা সভায় জর্জ টমসন সভাপতি হইলেও সকল প্রস্তাবক ও সমর্থকই ছিলেন বাঙালী। তারাচাঁদ চক্রবর্তীই ইহাদের পুরোভাগে। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর সেন, রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্রকে লইয়া বিবৃতি রচনা ও কর্মচারী নিয়োগের কমিটি গঠিত হইল এবং ২-৫-১৮৪৩ তারিখ ইহার প্রথম বার্ষিক সভা হয়। ভারতে রাজনীতি চর্চার দ্রুত প্রসার হইল ইহার পর হইতেই।

বেঙ্গল স্পেকটেটর টমসনের সাহায্যে পাক্ষিক ও শেষ সাপ্তাহিকে পরিণত হইল। পরে অর্থাভাবে বেঙ্গল স্পেকটেটর উঠিয়া গেলে রাজনীতি চর্চার জন্যই তারাচাঁদ "The Quill" নামে পত্রিকা খুলিয়া সরকারের সর্ববিষয়ে সমালোচনার ঝড় তুলিলেন। তারাচাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা এই বিষয়ে হইয়াছিল খুবই প্রত্যক্ষ ও ক্রিয়াশীল এবং গবর্ণমেন্টের একান্ত অপ্রিয় হইয়া কালক্রমে পত্রিকা উঠিয়া গেল।

এই রাজনৈতিক সম্মিলিত প্রচেষ্টাই বাংলা রক্ষণশীল মধ্যপন্থী ব্রাহ্মসমাজ ও ইয়ংবেঙ্গলদের মিলিত করিল বিভিন্ন কর্মে। প্রথমে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বা 'ভারতবর্ষীয় সভা' স্থাপিত হইয়া এই রাজনৈতিক প্রচেষ্টা সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করিল।

তারাচাঁদ ব্যবসায়ের কর্মেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। আধুনিকতার প্রবর্তন কেবলমাত্র সীমিত রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়াই দেশের আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের মধ্য দিয়াই শিল্প বিপ্লব সম্ভব এবং আধুনিকতার সর্বাত্মক রূপান্তরের সম্ভাবনা তারাচাঁদ অনুভব করিয়াছিলেন। তাই 'মেকানিকস ইনষ্টিটিউট' স্থাপিত হইলে তিনি তাহার কার্যকরী সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য হন। ৭-৩-১৮৪৩ তারিখের চতুর্থ বার্ষিক সভাতেও তিনি সভ্য নির্বাচিত হন।[৭৬] বিজ্ঞানের নিত্য নব গবেষণায়ও আবিষ্কারে যে উন্নতি হয়, তাহা ভারতে কাজে লাগাইবার কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ছিল ইহার উদ্দেশ্য। ইহা যদিও মুখ্যত ফিরিঙ্গীদের জন্যই স্থাপিত, তথাপি ইহার উপযোগিতা ইয়ংবেঙ্গল নেতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই সচেতনতা সুষ্ঠুভাবে প্রসারিত হইলে ভারতের পূর্ব প্রান্তে শিল্প উন্নয়নে স্থানীয়রা প্রয়াসী হইতে পারিতেন এবং ফলে বাংলার জনজীবনে আর্থিক সংকট অর্ধশতাব্দীর মধ্যে প্রবল হইতে পারিত না। তারাচাঁদের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার সহিত এই বিজ্ঞানমুখিতা—আধুনিকতার রূপটিকে করিয়াছে স্পষ্ট।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

"অগ্নিউদগারী ডিরোজিয়ান" বলিতে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার ও দক্ষিণারঞ্জনকে বোঝায়। ধর্মীয় গোড়ামি, নৈতিক কপটতা, সামাজিক কুসংস্কার, বিচারবুদ্ধিহীন শাস্ত্র রচনাশ্রয়ী আচার অনুষ্ঠান, জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, রাজনৈতিক ও মানসিক জড়তার বিরুদ্ধে ইহারাই ছিলেন একাডেমিক এসোসিয়েশনের 'অগ্নিবর্ষী বক্তা'। অশন-বসনের মধ্য দিয়া তাঁহাদের সংস্কার ভঙ্গের নির্ভীক পদক্ষেপ সকল রক্ষণশীলদেরই মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল বলিয়াই ডিরোজিয়ানদের মধ্যে ইহারাই সর্বাধিক লাঞ্ছিত।

ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জনই ছিলেন কলিকাতার অভিজাত বংশের সন্তান। তিনি সূর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র ছিলেন। বিত্ত ও কুলমর্যাদার সহিত বিদ্যা, বুদ্ধি ও বাকপটুতা মিলিয়া তাঁহার চরিত্র হইয়াছিল অতি নির্ভীক ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী। ছাত্রাবস্থায় হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাতারূপে কলেজীয় কর্তৃপক্ষ ইংরাজ উচ্চপদাধিকারীর তোষামুদি করিয়া ভূতপূর্ব বিচারপতি ইস্ট হাইড সাহেবকে সম্মান প্রদর্শন করাতে তিনি মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ৫৩৪ জন ছাত্রের প্রতিনিধি হইয়া ছাত্রদের সভা করিয়া প্রকৃত উদ্যোক্তারূপে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেবকে মানপত্র দান করেন। তাঁহারা মানপত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন :—

"আমরা সতর্ক হইয়াছি—অপবাদ দূর করাই আমাদের ইচ্ছা"।[৭১] তাঁহাদের কামনা অতি সাধারণ ও অন্তরস্পর্শী। তাঁহারা লিখিয়াছেন "আমাদেরই তৃপ্তির জন্য এমন একজন লোকের ছবি তুলিবার অনুমতি আমরা চাহিতেছি, যিনি হিন্দু সমাজের প্রাণে নূতন প্রেরণা দিয়াছেন। যিনি বিদেশকে স্বদেশ করিয়া লইয়াছেন, যিনি স্বেচ্ছায় নির্বান্ধব জাতির বান্ধব হইয়াছেন এবং যিনি স্বজাতীয় ও এদেশীয়গণের সমক্ষে যাহা গৌরবের তাহা মান্য করিবার এবং অমরত্ব অনুকরণ করিবার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতেছেন।[৭২]

শিক্ষক ডিরোজিওকে কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। ডিরোজিও তাহার প্রতিবেদনে দক্ষিণারঞ্জনের নিদর্শন দিয়া স্বীয় চরিত্রের ও দক্ষিণারঞ্জনের চরিত্রেরও একটি দিক স্পষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামে আমার একজন ছাত্র। সম্প্রতি তাঁহাকে লইয়া শহরে শহরে খুব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আমাকে জানায় যে বাড়িতে পিতার নিষ্ঠুর আচরণ তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। গৃহত্যাগ না করিলে তাহার উপায় নাই। আমি বুঝাইয়া বলিলাম, 'অত অধৈর্য হইলে চলিবে না, পিতামাতার আচরণ কিঞ্চিত অপ্রীতিকর মনে হইলেও সহ্য করা উচিত। গৃহ হইতে তাঁহারা যদি তোমাকে বিতাড়িত না করেন তাহা হইলে নিজে তুমি বাড়ি ছাড়িয়া যাইও না। আমার কথা শুনিয়া দক্ষিণা গৃহেই রহিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকদিন থাকিতে পারিল না। দুই তিন সপ্তাহ পূর্বে আমাকে না জানাইয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আমারই গৃহের নিকট একটি বাড়ি ভাড়া লইয়া চলিয়া আসিয়াছে। বাড়ি ওয়ালার সহিত ব্যবস্থা পাকা হইবার পর আমি জানিতে পারি এবং আমি যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমাকে না জানাইয়া তুমি গৃহত্যাগ করিলে কেন?' উত্তরে সে বলিল, 'আপনি তাহা হইলে কিছুতেই আমাকে বাড়ি ছাড়িতে দিতেন না'"[৭৩]

ইহাতে স্পষ্ট হইতেছে যে ডিরোজিও পুরাতন সকল প্রকার সংস্কার বিরোধী হইলেও মানব সংস্কৃতির বিরুদ্ধবাদী তো ছিলেনই না বরং সামাজিক ও পারিবারিক নৈতিক শালীনতার শিক্ষাই দিয়াছেন শিষ্যদের। নৈতিকতা সম্বন্ধে তিনি সেকালের পত্র পত্রিকায় নিবন্ধও লিখিয়াছেন।[৭৪]

পিতা মাতা অন্যায়ভাবে শাসন করিলেও সভ্য সমাজ অনুযায়ী পুত্রের কর্তব্য তাহা সহ্য করা। ডিরোজিওর প্রভাব ছাত্রদের উপর ছিল গভীর। দক্ষিণারঞ্জন গুরুর একান্ত বাধ্য শিষ্যরূপে পিতৃগৃহে বাস করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যাচারের সীমা ছাড়াইয়া গেলে গৃহত্যাগ করেন। তাঁহার ভয় ছিল গুরু কিছুতেই কোন অবস্থাতেই পিতা-মাতার বিরোধী হইয়া গৃহত্যাগ করিতে উৎসাহ দিতেন না। গুরুশিষ্যের সম্পর্কের ফল সামাজিক সাংস্কৃতিক শালীনতা বিরোধী ছিল না।

ভাগ্য বিতাড়িত বন্ধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়া রক্ষণশীলদের

কবল হইতে প্রায় মাস খানেক রক্ষা করিয়াছিলেন, পিতার অমতেই। ফলে দক্ষিণারঞ্জনের আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য হিন্দুরা উভয়ের উপর অত্যাচার করিয়া শেষ অবধি উভয়কেই গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। এইরূপই ছিল সেকালের ইয়ংবেঙ্গলদের ভাগ্য।

কিন্তু 'চরৈবেতি' 'চরৈবেতি' আধুনিকতার মন্ত্র শিষ্যদের জীবনাদর্শ। তাই কোন অত্যাচারই তাঁহাদের ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া সংস্কার কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। জনসমাজকে পাশ্চাত্য জ্ঞান দানের দ্বারা সংস্কার ও শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা জাত অন্ধকার হইতে মোহমুক্ত করিবার প্রচেষ্টায় তিনি বাংলা ভাষার 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রচার করেন। এসময় ইয়ংবেঙ্গলদের মত প্রচারের ও বিরোধীদের বিরুদ্ধে মসী যুদ্ধে জ্ঞানান্বেষণ ছিল তাহাদের মাধ্যম। ইহার মাধ্যমে বাংলা ভাষার ভিত্তি সুগঠিত করিবার প্রচেষ্টায় ইয়ংবেঙ্গলরাও দান রাখিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানান্বষণ সামাজিক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল প্রকার সমস্যা লইয়াই আলোচনায় প্রগতির পথ প্রদর্শক ছিল।

তাঁহার সমালোচনা ছিল অতি তীব্র। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইনমতে বিধিবদ্ধ হইলে স্যার চার্লস মেট্‌কাফকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য আয়োজিত সভায় দক্ষিণা-রঞ্জনের বক্তৃতা ছিল তীব্র সমালোচনামূলক। তিনি বক্তৃতায় স্বয়ং ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং-এর বিরুদ্ধে ভণ্ডামীর অভিযোগ করেন এবং ইংরাজের কপটতার মুখোশ খুলিয়া দেন। তিনি বলেন, "আমরা সে স্বাধীনতা চাই তাহা সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা নয়; তাহা দায়িত্বপূর্ণ অথচ অবাধ স্বাধীনতা। দোষী ব্যক্তি আইনের অধীন নিশ্চয় হইবে। সে যদি দণ্ডার্হ হয় বিচারালয় নিশ্চয় তাহাকে দণ্ড দিবে। আমি এইজন্য দুঃখিত যে, প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ না করিবার জন্য লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগের যথেষ্ট কারণ রহিয়া গিয়াছে। যদি তিনি এই আইন ভাল বিবেচনা না করিতেন তাহা হইলে উচিত ছিল আইনটি তুলিয়া দেওয়া। ইহার কোনটিই না করা নিছক ভণ্ডামী মাত্র।[৫৭]

এইরূপ তীব্র স্পষ্টভাষার বক্তৃতা সেকালে ভারতবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করিতে সহায়ক হইয়াছিল। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' হইতেই কালক্রমে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সমিতি 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার একটি অধিবেশন হয় ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজের হল ঘরে। সভাপতি ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং বক্তা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এইসভাতে তিনি কোম্পানীর আদালত এবং পুলিশ বিভাগ যে ন্যায়ের স্থান নয় সে সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়া তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া এই ব্যবস্থাকে 'extortion and corruption' বলেন। ভবানীপুর হিন্দুকলেজ অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন সাহেব বক্তৃতার মধ্যেই বাধা দিয়া বলেন, "যে হলবর গবর্ণমেন্ট নির্মাণ করিয়াছেন, কলিকাতা সহরের মত

বিদ্যাকেন্দ্রের মধ্যস্থলে, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সেই সরকারকে অত্যাচারী লুণ্ঠনকারী বলিয়া কটুভাষায় আক্রমণ করা আমি দেশদ্রোহিতা বলিয়া মনে করি। তাই আমি এই বিদ্যামন্দিরকে দেশদ্রোহীদের গোপন আড্ডাখানায় পরিণত হইতে দিতে পারি না –"[৭৬] সভার মধ্যে এইরূপ আচরণ শিষ্টতা ও শালীনতা বিরুদ্ধ। সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং দক্ষিণারঞ্জন প্রস্তাব করিয়া রিচার্ডসনের বিরুদ্ধে হিন্দুকলেজ ও প্রয়োজন হইলে সরকারের দ্বারা ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ করিলে, শেষ অবধি রিচার্ডসন সাহেব তাহার মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া সমস্যাটিব সমাধান করিলেন। এই বিষয় লইয়া দেশীয় এবং ইংরেজ পত্র পত্রিকার বাদানুবাদ পরিবেশ উত্তপ্ত করিয়াছিল এবং দেশীয়দের রাজনৈতিক ঐক্যের ও সংগঠনের প্রয়োজন বোধ বর্ধিত হইয়া 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়।

দক্ষিণারঞ্জনের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টা পরবর্তীকালে ভিন্ন প্রদেশবাসী হইয়াও স্তিমিত হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহকে বাঙালী প্রগতিশীল সংগ্রাম বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। কারণ মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামন্তবাদী রূপকে ভয়ের ও পশ্চাদবর্তী প্রয়াস বলিয়াই মনে করিয়া তাহারা বহুক্ষেত্রে বিরোধিতাও করিয়াছে। দক্ষিণারঞ্জন স্বাভাবিকভাবেই সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিলাতের টাইমস পত্রিকার ইংরাজের পক্ষেই দুই একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা প্রসারের অশেষ দান, সরকারী কর্মে বিশেষত ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে দক্ষতার পরিচয় এবং তাঁহার প্রগতিশীল বিচারধারার জন্য সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকার তাঁহাকে এক জমিদারী প্রদান করেন। তিনি লক্ষ্ণৌ অধিবাসী হইয়াও সমাজ সংস্কার ও দেশীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগরণে যথেষ্ট প্রচেষ্টা করিযাছেন। তিনি অউধ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিযেশন সংস্থাপন করেন। স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ন লক্ষ্ণৌতে এই 'অউধ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন' দেখিয়া বলিযাছিলেন – "ইহা আপনার পার্লামেণ্ট দক্ষিণারঞ্জন।"[৭৭] অযোধ্যায় তাঁহার শিক্ষা প্রসারে ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা এতদূর ফলবতী হইয়াছিল দে রাজনারায়ণ বসু তাঁহাকে অযোধ্যা প্রদেশের পুনর্জন্মদাতা বলিয়াছিলেন।[৭৮]

শিক্ষা প্রসারে তাঁহার নাম অপরাপর ডিরোজিয়ানদের ন্যায় ছিল। কিন্তু তিনি ধনে মানে তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী পুরুষ ছিলেন বলিয়া এই কর্মে দায়িত্বও বহন করিয়াছেন সর্বাধিক। বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি ইয়ংবেঙ্গলদের সকলের সহিত এই শুভকর্মে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বিদ্যালয়ের জন্য তিনি বিনা ভাড়ায় ৫৬ সুকিয়া স্ট্রিটের বৈঠকখানা বাড়ি ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার প্রায় পাঁচ সাত হাজার টাকা মূল্যের নিজস্ব পুস্তকালয়টি দান করিলেন এই বালিকা বিদ্যালয়ের পুস্তক ভাণ্ডারের জন্য। তদ্ব্যতীত বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জন্য মির্জাপুরের ৫½ বিঘা জমিও দান করিলেন। ৭-৫-১৮৪৯

তারিখে বিদ্যালয়টির উদ্বোধন হয়। বেথুন সাহেব ইয়ংবেঙ্গলদের এই অবদানের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এই শিক্ষা প্রচার প্রচেষ্টা অযোধ্যা প্রদেশেও চলিয়াছিল পূর্ণ মাত্রায়। লক্ষ্ণৌর 'ক্যানিং কলেজ' তাঁহার শিক্ষা প্রসারের অবদান। তাই রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন, "কেবল আমি পাগল নহি, আপনিও কিঞ্চিত পাগল। আপনি পাগল না হইলে ক্যানিং কলেজ ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সংস্থাপন করিতে পারিতেন না।"[৭৯]

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ নির্ভীক উদ্দামতার বাস্তব রূপায়ণের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। যেমন হিন্দুদের বিরোধিতা সত্বেও তিনি প্রায় একমাস কাল কৃষ্ণমোহনকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং ফলে গৃহত্যাগও করিয়াছিলেন। তেমনি বর্ধমানের তেজচন্দ্রের কনিষ্ঠা বিধবা রানী বসন্তকুমারীকে বর্ধমান-হইতে কলিকাতায় আনিয়া কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট বার্চ সাহেবের সম্মুখে সিভিল ম্যারেজ করিয়া একই সঙ্গে বিধবা বিবাহ, আদর্শ বিবাহ ও সিভিল ম্যারেজ সম্পন্ন করেন এবং আগত প্রায় শতবৎসরের নারী স্বাধীনতার আন্দোলনের পূর্ণফলের প্রত্যক্ষ রূপায়ণের প্রতীক হইয়া থাকেন। এই অনুষ্ঠানে 'ভাস্কর' সম্পাদক গুড়্গুড়ে পণ্ডিত অর্থাৎ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁহার সাথী।

ধর্ম সম্বন্ধে ইয়ংবেঙ্গলদের গতানুগতিকতার তীব্র বিরোধিতার সমাজে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহারা হিন্দুদের সমস্ত পুরাতন সংস্কারেরই বিরোধিতা করেন যুক্তির মাধ্যমে, সত্যের প্রতিষ্ঠায়। বৃদ্ধ বয়সেও কিন্তু তাঁহার সেইরূপ যুক্তিবাদিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বেদের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা দ্বারা বিংশ শতাব্দীর শেষপাদের যুক্তিবাদীদেরই চিন্তা ধারার সন্ধান পাওয়া যায়।

"লক্ষ্ণৌতে একবার কোন সাহেবের সহিত ধর্ম বিষয়ে কথোপকথনের সময় তিনি গোমতীর অপর পারস্থ প্রকৃতিপটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "ওই ওইখানে ব্রাহ্মণের বাইবেল।" তিনি বলিতেন, "বেদের অর্থ জ্ঞান, জ্ঞানই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ।"[৮০] তিনি উদার যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধিদ্বারা শাস্ত্রপাঠের মাধ্যমেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পাঠও তিনি গ্রহণ করেন।[৮১]

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কোন ক্ষেত্রে এমন ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজদের সহায়তা করিয়া 'রাজা' খেতাব লাভ করেন। কিন্তু ইহা সত্য নয়। কারণ তিনি ইংরাজ দ্বারা রাজা খেতাবে ভূষিত হন নাই। প্রকৃত পক্ষে এই খেতাব দিয়াছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম বাহাদুর। এবং এই খেতাব দক্ষিণারঞ্জন পাইয়াছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের বহু পূর্বেই। ইংরাজের কর্মে তিনি নিযুক্ত হন ১৮৫৪ সালের জুন মাসে। এই সম্পর্কে সংবাদ প্রভাকর ২-৬-১৮৫৪ তারিখে লিখিয়াছে :—

"ইংলিশম্যান সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে বাবু হরচন্দ্র ঘোষ মৃত বাবু রসময় দত্তের পরিবর্তে ছোট আদালতের কনিষ্ঠ বিচারকের পদে অভিষিক্ত হইবেন এবং বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় পরিবর্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কার্যের ভার গ্রহণ করিবেন।[৮২]

সংবাদ প্রভাকর এই নিযুক্তিকে উৎফুল্ল হইয়া আরও লিখিয়াছে :–

"বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুলিশের আসন প্রাপ্ত হইলে তাঁহার দ্বারা অতি উত্তমরূপে কার্য্য নির্বাহ হইতে পারিবেক। তিনি বিশেষ সদ্বিদ্বান ও বহুদর্শী স্বদেশের কুশল বর্দ্ধন বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ আছে, পুলিসের কার্য্যে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা ভাজন হইবেন এবং তাঁহার সুবিচারে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষই তাঁহাকে সুবিচারক বলিয়া মান্য করিবেন"[৮৩]

এই সময়ের পূর্বে তিনি নিযুক্ত ছিলেন মুর্শিদাবাদ নবাবের দেওয়ান রূপে। সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকীয় অংশে লিখিয়াছে (৩১-৫-১৮৫২)

"শ্রীল শ্রী নবাব বাহাদুর দক্ষিণারঞ্জন বাবুকে আপনার মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করত অতি সম্মানপূর্বক রাজোপাধি প্রদান করিরাছেন। এবং তাঁহার প্রতি তাবৎ কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ইতিমধ্যেই কর্ম্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতার দ্বারা নবাব বাহাদুরের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছেন, এবং সমস্ত কার্য্যেই সমূহ সুখ্যাতি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহায় মাসিক বেতন (২০০১) দুই সহস্র এক এক মুদ্রা নির্দিষ্ট হইয়াছে।"[৮২]

আবার সংবাদ প্রভাকর সংবাদ পাওয়া যায় ২-৮-১৮৫২ তারিখে,

আমাদিগের পরমবন্ধু কার্য্যকৌশল সুবিচক্ষণ অভিনব দেওয়ান শ্রীযুক্ত রাজা দক্ষিণারঞ্জন বাহাদুর, নবাব নাজিম কর্তৃক যেরূপ সম্মানিত হইয়াছেন আমরা বোধ করি অন্য কোন এতদ্দেশীয় ব্যক্তি নবাব সরকারে এরূপ সম্মান প্রাপ্ত হয়েন নাই। ... শ্রীমান্ দেওয়ান বাহাদুর এই পর্বাহ উপলক্ষে নজর ধরিলে শ্রী শ্রীযুক্ত (নাজিম বাহাদুর) অতি সন্তুষ্ট মনে নিম্নলিখিত খেলোরাত সকল প্রদান করিলেন।"[৮৫]

ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইতেছে যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সিপাহী বিদ্রোহের বহু পূর্বেই খেতাব পাইয়াছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান রূপে এবং এই বিষয় লইয়া ১৮৫২ সালেও কোন কোন মহল মিথ্যা কুৎসা রচনা করিয়াছিল। এই কুৎসা রচনার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রভাকর পূর্বোদ্ধৃত সংবাদ ও সম্পাদকীয় ছাপিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এবং পরেও ইয়ংবেঙ্গলদের চরিত্র মসীকৃত করিবার প্রয়াস হইয়াছে বিভিন্ন মহল হইতে নানা কারণে। ইহার বহুলাংশ অসত্য বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে বিংশ শতাব্দীতে।

রামগোপাল ঘোষ

"So long as Bengal produces such sons she need have no missings to her future place among nations".

এফ্, জে, মৌএট রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন বা

ভারতবর্ষীয় সভায় আয়োজিত শোকসভা সম্পর্কে প্যারীচাঁদ মিত্রকে রাঁচী হইতে ১২।২।১৮৬৮ তারিখে চিঠিতে এই কথা লিখিয়া রামগোপালের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জানাইয়াছিলেন। ইয়ংবেঙ্গলের শিক্ষাগুরু ডিরোজিওর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁহার তরুণ শিষ্যদের ভবিষ্যৎ কর্মধারার মধ্য দিয়া অমরত্ব লাভের স্বপ্ন দেখিয়া নিজেও আনন্দিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন সার্থক তাঁহার নিজের জীবন "And then I feel I have not lived in vain[৮৬] দীর্ঘদিনের ব্যবধানে মৌএট সাহেব সেই স্বীকৃতিই দিয়া গেলেন।

এই কর্মবীরের পিতা গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ চীনাবাজারে সামান্য ব্যবসায়ী কর্মে লিপ্ত ছিলেন। সংসার নির্বাহ দায় হইলেও পুত্র রামগোপাল বাল্যপাঠ শেরবোর্ণের পাঠশালায় অল্পদিন চলিয়াছিল। মেধাবী ছিলেন বলিয়া রামগোপাল মিস্টার রজার্স (Mr. Rogers) নামে কিং হ্যামিলটন কোম্পানির একজন কর্মচারীর অর্থানুকূল্যে হিন্দু কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে স্বীয় মেধার স্বীকৃতিতে হিন্দু কলেজের ফ্রিস্টুডেন্টরূপে দ্বিতীয় শ্রেণী অবধি পাঠ করিয়াছিলেন। ১৮৩২ সালে হেয়ার সাহেবের আনুকূল্যে মিস্টার জোসেফ নামে একজন ইহুদী ব্যবসায়ীর ইংরাজী ও দেশীয় ভাষা অভিজ্ঞ কেরানীরূপে মাসিক ৮০্ টাকা বেতনে মাত্র ১৭ বৎসর বয়স হইতে কর্ম জীবনের আরম্ভ করিতে বাধ্য হন। তৎসত্ত্বেও কিছুদিন তিনি চাকুরী ও হিন্দু কলেজের পাঠ বহুকষ্টে যুগপৎ চালাইয়া যান।

ডিরোজিওর প্রতিভার চৌম্বক শক্তিতে তিনিও আকর্ষিত হন এবং সমগ্র জীবন এই প্রতিভার প্রভাব তাহার পাথেয় ছিল। রামগোপাল ঘোষ ডিরোজিওর একজন অতি প্রিয় শিষ্য। রামগোপালের বক্তৃতা শক্তির বিকাশ হয় একাডেমিক এসোসিয়েশনে। স্যার এডোয়ার্ড রায়ন (যিনি সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি হইয়াছিলেন), মিঃ ডবলিউ ডবলিউ বার্ড (যিনি পরে ডেপুটি গবর্ণর হইয়াছিলেন) প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা একাডেমিক এসোসিয়েশন-এর অধিবেশনে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহারা রাম-গোপালের সহায় হইয়াছেন।[৮৭]

তাঁহার জীবনের পথ অতি সহজ ছিল না। উৎকট দারিদ্র ও মধ্যযুগীয় সমাজ প্রভাব সন্নিবিষ্ট পরিবেশ তাঁহার জীবনের অগ্রগমনের পথ করিয়াছিল বন্ধুর। কিন্তু জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া তিনি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধরণের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রভূত অর্থ ও বিত্তের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি আচার আচরণে দেশীয় ভাবধারার বিরোধী ছিলেন এবং ব্যবহারিক জীবনে সায়েবীয়ানা তাঁহাকে সেকালের প্রথম সারির দেশীয় সাহেব করিয়াছিল। তিনি যেমন সকল প্রকার সামাজিক সংস্কার কর্মে অংশ গ্রহণ করিয়া অর্থ সামর্থ্য দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তেমনি ব্যবসা বাণিজ্যের নবনব পন্থায় সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়া বাঙালী জীবনে এক নব দিগন্তের প্রসার করেন। কিন্তু তাঁহার আধুনিকতার অর্থ ভিত্তিক

জীবন যেমন দ্বারকানাথের ন্যায় সার্থক হইয়াছিল, তেমনি আবার প্রকৃত ডিরোজিয়ানদের বিশেষত্ব অর্থাৎ অবাধ জ্ঞানের আহরণের দ্বারা তাহার ব্যক্তিক মানসের প্রসারের প্রচেষ্টা চলিয়াছিল আজীবন আধুনিকতার ধর্ম রূপে। তাঁহার শিক্ষা সাঙ্গ করিতে মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতেই। ব্যক্তিগত জীবনে জনচক্ষুর অন্তরালে তাঁহার অন্তঃসলিলা জ্ঞানতৃষ্ণা কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় তাঁহার 'দিনলিপি' হইতে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন,—"যেদিন কিছু ভাল বিষয় পড়িতেছেন না, সেদিন দুঃখ করিতেছেন।"[৮৮]

পাশ্চাত্য প্রভাব তাঁহার জীবনে কতদূর পড়িয়াছিল এই দিনলিপি তাহার প্রমাণ। কর্মব্যস্ততাও তাঁহাকে আত্মোন্নতির প্রচেষ্টা হইতে বিরত করিতে পারে নাই। রাধানাথ শিকদার ও রামগোপাল ঘোষের মধ্যে এই পাশ্চাত্য অনুসারী নিয়মিত দিনলিপি রচনার অভ্যাসের জন্য তাঁহাদের মানস স্বরূপের পরিচয় স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিয়াছে।

রামগোপালের পিতামহের মৃত্যুতে হিন্দুরা স্বজাতিচ্যুত ব্যক্তির গৃহের মৃতদেহ সংকারে বাধার সৃষ্টি করিল। তাঁহাদের এইরূপ অন্যায় আচরণে ভীত সন্ত্রস্ত পিতাপুত্র রামগোপালকে সর্বসমক্ষে বলিতে অনুরোধ করিলেন যে তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ বিরুদ্ধ আচরণ কিছু করেন না। ইহাতে হিন্দুত্বের উগ্রতাবাদীরা হয়তো সন্তুষ্ট হইয়া যাইতেন। কিন্তু সত্যাশ্রয়ী রামগোপাল পিতার দুরবস্থায় ক্লিষ্ট হইয়াও ক্ষণিকের জন্য আদর্শচ্যুত হইয়া মিথ্যা বলিতে রাজি হইলেন না। তাহার উত্তর, "আপনার অনুরোধে আমি সর্ববিধ কার্য করিতে এবং সকল ক্লেশ সহিতে প্রস্তুত, কিন্তু মিথ্যা বলিতে পারিব না"। আপাত দৃষ্টিতে আপোষহীন উগ্র মনে হইলেও পরে সকলের চক্ষেই তিনি সম্মানীয় আদর্শবাদী বলিয়া পরিচিত হন।

সেযুগ ছিল অর্থসর্বস্ব। এমনকি রক্ষণশীল হিন্দুরা অর্থোপার্জনে নাস্তিকতারও যুক্তি সহনীয় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ডিরোজিয়ানদের ভাবস্রষ্ট জীবন ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্যবসায় সংকটের সময় তাঁহাকে বেনামীতে সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া পাওনাদারদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অনেক কঠিন পরামর্শ তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, "আমার সর্বস্ব যায় সেও ভাল, আমি ওনাদিগকে প্রতারণা করিতে পারিব না।"[৮৯]

ডিরোজিওদের দৃষ্টিতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ছিল আধুনিকতার প্রবর্তন—সংস্কার ভাঙাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। এই দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহাদের চিকিৎসা বিদ্যার প্রসারের ক্ষেত্রে কারিগরি বিদ্যা প্রসারের প্রচেষ্টায়, স্ত্রী-শিক্ষায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়। রামগোপাল ঘোষ ১৮৪২ সালে অস্ত্রোপচারের উপযোগী ৫০০৲ টাকা মূল্যের একপ্রস্থ যন্ত্রপাতি সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে উপহার প্রদান করেন। সরকার তাঁহার দানের প্রশংসা করিয়া পত্র দিলে রামগোপাল উত্তরে জানাইয়াছিলেন যে স্বদেশ-

সেবা, শিক্ষা দান, শিক্ষা প্রসার তাঁহার বিশেষ কর্তব্য কর্ম।[৯০] হুগলী জিলার বাঘাটিতে নিজ গ্রামে তিনি ইংরাজী ও বাংলা স্কুল স্থাপন করেন।

স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে ইয়ংবেঙ্গলরা ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহী। জাতির অর্ধ সংখ্যককে অশিক্ষিত রাখিয়া সমাজ সংস্কারমুক্ত হইতে পারিবে না। নারীর সমস্ত সমস্যার সমাধান আনয়নে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা ভাবিয়াই ১৮৪২ সালে রামগোপাল হিন্দু কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার উপর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতায়, প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ছাত্রকে এক একটি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পুরস্কারের ঘোষণা করেন। মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় হন। এই ভাবধারা নবযুগের ছাত্রদের মধ্যেও জাগ্রত করিবার প্রয়াসী হইয়া ইয়ংবেঙ্গলরা এই আন্দোলনকে ক্রমে তীব্র করিতে সক্ষম হন।

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেবের স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টাকে ফলবতী করিবার প্রয়াসে তিনি ইয়ংবেঙ্গলদের লইয়া এই কর্মে, সর্বপ্রকারে সাহায্যকারী। তিনি এই প্রচেষ্টার প্রধান উপদেষ্টা বলিয়া বেথুন সাহেব বড়লাট লর্ড ডালহৌসিকে পত্রে জানান।

১৮৪৪ সালে রামগোপাল ঘোষ হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড কমিটির একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উৎকৃষ্ট বাংলা রচনার জন্য লেখকদের পুরস্কার প্রদান করা। ১৮৬৪ সালে কেবলমাত্র স্ত্রী পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশনের জন্যই অর্থ ব্যয় করা সাব্যস্ত হয়। রামগোপাল ঘোষ ১৮৬৭ সাল অবধি এই কমিটির একজন অধ্যক্ষ এবং ফণ্ডের ন্যাস রক্ষক ছিলেন।

তাঁহার শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা কখনই দমিত হয় নাই। ১৮৪৮ হইতে ১৮৫৫ জানুয়ারী মাস অবধি তিনি শিক্ষা সমাজের সদস্য হিসাবেও সর্বদাই শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনার মূলে তিনিও ছিলেন একজন উৎসাহী। হিন্দু কলেজের রূপ পরিবর্তিত করিয়া 'প্রেসিডেন্সী কলেজ' ও 'হিন্দু স্কুল' করিবার পরামর্শ দাতাদের মধ্যে তিনিও একজন। সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি অতিক্রম করিতে না পারিলে দেশের অগ্রগতি দ্রুতলয়ে পরিবর্তিত করা সম্ভব হইবে না। ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁহার অবদানও স্মরণীয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরিচালক সভার (সেনেটের) একজন সদস্য (ফেলো) মনোনীত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫,০০০৲ টাকা দান করেন। শিক্ষা প্রেমী ডিরোজিয়ানদের ও নব্য ভারতের অগ্রদূত ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিরক্ষার্থে ১৮০১ সালে প্রস্তরমূর্তি স্থাপনের জন্য এক মাসের আয় দান করেন।

বেথুন সোসাইটি ছিল বিশেষত শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, ধর্ম রাজনীতি প্রভৃতির আলোচনা সভা। এই সভায় নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠও হইত।

বেথুন সোসাইটিতে দেশীয় ও বিদেশীয়, (ইংরাজ, আমেরিকান ও অন্যান্য দেশীয়গণ) বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে বেথুন সোসাইটির বিশেষ অবদান আছে। রামগোপাল ঘোষ প্রথমাবধি ইহার সহকারী সভাপতি ছিলেন।

১৮৩২ সালে ৪০ টাকার কেরানীর কর্মের দ্বারা তাঁহার জীবন সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তিনি যেমন জ্ঞানাহরণে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমনি এই সামান্য চাকবি করিয়াও মনিবের ব্যবসায়ী কৌশল আমদানি রপ্তানির ব্যবসায়ী আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তিনি বহুশ্রমে সমগ্র দেশের উৎপন্ন ও শিল্পজাত দ্রব্যের তালিকা করেন। ব্যবসায়ের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী দৃষ্টির সমন্বয় হইয়া তাঁহার কৃতিত্বমুখী ব্যক্তিত্বকে ব্যবসায়ের মূল সূত্রটির সন্ধান দিয়াছিল জীবনের প্রথমাবস্থারই।

কিছুকাল পরেই ধনী টি, এন, কেলসাল (Kalsall) নামক ইহুদী ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবসায়ে যোগদান করিলে রামগোপাল ঘোষ নূতন সংস্থার বেনিয়ান হন এবং অল্পদিনেই প্রভূত অর্থের অধিকারী হন। পরে তিনি ও কেলসাল একত্রে 'কেলসাল ঘোষ এণ্ড কোম্পানী' স্থাপন করেন। ১৮৪৬ সালে কোম্পানী হইতে তিনি ২ লক্ষ টাকা লইয়া সাময়িকভাবে নিজ ব্যবসা উঠাইয়া লন এবং ১৮৪৮ সালে কেলসালের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৮৪৯ সালে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা করেন। সংবাদ প্রভাকর ১৮-৫-১৮৪৯ তারিখে বাঙালীর এই প্রচেষ্টায় উৎফুল্ল হইয়া লিখিয়াছে,

"এতদ্দেশের পরম হিতকারী বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত আর, জি, ঘোষ এণ্ড কোং নামে এক হোস করিবেন। আগামি মে মাস অবধি তাহার কার্যারম্ভ হইবেক, ঐ হোসে রামগোপালবাবু ও তাঁহার ভাগিনেয় অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত থাকিবেন। এবং বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কাগজ পত্রাদি তাঁহারা উভয়েই স্বাক্ষর করিবেন।"[৯১] আকিয়াব ও রেঙ্গুনে শাখা এবং লণ্ডনে একটি (এজেন্সি হোস স্থাপিত হয় ব্যবসায়ের সুবিধার্থে।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিশাল শিল্প ও ব্যবসার নষ্ট হইবার একটি কারণ তিনি বাঙালীদের মধ্যে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী চেতনা সৃষ্টির প্রয়াসী হন নাই। আধুনিক রামগোপাল সেক্ষেত্রে আরও অগ্রগামী হন এবং উদ্যোগী যুবকদের সর্বপ্রকারের সাহায্য করিতে সচেষ্ট হন। তাই ১৮৪৬-৫০ বাণিজ্যিক সংকটের কালে রামগোপাল রক্ষা পাইয়াছেন।

ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা ব্যবসায় স্বদেশের পক্ষে হিতকর এবং মূলধন সংগ্রহ, প্রয়োগের ও প্রসারের একটি প্রধান উপায়। তিনি এ কর্মেও অগ্রসর হন। ২৩-১১-১৮৬৩ তারিখের সোম প্রকাশ লিখিয়াছে, সম্পূর্ণ বাঙালীদের কর্তৃত্বে একটি বীমা কোম্পানী গঠিত হয়। 'সংবাদ পূর্বচন্দ্রোদয়' ৭-১২-১৮৬৫ তারিখে লিখিয়াছে,

সঞ্চয় ভাণ্ডার। এতদ্দেশে······ সম্প্রতি মনুষ্য জীবনের উপর বীমা করিতে ······ এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ঐ সভার কর্মাধ্যক্ষপদে শ্রীযুক্ত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত হীরালাল শীল, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি মান্য ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাদিগের প্রতি সমুদায় সাধুব্যক্তির বিশ্বাস ও আস্থা আছে।"[৯২]

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছেন এবং বাঙালীদের মধ্যে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি প্রসারের চেষ্টাও করিয়াছেন। ব্যবসা বাণিজ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল বলিয়াই ব্যবসায়িক অসঙ্গতি, সরকারী নীতি, কর-বিন্যাস, কাঁচা মাল ও উৎপাদিত পণ্যের সবিশেষ জ্ঞান ও বাজারের সহিত তাহার সম্পর্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন সময়ে নানা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁহাকে পূর্বতন ব্যবসায়ী বিত্তবানদের সহিত পৃথক করিয়া তাঁহার আধুনিকতার রূপটিকে প্রকাশ করিয়াছে। তিনি 'সিভিক' (Civic) ছদ্মনামে জ্ঞানান্বেষণে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন (Transit Dutis) সম্বন্ধে। নগর হইতে নগরান্তরে পণ্য প্রেরণের কালে নগর প্রবেশ মুখে কর দিতে ব্যবসায়িক নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়া তিনি প্রবন্ধগুলি লিখিলে পরে এই কর উঠিয়া যায়। সংবাদপত্রকেও তিনি অর্থনীতির জ্ঞান বৃত্তির কর্মে ব্যবহার করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রসঙ্গে আলোচনায় লিখিয়াছেন "মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাংলাদেশে দেশ বাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে।"

ইয়ংবেঙ্গলদের আবেগ ছিল স্বদেশপ্রেমাশ্রিত। তাঁহাদের সকল সভা সমিতির আলোচনায় রাজনীতি অর্থনীতির স্থান ছিল সচেতন যুক্তিবাদীর ন্যায়। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা এই সম্পর্কে তাহাদের বিশেষ কীর্তি। প্রবন্ধ পাঠ আলোচনার মধ্য দিয়া রাজনৈতিক সচেতনতা প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে বর্ধিত হয়। রামগোপাল ঘোষ ২০-৪-১৮৪৩ তারিখে টমসনের সভাপতিত্বে বেঙ্গল ব্রিটিশ সোসাইটি নামে এক রাজনীতিক সভা স্থাপন করেন। ১৮৪৫ সালে রামগোপাল ঘোষ ইহার সভাপতি হন।

রামগোপাল ঘোষ তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত যুক্ত হইয়া, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির ভারতীয় জাতীয়তার সংযোগ স্থাপনা করেন। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ও তত্ত্ববোধিনী সভা পরস্পর পরিপূরকরূপে জাতীয়তার প্রেরণা প্রসারে কার্যকরী হইয়াছে। ক্রমে রক্ষণশীল, ব্রাহ্ম সমাজ ও ইয়ংবেঙ্গলদের জাতীয় প্রয়োজনে সংযোগ স্থল হয় রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র।

রামগোপাল ঘোষ পুলিশ কমিটি (১৮৪৫), স্মল পক্স কমিটি (১৮৫০) কৃষি প্রদর্শনী কমিটি (১৮৬৪) এবং দীর্ঘকাল মিউনিসিপ্যাল কমিটির সভ্য হন।

৬

তিনি ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটির নেটিভ কমিটিতে আমৃত্যু সভাপতি ব্রতী হন। ক্রমে জন-সংগঠন বৃদ্ধিতে রামগোপালের বাগ্মিতা সার্থকতা লাভ করে। ২৪-১২-১৮৪৭ তারিখে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে তাঁহার ভারত হিতৈষী কর্মের জন্য সভায় কৃষক আইনের প্রস্তাব অবজ্ঞা প্রকাশের দ্বারা বানচাল করিতে চাহিলে, বিখ্যাত ইংরেজ বাগ্মী হিউম (Furton Hum) ও কাভিলের যুক্তি রামগোপাল ঘোষ অভূতপূর্ব বক্তৃতা দ্বারা নাকচ করিয়া অভিভূত সভায় প্রস্তাবটি পাশ করাইয়া লন। ইংরাজ পত্রিকা এই সম্পর্কে রসিকতা করিয়া লিখিয়াছে :—

"ভারতবর্ষে একজন তিমিস্থিনিস দেখা দিয়াছে, একজন বাঙালী যুবক তিনজন সুদক্ষ ইংরাজ ব্যারিষ্টারকে ধরাসায়ী করিয়াছে।"[৯৩]

বিচার বিভাগে দেশীয় ও বিদেশীয়দের বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টায় ডিঙ্কওয়াটার বেথুন (আইন সচিব) সাহেব সরকারের পক্ষে চারিটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া ১৮৪৯ সালের শেষে প্রচার করেন। ইহার পূর্বে ১৮৩৩ সালে মেকলের এই প্রচেষ্টা সাহেবদের তীব্র বিরোধিতায় ব্যর্থ হয়। এইসময় আবার সাহেবেরা তীব্র বিরোধিতা করিয়া ইহার নাম দেন Black Act. রামগোপাল ঘোষ সরকারের ও দেশীয়দের পক্ষে বিচারে বর্ণবৈষম্য দূরকরণের জন্য পুস্তিকা প্রণয়ন করেন এবং সভা সমিতিতে বক্তৃতা করেন। ফলে যেমন দেশীয়দের মধ্যে সাহেবদের বিরুদ্ধে জাতীয়তার ভাব প্রসারিত হয় তেমনি সাহেরাও রাগান্বিত হইয়া 'এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারল সোসাইটি' হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেন।

ইহার ফল হইল সুদূর প্রসারী। বাঙালীরা নিজেদের হীনাবস্থা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া সাহেব বিবর্জিত রাজনৈতিক সমিতি গঠন করেন (২৮-১০-১৮৫১ তারিখে) 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন' বা 'ভারতীয় সভা'। রাজা রাধাকান্ত দেব ইহার সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক। রামগোপাল ও অন্যান্য ইয়ংবেঙ্গল ইহার সক্রিয় সভ্য প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ ভারতীয়ের সমিতির সূত্রপাত এই সভা হইতেই।

২৯-৭-১৮৫৩ তারিখে কোম্পানীর নূতন সনদ পুনঃ প্রাপ্তি উপলক্ষে তিনি পার্লামেণ্টের নিযুক্ত কমিটির নিকট হেলিডের (Frederick Holiday) ভারতীয়দের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যর যুক্তি খণ্ডন করেন এবং বড়লাটের আইন সভায় একজন ভারতীয় সভ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া দেন।

১৮৬২-৬৪ দুই বৎসর তিনি বঙ্গের আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। নিমতলা শ্মশানঘাট স্থানান্তরনের সম্পর্কে ছোট লাট সিসিল বীডন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে যে নির্দেশ দান করেন তাহার বিরুদ্ধে তিনি অকাট্য জোড়ালো যুক্তির সাহায্যে বক্তৃতা করেন। ইহা লইয়া সমগ্র হিন্দু সমাজে এত আলোড়ন হয় যে শেষ অবধি বীডন সাহেব আদেশ প্রত্যাহার করিয়া লন।

ইয়ংবেঙ্গলদের গোষ্ঠীচেতনা আজীবন এতই গভীর যে রামগোপাল ঘোষ ও

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অর্থ সাহায্য দ্বারা বন্ধুদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সাংস্কৃতিক সম্মিলনের ও সম্মিলিত দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহাসিক গৌরবোজ্জ্বল কালের নিদর্শন সকল দর্শন ও সেই সম্বন্ধে ভারতীয়দের প্রাণে ভারতীর জাতীয়তাবোধের উদ্রেক করণ। তাই রামগোপালের বন্ধুদের সহিত তাহার ছোট জাহাজ লইয়া মুর্শিদাবাদ, গৌড় প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণের সুন্দর প্রচেষ্টা ছিল। রাজনারায়ণ বসু ইহার সুন্দর বর্ণনা দিয়াগিয়াছেন। রামগোপাল ঘোষকে তিনি একুরাজ অর্থাৎ এডুকেটেডদিগের রাজা উপাধি দিয়াছেন।

রাধানাথ শিকদার

'সোমপ্রকাশ' ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭ সালে লিখিয়াছে, "আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি বাবু রাধানাথ শিকদারের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন।"

'অমৃতবাজার পত্রিকা' আরও বলিয়াছে (২৬-৫-১৮৭৪) "লাটিন গ্রীক ভাষাতেও ইহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল"।

আর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে গিয়া বিস্তৃত আলোচনার পর (২৩-৫-১৮৭০) লিখিয়াছে,

"Radhanath was a remarkable man and had many qualities"

রাধানাথ শিকদার বহুগুণ সমন্বিত এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

সত্যই রাধানাথ শিকদার বহুগুণের আকর ছিলেন। একদিকে যেমন তিনি সেকালের প্রতিষ্ঠিত অঙ্কবিদদের মধ্যে একজন, অন্যদিকে ক্লাসিক সাহিত্য গ্রীক, লাটিন ও সংস্কৃতেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি উল্লেখনীয়। আবার আধুনিক ইংরাজী ভাষার চর্চা ও আবৃত্তিতে ছাত্রবস্থাতেই তিনি বিশিষ্ট অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। পরিণত বয়সে বাংলাভাষা বিস্মৃত হইবার নিন্দাবাদে তাঁহাকে জর্জরিত হইতে হয় প্রাক্তন অনুজ হিন্দুকলেজ ছাত্রদের দ্বারা এবং তাই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াই তিনি আবার অতি আধুনিক সরল কথ্য ভাষায় প্রচার ও উন্নতি সাধনে উদ্যোগী হইয়া 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করেন—বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগিতায়। তিনি যে বাংলা ভাষার প্রয়োগ করেন তাহা সেকালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধুনিক এবং বালক ও নারীর বোধ্য সাবলীল শুদ্ধ কথ্য ভাষা।

কর্মব্যপদেশে আজীবন খৃষ্টান বিদেশীয়দের মধ্যে বসবাস করিয়াও তিনি কখনই খৃষ্টান হন নাই। অথচ তাঁহার বিশ্বাস অনুযায়ী গোমাংস আহারের দ্বারা শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির উপদেশ বাঙালী জাতিকেও দিয়া গিয়াছেন। দৈহিক মানসিক উন্নতি দেশের সার্বিক মঙ্গল সাধন করিবে এ ধারণা তাঁহার ছিল। বীর্যবান মদমত্ত ইংরাজ ও পশ্চিম ভারতীয় বিশালকায় পুরুষদের মধ্যেও তিনি 'লেভিয়েথান' বলিয়া

স্বীকৃতি সূচক নাম পাইয়াছিলেন। সুতরাং অতি সহজেই যে দেশ মানুষকে দেবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভ্যস্ত সেখানে শতবৎসরের মধ্যে এমন এক বহুগুণ সম্বন্বিত বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে কিম্বদন্তির সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক এবং রাধানাথ শিকদারের ক্ষেত্রে তাহা হইয়াছে অনেকাংশেই।

রাধানাথ শিকদার ও তাঁহার অনুজ শ্রীনাথ শিকদার জোড়াসাঁকোর শিকদার পরিবারের তিতুরাম শিকদারের দুই প্রতিভাশালী পুত্র। উভয়েই অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং যোগ্যতার নিমিত্ত জরিপ বিভাগের কর্মে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। তাঁহার জন্ম ১৮১৩ সালের অক্টোবর মাসে। গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠ সাঙ্গ করিয়া চিৎপুর রোডের ফিরিঙ্গী কমল বসুর স্কুলে অধ্যয়নের পর তিনি ১৮২৪ সনে হিন্দুকলেজে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। মেধাবী ছাত্র বলিয়া তিনি ১৮২৭ সালে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়া বিখ্যাত সাহিত্যেক হেনরি লুই ডিভিয়ান ডিরোজিওর নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। ডিরোজিওর শিক্ষা রাধানাথের উপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে তিনি আত্মচরিতে শ্রদ্ধাপ্লুত মনে লিখিয়াছেন,

"ডিরোজিও দয়ালু ও স্নেহশীল শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাবত্তার অভিমান করিলেও তিনি সুবিদ্বান ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ জ্ঞান-লাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিতেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে সাহিত্যিক যশের আকাঙ্খা আমার মনে এমন ভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে যে, আজিও তাহা আমার সকল কর্ম নিয়মিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় আমি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। তাঁহার নিকট হইতে এরূপ কতকগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করিয়াছি, যাহা চিরকাল আমায় কার্য্যকে প্রভাবিত করিবে। বড়ই দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের উন্নতির নানা জল্পনার মধ্যে যৌবন পদার্পণ করিতেই মৃত্যু তাঁহাকে অপসারিত করিয়াছে। ইহা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা যাহা সমাজের শিক্ষিতদের মধ্যে এখন এত অধিক দেখা যায় এবং যাহা ভারতবর্ষের হিতকর না হইয়া যায় না এ সকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই।[৯৪]

১২-২-১৮৩১ হিন্দু কলেজ বাৎসরিক পুরস্কার সভায় কেবল ছাত্রদের আবৃত্তির ক্ষেত্রেই নয়, তিনটি শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচয়িতার মধ্যে রাধানাথ স্থান লাভ করেন (অপর দুইজন—রামতনু লাহিড়ী ও হরচন্দ্র ঘোষ উভয়েই ডিরোজিও ভক্ত) রাধানাথের প্রবন্ধের বিষয় ছিল অতি আকর্শনায়,

"The cultivation of science is no more favourable to individual happiness, nor more useful and honourable to nation than that of polite literature."

ছাত্রদের উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়া ১৪-২-১৮৩১ 'গভর্নমেণ্ট গেজেট লিখিয়াছে, "লেখকত্রয় নিজ নিজ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধগুলি তাঁহাদের জ্ঞানের বিশেষ

পরিচায়ক—তাহাদের যুক্তি ও বিচার ক্ষমতাও বেশ প্রকটিত হইয়াছে।"[৯৫]

প্রথম শ্রেণীতে পাঠকালেই তাঁহাকে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়।[৯৬] ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির আশা ছিল যে হিন্দুকলেজের ছাত্ররাই একদিন দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদিবার ব্যবস্থা করিবে। তাঁহারা দেশপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া জ্ঞানের প্রসার করিবে এবং বিদ্যালয় স্থাপন করিবে ও নানাভাবে শিক্ষাদান করিবে। প্যারীচাঁদ মিত্র এক বন্ধুর সহযোগিতায় নিজগৃহে এক অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং সেখানে রাধানাথ শিকদার ও শিবচন্দ্র দেব সোৎসাহে ছাত্রদের পড়াইতেন। ছাত্রদের সে সময়ের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়, 'হিতৈষী বিদেশীয়দের স্থাপিত বিদ্যালয় ব্যতিরেকে (এদেশে) অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্তু কালক্রমে মহারূপান্তর হইয়াছে। এইরূপে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা স্বদেশীয়দিগকে মাতাব ন্যায় জ্ঞান করেন এবং স্বদেশীয়দের উপকারর্থ যাহা কর্তব্য তাহা তাঁহারা সুজ্ঞাত হইয়াছেন। হিন্দুদিগকে বিদ্যাবিতরণার্থ কলিকাতার নানা পল্লীতে হিন্দুদের কর্ত্তৃক নানা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। — — ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছয়টা পৌর্বাহ্নিক পাঠশালা নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে তিনশত সতর জন বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। এই সকল বিদ্যালয় হিন্দু কলেজে সুশিক্ষিত হিন্দু যুব মহাশয়ের দ্বারা স্থাপিত হইয়া সম্পন্ন হইতেছে।"[৯৭]

তদানীন্তন কালে ইংরাজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সংস্কৃত ও আরবী ফারসীতে অনুবাদ করানো শিক্ষা বিভাগের এক প্রধান কর্তব্য ছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরাজী হইতে সংস্কৃত অথবা সংস্কৃত হইতে ইংরাজীতে এবং কখন বা বাংলায় প্রয়োজনীয় গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া হিন্দুকলেজের উদ্যোক্তাদের আশা বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছেন। এই কর্মে তাঁরাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর ন্যায় রাধানাথ শিকদারও ইংরাজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদের কর্মে ডঃ টাইটলার দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল রাধানাথ জরিপের কর্মে বাংলাদেশ হইতে বহুদূরে ছিলেন বলিয়া হিন্দু কলেজের স্বাভাবিক প্রভাব অনুযায়ী অন্যান্য ছাত্রেরা যেমন সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিভিন্ন সভা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া নিজেদের ও দশের জ্ঞান বিকাশের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন অথবা ভারতীয়দের বিভিন্ন প্রয়োজন রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সুবিধা আদায়ের সংগ্রামে অংশ গ্রহণে সচেষ্ট থাকেন তেমন ভাবে তিনি স্বীয় কর্মক্ষতাকে প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। এমন কি বহুক্ষেত্রে প্রাক্তন বন্ধুদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করাও সম্ভব হয় নাই দীর্ঘদিন সর্বদা ইংরাজ সাহচর্যে ও পাশ্চাত্যভাবে জীবন যাপনের জন্য এবং মাতৃভাষা ও দেশীয়দের সহিত বিশেষ যোগাযোগ না থাকায় তিনি বাংলা ভাষা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া প্রচারিত হয়। ২৩-৫-১৮৭০ তারিখের হিন্দু পেট্রিয়ট লিখিয়াছে,—"Habit and association made Radhanath forget almost his mother

tonguc." সেজন্য তাঁহার যথেষ্ট নিন্দাও হয়। মনে হয় রাজনারায়ণ বসু ডিরোজিয়ানদের সম্বন্ধে যে মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধার কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন তাহা হয়তো বহুলাংশেই রাধানাথ শিকদার সম্পর্কিত।

কলিকাতায় ফিরিয়াই রাধানাথ বহুদিন উপেক্ষিত আরাধ্য কর্ম সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিলেন এবং সুদে আসলে ঋণ শোধ করিবার জন্য ব্রতী হইলেন। বাংলা ভাষা চর্চা ও বাংলা সাহিত্যের আশু স্বাভাবিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় আধুনিক দৃষ্টির প্রয়োগ করিয়া ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক দেশের মাটির নিকটবর্তী করিবার জন্য কথ্য ভাষার সহজ সরল ব্যবহার বিভিন্নভ্যবে এত আকর্ষনীয় করিলেন যে নারীর পক্ষেও তাহা হইল সহজবোধ্য ও শিক্ষনীয়। বাল্যবন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগে 'মাসিক পত্রিকা' সম্পাদনা আরম্ভ করিলেন। ১লা ভাদ্র ১৮৬১ প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া লিখিত হয়,—"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমারদিগের সচরাচর কথাবর্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞপণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।"[৯৯]

এই পত্রিকার মাধ্যমে রাধানাথ যেন সমগ্র সমাজ সংস্কারের সহয়তা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, স্ত্রীলোকের দুরবস্থা ও অন্যান্য সামাজিক ত্রুটি দূরীকরণে তিনি লেখনি চালিত করিলেন। কিশোরী চাঁদ মিত্রের রোজ নামচা হইতে এ বিষয়ে জানা যায়। ১২-১২-১৮৫৪ তারিখ কিশোরী চাঁদ মিত্রের গৃহে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'সুহৃৎ সমিতির' সভায় রাধানাথ সভ্য হইয়া আলোচনায় যোগদান করেন। এ সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল 'স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন', হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলন, বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ ইত্যাদি। ৯-১২-১৩৫০ তারিখের রোজনামচায় আছে,—"আমি, দাদা, রাধানাথ, রসিক ও তারকনাথ সেন একত্র হইয়া হিন্দু বিধবাগণের পুনর্বার বিবাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার প্রতি আমাদের প্রার্থনাপত্র বিবেচনা ও সংশোধন করিলাম।"[১০০]

হিন্দুকলেজ ছাত্রবস্থার পূর্বে যেমন শিক্ষাপ্রসারের দায়িত্ব আপন স্কন্ধে লইয়া তিনি স্বয়ং শিক্ষকতা করিয়াছেন, তেমনি আবার কলিকাতায় প্রত্যাবৃত হইয়া পরিণত বয়সে সে কর্মে উৎসাহের সহিত যোগ দিলেন। ২৯-৮-১৮৫৫ তারিখের রোজনামচায় আছে, "দাদা ও রাধানাথের সহিত এ অঞ্চলে একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সম্বন্ধে বহুক্ষণ কথাবার্তা হয়। এই বিদ্যালয়টি দরিদ্রদিগের জন্য এবং গরীব ভদ্রশ্রেণীর লোকদের জন্য হওয়া উচিত। সামান্য বাংলা শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে।"[১০১] রাধানাথ শিকদার জেনারেল এসেম্বলি ইনস্টিটিউটশনে কিছুকাল অঙ্কশাস্ত্রে অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন।[১০২]

গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যে মানবতার যথেষ্ট নিদর্শনের সন্ধান পাইয়াই সেদিকে রাধানাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি প্লুটার্ক, জেনোফোন প্রভৃতির রচনা হইতে আকর্ষণীয় বিষয় সংকলন করিয়া প্রবন্ধ ও গল্পাকারে 'মাসিক পত্রিকায়' প্রকাশ করিয়াছেন।[১০৩] সময়ের বাবধানে সংযোগ হীন হইয়া যে ভাষা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন—সে ভাষার যে কৃতিত্ব তিনি দেখাইয়াছেন তাহার নিদর্শন মাসিক পত্রিকা হইতে দেওয়া গেল,

"ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীনে মেয়ে দিলে যেমন বাপমার মুখ উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ স্পার্টা বাসিদের মধ্যে ছেলে লড়াইয়ে মরিলে বাপ মার মুখ উজ্জ্বল হইত। এই নিমিত্তে ছেলে যখন লড়াইতে যাইত' মা আপনি তাহার হাতে ঢাল তরবার দিতেন। দিয়া বলিতেন—বাপু তুমি লড়াইয়ে যাও। দেখ যেন জয়ী হইয়া এ ঢাল তরবার লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আইস। তাহা যদি না পার, তাহা হইলে এই ঢালের উপর চড়িয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আইস।"

সততা ও তেজস্বীতার জন্য রাধানাথ কিংবদন্তীর পর্যায়ে সমাজে প্রতিষ্টিত হইয়াছেন। রাধানাথের একটি সততাপূর্ণ তেজস্বীতার কর্মে এদেশে ভৃত্যদের বেগার' খাটিবার প্রথা বহুলাংশে সীমিত হয়। ১৫-৫-১৮৪৩ তারিখে দেরাদুনের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ ভ্যানসিটার্টের আদেশে রাধানাথের জরিপ বিভাগের ভৃত্যরা ম্যাজিস্ট্রেটের মালপত্র লইয়া যাইবার সময় তিনি বাধা দান করিয়া মালপত্র নিজের ঘরে রাখিয়া ভৃত্যদের বেগার খাটিতে মানা করেন। ম্যাজিস্ট্রেট মালপত্র লইতে আসিলে তিনি বিনা রসিদে মালপত্র দিতে অস্বীকার করিলে শেষ অবধি বহুদিন আদালতে মোকদ্দমার পর রাধনাথের ২০০৲ টাকা জরিমানা হয়। কিন্তু এই বিষয়টি লইয়া সমগ্র দেশে যে ব্যাপক বাদানুবাদ ও আন্দোলন হয় ক্রমে তাহার ফলে বেগার খাটাইবার প্রথা বন্ধ হয়। রাধানাথের দৃঢ়তায়, সাহসে, সততায় ও সংগ্রামী মনোভাবে আদালতে অন্যায় বিদার হইলেও কুপ্রথা বন্ধ হয় সরকারী বিবেচনায়।

ডিরোজিওর ন্যায় রাধানাথও ছিলেন মাতৃভক্ত। তথাপি আদর্শের জন্য তিনি মাতার নির্দেশেও ৮/১০ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করেন এবং আজীবন অকৃতদার হইয়া থাকেন।

ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে রাধানাথ শিকদার একটি বিষয়ে স্বীকয় প্রতিভায় পরিচয় দিয়াছেন এবং সেকালেও ধর্মীয় ও সামাজিক মত বিরোধিতা সত্ত্বেও তাহার কৃতিত্বে সকলেই জাতীয় গৌরব বোধে গর্বিত হইতেন। ভারতীয়রা জানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আবিস্কারক রাধানাথ শিকদার যদিও নামকরণের ক্ষেত্রে উপর ওয়ালাই পাইয়াছেন স্বীকৃতি। সমগ্র জীবন তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের সেবক ও অনুসন্ধিৎসু। স্বীয় প্রচেষ্টায় তিনি অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই নিউটনের প্রিনসিপিয়া পড়েন সর্বপ্রথম-টাইটলার সাহেবের নিকট। এই বিষয়ে তাঁহার

ব্যুৎপত্তি এতই গভীর ছিল যে টাইটলার সাহেব স্বয়ং তাঁহাকে ইংরাজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ সংস্কৃতে অনুবাদের কর্মে নিযুক্ত করেন। এবং ডঃ টাইটলারের সুপারিশে রাধানাথ কর্ণেল জর্জ এভারেস্ট দ্বারা জরিপ বিভাগে নিযুক্ত হন।

জর্জ এভারেস্ট কৃতি বৈজ্ঞানিক গণিত শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি ত্রিকোনমিতিক জরিপ বিভাগ পুনর্গঠন করেন এবং সরর্ভেয়ার জেনারেল হইয়া তাঁহারই আবিষ্কৃত নবতম পন্থার প্রয়োগ করেন। জরিপ পদ্ধতির বহু পরিবর্তন হইলেও মোটামুটিভাবে তাঁহার পন্থাই অনুসরণ করা হয়॥ তাঁহার সাহাচর্যে রাধানাথ উচ্চগণিতে এত ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, স্বয়ং এভারেস্ট সাহেবও আশ্চর্য হন। তাই রাধানাথ শিকদার ১৮৩৭ সালে ডেপুটি কলেকটরের পদপ্রার্থী হইলেও জরিপ বিভাগ হইতে জর্জ এভারেস্ট তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হন নাই। রাধানাথ শিকদারকে জরিপ রাখিবার নিমিত্ত সরকারী চাকুরিতে নিয়ম হয় যে ব্যক্তিদের এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে বদলি ইত্যাদি বিভাগীয় কর্তার অনুমোদন ব্যতীত হইবে না। তাঁহায় প্রতিভার স্বীকৃতি জানাইযা জর্জ এভারেস্ট কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেকটরদেরও লিখিয়াছেন যে, "রাধানাথ শিকদারের ন্যায় অঙ্কশাস্ত্রবিদ এদেশের ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে তো দূরের কথা, বিলাতের খুবই কম আছে। সুতরাং তাঁহাকে ছাড়া যায় না।"[১০৪]

রাধানাথ শিকদার কেবলমাত্র কম্পিউটার গণনাকারী হিসাবে পণ্ডিত নন, একজন জরিপ বিশেষজ্ঞও। জর্জ এভারেস্ট লিখিত 'An Account of two Measurement of Two sections of the Meridional Arc of India, Engraving'—বইটিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেকটরস্—১৮৪৭ সনে তাঁহার কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে এই কথাগুলি লিখিয়া তাঁহাকে উপহার দেন,

"Babu Radhanath—Presented by the Court of Directors of the East India Company in acknowledgement of his acitive participation in the survey."

জরিপ বিভাগ পার্লামেণ্টে— ১৫-৪-১৮৫১ সনে যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতীয় কর্মচারীদের বিশেষজ্ঞ রাথানাথ শিকদার সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসার উল্লেখ ছিল—,

Among them may be mentioned as most conspicious for ability, Babu Radhanath Sikdar, a native of Indian of Brahminical extraction whose mathematical attainments are of the highest order."[১০৫]

রাধানাথ ডেপুটি কালেক্টর না হইলেও প্রতিভার স্বীকৃতি পাইয়াছেন। সার জর্জ এভারেস্ট জরিপের সুবিধার জন্য X' Ray System আবিষ্কার করেন এবং

রাধানাথ ইহার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করিয়া জরিপ বিভাগে এই পদ্ধতি গ্রাহ্য করান।

রাধানাথ শিকদার ১৮৪২ সালে কলিকাতার চিফ কম্পিউটার ছিলেন। ১৫ নং শৃঙ্গের উচ্চতা তিনিই নির্ধারণ করেন এবং প্রকাশ করেন যে ইহাই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (২৯০০২ ফুট) ইংলণ্ডের 'নেচার' পত্রিকার ১০-১১-১৯০৪ তারিখে সংখ্যা এস. জি. বারার্ত Mount Everest ; Thc story of a Long Controverasy" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "About 1852 The Chief Couputers of the office at Calcutta informed Sir Andrew that a peak designated XV had been found to be higher than any other hitherto measured in the word. This peak was discovered by the computers to have been observed from six different station : On no occassion had the observer suspected that he was viewing through the telescop the hightst point of the earth,"[১০৬]

মিঃ জেঃ ও নিকলসন ২৪ ইথিও থিডগোলাইট যন্ত্রের সাহায্যে ছ-টি বিভিন্ন স্থান হইতে পর্যবেক্ষণ করিয়া কিন্তু কখনই সন্দেহ করেন নাই যে ইহাই সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। অতএব সে কৃতিত্ব রাধানাথ শিকদারেরই।

রাধানাথ ১৮৬২ সনের মার্চ মাসের পর কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ সনে দেরাদুন ভ্রমণ উপলক্ষে 'হিলস' পত্রিকা সুন্দরভাবে তাঁহার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়াছে, "তাঁহার জীবন অঙ্কশাস্ত্রের অনুশীলনে উৎসর্গীকৃত। এইখানে বসিয়া ত্রিশ বৎসক পূর্বে তিনি কর্নল এভারেস্টের নিকট লাপ্লেস ও নিউটন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এ বিষয়গুলির অধ্যয়ন তাঁহার মনের গতির সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়, এবং অসামান্য পরিশ্রমের সহিত তিনি এ-সব চর্চা করেন। —— কর্নেল এভারেস্ট রাধানাথ ও মিঃ আরাগ্যের ন্যায় ব্যক্তিরা বিজ্ঞানে উঞ্ছবৃত্তির কখন প্রশ্রয় দিবেন না, যে সব, ছাত্র জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করিবেন, তাহাদের ক্যালকুলাস ও 'ফ্রাকসন্সাস্' ভাল করিয়া শিখিবার ব্যবস্থা দিবেন। — — যে সব গুণ বিশেষ ভাবে থাকিলে লোকে সত্যকার গণিতশাস্ত্রজ্ঞ আখ্যা পাইতে পারেন এমন গুণ বিশিষ্ট লোককে এখন হয় এ-বিভাগে রাখা হয় না, অথবা তেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রাধানাথ বিশেষ কিছু লিখেন নাই।' ম্যানুয়েল অব সার্ভেয়িং পুস্তকের বিজ্ঞানভাগ সম্পূর্ণ তাঁহারই। একথা বলিয়াই হয়তো যথেষ্ট হইবে যে, সকলের মতেই এরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ে এই প্রথম মূল প্রাথমিক গ্রন্থ।"[১০৭]

রাধানাথ শিকদার বাংলা তথা ভারতে বিজ্ঞান মানসতার পথ প্রদর্শক। 'ম্যানুয়েল অব সার্জেয়িং ভারতবর্ষে জরিপ সংক্রান্ত সর্বপ্রথম বই। সংকলয়িতা হিসাবে কাপ্টেন আর স্মিথ ও ডেপুটি সার্ভেয়ার জেনারেল কর্নেল এই এল থুইলিয়ারের নাম আছে। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫১ সনে। সংকলয়িতারা রাধানথের ঋণ

স্বীকার করিয়াছেন-বিজ্ঞান বিভাগ সম্পূর্ণ তাঁহারই। ভূমিকায় আছে:—

"In parts III and V, the compilers have been very largly assisted by Babu Radhanath Sikder ··· The chapters 15 and 17 upto 21, inclusive, and 26 of Part III and the whoie of Part V, are entirely his own, ··· the obllgations they taus feel under to him, not only for the portion of the work ···, but for the advice so generally afforded on all subjects connected with his own department".

রাধানাথ জরিপের গণনার সুবিধার্থে ১৮৫১ সনে 'Auxiliary Table' নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরবর্তী কালে ইহার পরিবর্ধিত সংস্কারণও প্রকাশিত হয়।

তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বীকৃতি ইউরোপের পণ্ডিতেরাও দিয়াছেন। 'সোসাইটি অফ ন্যাচারেল হিসটরি' (ব্যাভেরিয়া-জার্মানি) তাঁহাকে করেসপণ্ডিং মেম্বার করিয়া লন।'[১০৮]

প্যারীচাঁদ মিত্র

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় জন্ম হয় প্যারীচাঁদ মিত্রের। পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র। সেকালের রীতি অনুযায়ী প্রথমে হিন্দু ব্রাহ্মণ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পাঠ গ্রহণ করিয়া পরে কিছুদিন ফারসী শিক্ষা করিয়া ১৮২৯ সালে হিন্দুকলেজে শিক্ষারম্ভ করেন। তিনি ১৮৩৫ সাল অবধি হিন্দুকলেজে কৃতীত্বের সহিত বৃত্তি ও পুরস্কৃত হইয়া পাঠ সমাপ্ত করেন। পারীচাঁদ ও তাঁহার অনুজ কিশোরী চাঁদ হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান দুই ছাত্র।

ডিরোজিও প্রভাবে যে জ্ঞানসন্ধিৎসা তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় জাগিয়াছিল তাহা সমস্ত জীবন গবেষণা কর্মের মাধ্যমে আপন জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বারা জনসাধারণের উন্নয়নেব প্রচেষ্টায় প্রয়োগ করিয়াছেন। ছাত্রাবস্থাতেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি গৃহে অবৈজ্ঞনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পল্লীর বালকদের শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হন।

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে পাঠ সাঙ্গ হইলে সেই বৎসর প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ডেপুটি সহকারী লাইব্রেরীয়ানের (গ্রন্থাগারিকের) পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে তিনি গ্রন্থাগারিক, সম্পাদক ও কিউরেটারের পদে উন্নীত হন। ডিরোজিও প্রভাবিত ভাবধারা তাঁহাকে সরকারী উচ্চপদের আবর্ত উপেক্ষা করিয়া সমগ্র জীবন জ্ঞানচর্চার সহায়ক এই কর্মে লিপ্ত রাখে। ব্যবসায় কর্মে লিপ্ত হইয়া ইয়ংবেঙ্গল নেতা বন্ধু তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সহিত নানাবিধ আমদানী রপ্তানী কর্ম করেন। বহু ইংরাজ কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর হইলেও তাঁহার সুনাম ও সত্যপরায়ণতার স্বীকৃতির সহিত সমপরিমাণ বিত্তার্জন হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানার্জনের আকর্ষণই ছিল তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল। স্বদেশ-সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ইয়ংবেঙ্গলদের সহায়তায় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' ক্রমে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন' বা

'ভারতবর্ষীয় সভায়' সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থার সূচনা করে। একাডেমিক এসোসিয়েশন এর মাধ্যমে যে স্বদেশ সেবার, সমাজ সংস্কার প্রভৃতির প্রেরণা তাঁহার মধ্যে উজ্জীবিত হইয়াছিল তাহা সমগ্রজীবন তাঁহাকে নানা সভা সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষভাবে এইসকল কর্মে লিপ্ত করিয়াছে ইয়ংবেঙ্গলদের সহিত। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্যরূপে দীর্ঘকাল তিনি পরিশ্রম করিয়াছেন।' 'সোস্যাল সাইন্‌স এসোসিয়েশন', 'এগ্রিহর্টিকালচারল সোসাইটি' 'ডিস্ট্রিকট চেরিটেবল সোসাইটি', 'স্কুল বুক সোসাইটি', 'পশুক্লেশ নিবারণী সভা' প্রভৃতির উদ্দেশ্যসিদ্ধির সকল প্রকার প্রচেষ্টায় তিনি আন্তরিকভাবে নিরত ছিলেন। কলিকাতা রিভিউ বা এগ্রিকালচারাল সোসাইটির মুখপত্রের প্রবন্ধগুলি তাঁহার স্বদেশ কল্যাণ ব্রতের মানস প্রবণতার পরিচায়ক। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে 'জ্ঞানান্বেষণ' 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' এবং 'মাসিক পত্রিকা' প্যারীচাঁদ মিত্রর সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মাসিক পত্রিকার আদর্শ ছিল—"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" ইহা ছাড়া তিনি বেঙ্গল হরকরা', 'ইংলিসম্যান', 'ক্যালকাটা রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন।

প্যারীচাঁদ ১৮৬৮ সালে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে মনোনীত হন এবং দুইবৎসর স্বদেশের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেন। ইয়ংবেঙ্গলদের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব তাঁহার প্রচেষ্টাতেও প্রসার লাভ করে।

পত্নীবিয়োগের পর ১৮৬০ পরলোক রহস্য সম্বন্ধে তিনি আগ্রহশীল হন। ১৮৮১ সালে মাদাম ব্লাভাটস্কি ও কর্ণেল অলকট যখন ভারতে থিওসফিকেল সোসাইটির কার্য আরম্ভ করেন তখন তিনি সেই সমিতিতে যোগদান করেন এবং বঙ্গীয় শাখার প্রধান উদ্যোক্তা হন। সেকালের নবশিক্ষিতদের ধর্মচিন্তা ও দেশাচার সম্বন্ধে "On the Soul: Its Nature and Developemeut" গ্রন্থের ভূমিকায়, "ছেলেবেলায় আমি মূর্তিপূজকরূপেই গড়িয়া উঠিয়াছিলাম। হিন্দুকলেজে শিক্ষা লাভ করি। একদল মনোমত বন্ধু পাইয়া আমি তাঁহাদের সহিত প্রায়ই দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি ও অন্যান্য নানা বিষয়ের আলোচনা করিতাম। ভগবান এবং ভগবৎ বিধান সম্বন্ধে আমার আগ্রহ ছিল. সেইজন্য আর্য ও খ্রীস্টধর্মের নানা শাস্ত্র-গ্রন্থ এবং সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থাদি পড়িয়াছি। এ সমস্ত পঠন পাঠনের ফলে আমার হৃদয়ে এ বিশ্বাস হইয়াছে যে এক অনন্ত পূর্ণতাময় ভগবানই বর্তমান। আমি তখন একেশ্বরবাদী বা ব্রাহ্ম হইলাম।"[১০৯]

ডিরোজিয়ানদের সাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রেরণা ছিল স্বদেশ ও সমাজের কল্যাণ চিন্তা। "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থের রচনায় প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সেকালের

শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার ও জীবনযাত্রার একটি ছবি ফুটাইয়া তোলা। ইহা ছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিদেশীয়দের বাংলা শিখাইবার প্রচেষ্টা ছিল ইহার অপর প্রেরণা। এই রীতির প্রথম বাংলা পুস্তক রচনা বলিয়া তাঁহার সংকোচও ছিল। এইসকল কারণেই অসংখ্য প্রবাদ প্রবচনের দ্বারা ভাষাকে সমৃদ্ধ করা হইয়াছে মনে হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "অক্ষয়বাবু যখন সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া 'জিগীষা' 'জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ন করিলেন, তখন আমরা যে কোনও শিক্ষিত লোকের বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম 'জিগীষা' জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দের সহিত 'টিটটামিষা' শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে।"১১০ 'কিন্তু আলালের ঘরের ভাষায় এবার জনসাধারণের চোখ খুলিয়া গেল। সকল জাতীয় সাহিত্যিকের উপর ইহার প্রভাব স্পষ্ট হইল। নূতন সাহিত্যিকদের ভাষা আর সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত বহাল রহিল না। ভাষা সংস্কারের পথ হইল উন্মুক্ত এবং ক্রমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নবনব সংস্কারের মধ্য দিয়া শতাব্দীর শেষে ক্রমপরিণতি পাইল। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের স্থানীয় কথ্য ভাষার প্রয়োগের মধ্য দিয়া ভাষার লঘুগামীতা ও সাবলীলতা আনয়নের পথ উন্মুক্ত করিয়া বাংলা ভাষার দীর্ঘদিনের অচলায়তনকে ভাঙিয়া দিয়াছেন।

১৮৫৯ সালে টেকচাঁদ ঠাকুরের অর্থাৎ প্যারীচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' প্রকাশিত হইল। ইহা একান্তই উদ্দেশ্য প্রণোদিত গ্রন্থ। কলিকাতার চিত্র হিসাবে মূল্য আছে। ইহার ভবানীবাবুর চরিত্র লক্ষণীয়,

"ভবানীপুরের ভবানীবাবু কলেজে পড়াশুনা করেন। লেখাপড়া শিখিলে সকলেরই একটু হিতাহিত বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু নীতি বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান জন্মাইতে হইলে বিশেষ উপদেশের আবশ্যক হয়, সেরূপ উপদেশ কলেজে হয় না।" ১১১

নীতি জ্ঞান কলেজে বিশেষ নাই। রিচার্ডসন সাহেব স্বয়ং ব্যক্তিগত জীবনে নীতি সম্বন্ধে বেহিসাবী ছিলেন বলিয়া, বেথুন সাহেব কর্তৃক অধ্যক্ষপদ হইতে বিতাড়িত হন। আবার সেই রিচার্ডসন সাহেব নীতিজ্ঞান বিস্তার সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশের ক্লাশ গ্রহণ করেন। কাজেই সমাজে শুধু ভবানীবাবুই নয় সর্বত্রই নীতিজ্ঞান হীনতা। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, আত্মচরিতেও সামাজিক অনাচার সর্বব্যাপী বলিয়াছেন। প্যারীচাঁদের এই বর্ণনার মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজের মঙ্গলার্থে সাবধান বাণীর প্রয়োগ।

তিনি নারীর অন্তরের শুদ্ধি ও স্বাধীন অভিরুচি উভয়ের মর্যাদা দিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ নারীর সন্ধান পাওয়া যায় 'রামারঞ্জিকার' 'দ্রবময়ী', 'অভেদীর অভেদী' এবং 'আধ্যাত্মিকতার আধ্যাত্মিকা' চরিত্র তিনটিতে।

'বামাতোষিনী'তে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নব্যশিক্ষিতদের নব-প্রচেস্টার বিবরণ আছে। ৭ম পরিচ্ছেদের নাম 'সাধারণ জ্ঞান উপার্জিকা সভা'। এই সভার ছবি অঙ্কিত করিতে গিয়া প্যারীচাঁদ তাঁহার বন্ধুদের (রামতনু—

সভাপতি, রসিককৃষ্ণ ঘোষ বক্তা, শিবচন্দ্র, কৃষ্ণমোহন প্রভৃতিও যোগদানকারী) সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত বাহুল্য কমাইয়া তদ্ভব শব্দের প্রয়োগের দ্বারা বাংলা কথ্য ভাষার প্রাধান্য সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করিয়া ভাষার প্রগতির পথ উন্মুক্ত করিবার সহিত চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগের পথও তিনি দেখাইলেন। তাঁহার ভাষা সম্পূর্ণরূপে কথ্য শালীন না হইলেও, মূল ভাষার কাঠামোটি কিন্তু বহুলাংশেই সাধু ভাষার ধাঁচে অগ্রসর হইয়াছে। বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধুভাষার প্রয়োগ স্পষ্ট। ইহাই সে যুগের আদর্শ সাধু ভাষা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শিক্ষিত সমাজে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান প্রচারের আগ্রহ ও প্রচেষ্টা প্যারীচাঁদের সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আলালের ঘরের দুলালের রামলাল ও বরদাবাবু ;—'বামাতোষিনী'র 'গোপাল ও শান্তিপ্রদায়িনী', আধ্যাত্মিকতার 'হরদেব তর্কালঙ্কার' ও আধ্যাত্মিকা প্রভৃতি চরিত্রগুলি প্রাচীন ও নবীন যুগের সদগুণের সমন্বয়ে গঠিত। ঠকচাচার ন্যায় জীবন্ত না হইলেও লেখকের মনুষ্যত্ব সন্ধানী দৃষ্টির পরিচায়ক। ডিরোজিয়ান রূপে এই সকল চরিত্রের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মহৎ ও গ্রহনীয় গুণাবলীর সমাবেশ দেখা যায়। বরদাবাবু বা গোপালবাবু আত্মস্থ হইয়াই সন্তুষ্ট হন নাই বরং সমাজে কল্যাণের আদর্শ সঞ্চারিত করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। এই কল্যাণ প্রচেষ্টা ডিরোজিও এবং ডেভিড হেয়ার প্রভাবিত পাশ্চাত্য কর্মবীরের আদর্শ প্রভাবিত এবং রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মোপলব্ধির আদর্শ-প্যারিচাঁদের সৃষ্ট নারী পুরুষ চরিত্রে স্পষ্ট।

প্যারীচাঁদের যুগ জাতীয় চরিত্রের ভিত্তিগঠনের প্রয়াসী। তাই যুগোপযোগী তাঁহার সাহিত্যও শুধুমাত্র সৌন্দর্য প্রয়াসী নয়। সুতরাং শুধু শিল্প সৃষ্টিই অপেক্ষা মানবজীবনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও সংশিক্ষা প্রচারেব প্রতি এবং নব্যআদর্শ প্রকৃত মানবসৃষ্টির জন্য অধিক চিন্তিত ও প্রয়াসী তাঁহার সাহিত্য। বিশুদ্ধ নৈতিক জীবনের প্রেরণা এ-সাহিত্যে স্পষ্ট, রস সৌন্দর্যতাই ব্যাহত। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে তাঁহার দান অনস্বীকার্য। সংস্কৃত সর্বস্বতা কাটাইয়া বাংলা সাহিত্যকে মুক্ত আকাশের নিম্নে লইয়া আসায় সুযোগ করিয়া দিয়াছেন প্যারীচাঁদ।

'আধ্যাত্মিকা' 'অভেদী' প্রভৃতি চরিত্রবাধ্যমে নারী জাতির যে আদর্শরূপের সন্ধান মাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র দিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরানী তাহারই পূর্ণাঙ্গ রূপ। তাহার নকসা জাতীয় চরিত্রগুলিই পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের যুগান্তকারী সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রের অঙ্কুর। ডিরোজিয়ান প্যারীচাঁদ মিত্রের সাংস্কৃতিক আদর্শবাদী মন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব ও কর্মের সংযোগ স্থাপন করে বাংলা সাহিত্যে এই নক্সা জাতীয় চরিত্র সৃজনের মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার সূচনার প্রাথমি কনক্সা রূপটাই বিংশ শতাব্দীতে পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে বহুমুখী পূর্ণাঙ্গ বঙ্গসাহিত্যে।

হরচন্দ্র ঘোষ

উনবিংশ শতাব্দীর একচক্ষু বিচার প্রাবল্যে ডিরোজিয়ান বলিতে উগ্রতা উদ্দামতার প্রতীক বুঝা যাইত। যেন তাঁহারা কেবলমাত্র ভাঙনের নেশায় মাতিয়া উঠিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া হিন্দুসমাজের সবকিছু ভাঙিতেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্যের অপলাপ। কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রসিকৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ইয়ংবেঙ্গলরাও সম্পূর্ণ ভাঙনের জয়গান করেন নাই, সাংগঠনিকের কর্মও তাঁহারা করিয়াছেন। কিন্তু ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই আবার সম্পূর্ণভাবে ছিলেন স্থিতবী এবং তাঁহারা ইয়ংবেঙ্গলদের সাংগঠনিক দিকটি আজীবন অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন সার্থক ভাবে। ডিরোজিওর শিক্ষার অনেক গুণ তাঁহারা পাইয়াছিলেন এবং ধীরচিন্তা ও স্থিতিশীলতা ছিল তাঁহাদের মধ্যে। হরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ধর্মীয় যুদ্ধে তিনি উৎসাহ বোধ করেন নাই।

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "অনুমান ১৮০৮ সালে ইহায় জন্ম হয়। ইনিও ডিরোজিও বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল।"

গতানুগতিক ফারসী শিক্ষায় বালক হরচন্দ্র সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া প্রায় স্বীয় ব্যগ্রতা ও চেষ্টায় হিন্দুকলেজে ভর্তি হইয়াছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনিও ডিরোজিওর প্রতিভার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্য মণ্ডলীভুক্ত হন এবং একাডেমিক এসোসিয়েশন স্থাপনার একজন প্রধান উদ্যোক্তা রূপে ডিরোজিয়ান মধ্যে বিখ্যাত হন। তিনি একাডেমিক এসোসিয়েশনের সভায় বক্তৃতাদি করিতেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় পাইয়া বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৩২ সালে এদেশীয়দের মুন্সেফী পদে নিযুক্তির ব্যবস্থা হইলে গবর্ণর জেনারেল হরচন্দ্র ঘোষকে বাঁকুড়ায় মুন্সেফ নিযুক্ত করেন।

হরচন্দ্রের চরিত্র গঠিত হইয়াছিল হিন্দুকলেজীয় নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা। সেকালের দেশীয় কর্মচারীদের নানা দোষের দ্বারা সরকারী অফিসের পরিবেশ ছিল একান্তই অরাজক। তাই তাঁহার ডিরোজিয়ান সুলভ সত্যপ্রিয়, কর্তব্যপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, উন্নতচেতনা, নির্ভীক চরিত্রের পদার্পণেই আদালতের পরিবেশে ও কার্যপ্রণালীতে হঠাৎ আমূল পরিবর্তব আসিল। নিয়মমাফিক কাছারি ১০টা হইতে ৫টা অবধি কড়াকড়িভাবে চলিতে লাগিল। হরচন্দ্র স্বহস্তে সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব সমক্ষে আপনার রায় লিখিতে লাগিলেন এবং রায় দানও হইতে লাগিল সর্ব সমক্ষেই। এই ব্যবস্থায় স্বভাবই সর্বশ্রেণীর মানুষের মনে তাঁহার মাধ্যমে দেশীয়দের বিচার কার্যের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিল।

উৎকোচ গ্রহণ যে যুগ প্রথায় দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, তখন হরচন্দ্র ঘোষ উৎকোচ গ্রহণকে পাপ বলিয়া মনে করিতেন এবং এই প্রথা বন্ধ করিবার জন্যও সচেষ্ট হইলেন।

শিক্ষা প্রসার দেশীয় সমাজ পরিবর্তনের মূল উপায় বলিয়া ডিরোজিয়ানদের বিশ্বাস ছিল। হরচন্দ্র সরকারী কার্য করিয়াও নিজ ব্যয়ে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষাদিবার প্রয়াস করেন। স্বয়ং জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টায়ও সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। সর্বত্রই তিনি সহযোগিতা করিয়াছেন দেশের সর্ববিধ উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টায়। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনার কার্যে অপরাপর ইয়ংবেঙ্গলদের ন্যায় তিনিও বিশেষরূপেও সহায়তা করিয়াছিলেন।

আধুনিক জীবনে মানুষের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে কর্মের মাধ্যমে। ডিরোজিয়ানরা সকলেই যুক্তছিলেন এই জনসেবায় কর্মপ্রচেষ্টার যোগসূত্রে। মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগে হইলে তিনি সেই কমিটির সম্পাদক হইয়া সেই কর্ম সমাধা করেন। স্বয়ং যেমন জ্ঞানানুযায়ী ছিলেন তেমনি আবার প্রতিভা ও জ্ঞানানুরাগের সন্ধান কোন ব্যক্তির মধ্যে পাইলে তাহার সর্বপ্রকার সহায়তায় তিনি অগ্রসর হইলেন। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালকে তিনি অশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ডেভিড হেয়ারের পন্থায় তিমি দরিদ্র ছাত্রদের অর্থ দ্বারা বা অন্যভাবেও সাহায্য করিতেন—এমনকি তাহাদের লালন পালন ও করিতেন।

১৮৫৪ সালে তিনি কলিকাতা ছোট আলাদতের জজ হইয়াছিলেন। এইপদে তিনি সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, সাহস ও উন্নত চরিত্রের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিতে একমর্মর মূর্তি কলিকাতা ছোট আদালতের দ্বার স্থাপিত হয়।

ডিরোজিয়ানদের সকল গুণান্বিত হইয়াও তিনি নীরবে দেশের সেবার নিরত ছিলেন আজীবন। তিনি ডিরোজিয়ানদের ব্যতিক্রম নন; তাহাদেরই একজন প্রতিভু।

শিবচন্দ্র দেব

মানুষ অমর স্বীয় কীর্তির মধ্য দিয়াই। ডিরোজিয়ান শিবচন্দ্র দেব ঊনবিংশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়াও স্মরণীয় তাহার কীর্তির অগণিত সাক্ষরের মধ্য দিয়া। ইংরাজী স্কুল, বাংলা বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন প্রভৃতি নানা জনহিত প্রচেষ্টার সার্থক অবদান চিহ্নসমন্বিত কোন্নগর তাঁহাকে ভুলিতে দেয় নাই। কোন্নগরকে আধুনিকতার রূপসজ্জায় তিনিই সজ্জিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনচরিত হইতে জানা যায় যে ২০-৭-১৮১১ সালে কোন্নগরে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা ব্রজকিশোর দেব কমিসরিয়েটে সরকারের কাজ করিতেন। ব্রজকিশোর দেব সর্বদা একটি ঘড়ি রাখিতেন এবং তদনুসারে গৃহের শৃঙ্খলা, কার্যের সুনিয়ম ও সুবন্দোবস্ত ঘড়ির কাঁটার মতই সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দে পরিচালিত করিয়া সেকালের সমাজে প্রবাদ—বাক্যাশ্রিত চরিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

শিবচন্দ্র দেব ব্রজকিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র। হিন্দু কলেজে কৃতিত্বের সহিত পাঠ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে ১৬্ টাকা বৃত্তি অর্জন করেন। ডিরোজিওর শিষ্যদলভুক্ত হইয়া তিনি আজীবন ইয়ংবেঙ্গলদের সর্বকর্মে সহায়তা করিয়াছেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি হরিমোহন সেনের সহযোগিতায় আরবা উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করিয়া ছাপাইয়া দেন। সাহিত্য-কর্ম শেষজীবন অবধি তাঁহাকে আকর্ষণ করিযাছে। শিক্ষিতা নারীর ব্যবহারার্থ শিশুপালন নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন ১৮৬২ সালে। ১৮৬৭ সালে 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান' নামে প্রেততত্ত্ব বিষয়েও একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে প্যারীচাঁদ মিত্রের ন্যায় তিনিও প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে উৎসুক হইয়াছিলেন।

তিনি হিন্দুকলেজ ছাড়িয়া কয়েক বৎসর জি. টি সার্ভে অফিসে ৩০্ টাকা বেতনে কম্পিউটারের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৩৮ সালে তিনি ডেপুটি কালেকটরের পদে উন্নীত হন। সরকারী কর্ম হইতে ১৮৬৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁহার মধ্যে স্বাধীন চিন্তার ও নির্ভীক অভিব্যক্তির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কোন ক্ষেত্রেই তিনি স্বাধীনতার ভাবধারাকে গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেন না। শিবচন্দ্র ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের কালে উড়িষ্যা হইতে কলিকাতা আসিবার পথে গাড়িতে কয়েকজন ইউরোপীয় সহযাত্রী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ আলোচনার সময় এই বিদ্রোহ সম্পর্কে স্বীয় স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করেন। ফলে কপট ইংরাজী ভদ্রতার মুখোশ খসিয়া গিয়া জনবুলরা বাহির হইয়া আসিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। ইংরাজ সরকারও এইজন্য তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান। অবশ্য ইহার পরও তাহার কর্ম-জীবন সমাপ্ত হয় নাই। তথাপি প্রত্যক্ষ ডিরোজিয়ান আন্দোলনে সরব বিদ্রোহী না হইয়াও তাঁহাকে জনবুল অত্যাচারের সম্মুখীন হইতে হয়।

হরচন্দ্র ঘোষের ন্যায় শিবচন্দ্র দেবও আজীবন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। সরকারী কর্মে কলিকাতায় বদলি হইয়া আসিয়াই তিনি স্বগ্রামের উন্নয়নে সচেষ্ট হন। এই কর্মের পূর্বেই ১৮৫২ সালে গ্রামবাসীদের সম্মিলিত করিয়া কোন্নগর হিতৈষিণী সভা স্থাপন করেন। কোন্নগর ছিল ডিরোজিয়ানদের আদর্শপল্লী।

শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ইংরাজ সরকারের অসহযোগিতা রাজনৈতিক কারণে ছিল অপরিহার্য ব্যবস্থা। শিবচন্দ্র তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াও হতাশ না হইয়া অধিক উদ্যম সহকারে একাকী কর্মে অগ্রসর হইয়াছেন এবং কৃতকার্য হইয়া স্বদেশীয়দের দেখাইয়া দিয়াছেন যে ইংরাজ সাহায্য ব্যতীত কেবল স্বদেশীয় প্রচেষ্টায় দেশের উন্নতি সম্ভব। ইংরাজ সরকার ইহাতে, পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত গবর্ণ-মেণ্ট বাংলা বিদ্যালয় ১৮৫৬ সালে তুলিয়া লন। কিন্তু বাংলা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন গ্রামে অত্যাবশ্যক—তাই সরকারী সহযোগিতা ছাড়াই আবার একটি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল ১৮৫৮ সালে।

দুইটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর গ্রামবাসীদের ব্যবহারার্থ সাধারণ পুস্তকালয়ের অভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। তদনুসারে ১৮৫৮ সালেই এক৩ সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইল।

তিনি স্বয়ং নিজগৃহেই পর্দা দূর করিয়া স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১৮২৬ সালে বিবাহ করিয়াই তিনি স্বীয় বালিকা পত্নীকে বাংলা পড়িতে ও লিখিতে শিখাইতে আরম্ভ করেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত কিন্তু তাহার মানসিক ঔদার্য ও প্রগতিবাদীতা মন্দীভূত হয় নাই। তাই বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি বহু বাধা নিষেধ তুচ্ছ করিয়া এক কন্যাকে সেই বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেন। তাহার প্রচেষ্টা স্বীয় পরিবারের মধ্যেই সীমিত থাকে নাই। তিনি স্বয়ং উৎসাহী হইয়া সরকারের নিকট প্রস্তাব করেন যে সরকার বালিকা বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য যদি ৫০০৲ টাকা দেন, তাহা হইলে তিনি নিজে আরও ৫০০৲ টাকা দিতে পারেন। সেই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট যদি মাসিক ৪৫৲ টাকা দিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে তিনি গ্রাম হইতে ১৫৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া দিতে পারেন। সরকার কিন্তু সেই সকল প্রস্তাবে সহযোগিতা করেন নাই। অবশেষে ১৮৬০ সালে তিনি স্বীয় অর্থে নিজ ভবনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কিছুকাল পরে তিনি তাহার নিজস্ব ভূমিখণ্ডে (বিদ্যালয়ের নিমিত্ত দান করিয়া) স্বীয় অর্থে বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ করিয়া দেন।

কোন্নগরে রেল স্টেশন খুলিবার প্রচেষ্টায় তিনি সার্থক হন ১৮৫৬ সালেই এবং আবার তাঁহারই আবেদনে কোন্নগরে ১৮৫৮ সালে একটি ডাকঘরও স্থাপিত হয়।

এই সময় গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুবই বাড়িয়া যাওয়ায় তিনি সচেষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট দ্বারা একটি দাতব্য ঔষধালয় খুলিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি এই নিমিত্ত একটি বাড়ী বিনা ভাড়াতে দিয়াছিলেন। ১৮৮১ সালে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছু কমিয়া গেলে সরকার ঔষধালয়টি তুলিয়া দেন। তাই শিবচন্দ্র দেব নিজ ব্যয়ে ১৮৮৩ সালে একটি হোমিওপ্যাথ ঔষধালয় স্থাপন করেন এবং আজীবন এই কর্মের দায়িত্ব বহন করেন।

তাঁহার প্রাচীন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়াছিল ছাত্রাবস্থায়। ক্রমে পরিণত বয়সে তিনি একেশ্বরবাদী হন। শেষ অবধি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন নেতা হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের ও হিন্দু সমাজের সংস্কারের প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত ছিলেন। এই নব সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নব বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে পুত্রের বিবাহ দিয়া তিনি আত্মীয়-স্বজন ও স্বগ্রামবাসী বন্ধুদের দ্বারা প্রায় পরিত্যক্ত হন। ডিরোজিয়ানদের প্রায় সকলেই এইরূপ অত্যাচারের শিকার হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে মানুষের অজ্ঞানতাজাত কুসংস্কারই প্রধানত ক্রিয়াশীল তাহা বুঝিতে পারিয়াই ডিরোজিয়ানরা হতাশও হন নাই, আবার সমাজ-সংস্কার কর্মে

৭

প্রতিশোধবাদী হইয়া উঠেন নাই অথবা সংস্কার কর্ম হইতে দূরেও সরিয়া যান নাই। শিবচন্দ্র দেবও ইহাতে দুঃখিত না হইয়া সর্বদাই গ্রামবাসীদের হিতার্থের প্রচেষ্টা করিয়াছেন। জীবনের শেষাংশ তিনি কলিকাতা নগরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুকলেজের ডিরোজিওর প্রভাবে বাঙালী মানসে চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন নিশ্চয় সূচিত হয় নাই। কিন্তু ডিরোজিওর উপদেশে ছাত্রদের মধ্যে সর্বত্র স্বাধীন যুক্তিবাদী চিন্তন, মনন, সর্বদেশীয় শাস্ত্র পঠন ও স্বকীয়তা বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা ডিরোজিয়ানগোষ্ঠী ব্যতীত অন্যান্য মতবাদীদেরও বিকাশ সম্ভব করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতিরাও সমাজে চরিত্রবান, প্রতিভাশালী স্বদেশপ্রেমিক, শিক্ষাপ্রসারক, ভাষা সংস্কারক, সমাজ-ধর্ম সংস্কারক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় অর্থনৈতিক, ক্ষমতা বৃদ্ধির পুরোধাদের মধ্যে আজও স্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহাদের উপর ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রচারক ডিরোজিও এবং রামমোহন রায়ের প্রভাব পড়িয়াছিল সর্বাধিক। দেবেন্দ্রনাথ উভয়ের সাহচয পাইয়া কেবল ব্যক্তিগত জীবনেই যে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রক্ষা করিয়াছেন এমন নয়, জনজীবনে ও পারিবারিক ক্ষেত্রেও অপরের ধর্ম ও অন্য বিষয়ে তাহা কখনই ক্ষুন্ন করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ চারিত্রপূজাতে লিখিয়াছেন, "তিনি আমাদিগকে যেকী পরিমাণ স্বাধীনতা দিয়াছেন তাহা আমরা ছাড়া আর কে জানিবে? যে ধর্মকে তিনি ব্যাকুল সন্ধানের দ্বারা পাইয়াছেন, যে ধর্মকে তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছেন, সেই ধর্মকে তিনি আপনার গৃহের মধ্যে শাসনের বস্তু করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল, তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই কিন্তু কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের কর্মকে বদ্ধ করেন নাই।"[১১২]

তাই ঠাকুর পরিবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছত্রচ্ছায়াতে স্বল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের আদর্শ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহার প্রভাব ভারতের গণ্ডি অতিক্রান্ত হইয়া বহির্বিশ্বেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের জন্যই মুখ্যত প্রকাশিত হইলেও শেষ অবধি আদর্শ সাংস্কৃতিক পত্রিকাতে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন মতবাদী নানা মনীষীদের সমাবেশ হয় এই পত্রিকাকে মধ্যমণি করিয়া। সেদিক হইতে দেবেন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের সর্ববিধ উন্নতি সাধনের পথ প্রদর্শনের নায়ক।

ধর্ম তাঁহার জীবনের প্রাণবায়ু। তথাপি তিনি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রাধান্য স্থাপনের উগ্র প্রচেষ্টা করেন নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তো তাঁহার সকল কাজ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া নির্বাহ করিয়াছেন।

কই, তিনি তো তাহা অপরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই, অন্যে সেভাবে না লইলে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই।"[১১৩]

ব্রাহ্মসমাজ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া যাওয়াতে ব্রাহ্মধর্ম স্রষ্টা দেবেন্দ্রনাথের দুঃখ অনুমান করা অব্রাহ্মদের পক্ষেও সম্ভব। কিন্তু অপরের স্বাধীন চিন্তার মর্যাদা দানের শিক্ষা হিন্দুকলেজ পরিবেশে বিকাশলাভ করিয়া দেবেন্দ্রনাথের মানসিক গঠনকে করিয়াছিল কবিজনোচিত উদার। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে তাহার অপূর্ব ব্যঞ্জনা পাইয়াছে, "তিনি তখন চুঁচুড়া সহরে গঙ্গাতীরস্থ এক ভবনে একাকী বাস করিতেছিলেন। তিনি 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' নামটা শুনিয়া বলিলেন, 'বেশ হয়েছে। আমাদের সমাজের নাম 'আদি' সমাজ, আমরা কালে আছি। কেশববাবুর সমাজের নাম 'ভারতবর্ষীয় সমাজ', তাঁরা দেশে আছেন। তোমরা দেশকালের অতীত হইয়া যাও।[১১৪] মননে ও প্রকাশে, আদর্শে ও আচরণে প্রকৃত শিক্ষিত চরিত্রবানই সম্পদে বিপদে আপন ও পরে সমতা রক্ষা করিতে পারেন। ঋষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের প্রকাশ হইয়াছে কবি দেবেন্দ্রনাথের উপরের উদ্ধৃতি হইতে।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয় ১৫-৫-১৮১৭ তারিখে। দ্বারকানাথ অসমবয়সী বন্ধু রামমোহন রায়ের অনুরোধে পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে ৬ বছর বয়সে ১৮২৩ সালে তাঁহার (রামমোহন রায়ের) পরিচালিত বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। পরে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজে দ্বিতীয় শ্রেণী অবধি পড়িয়াছিলেন এবং ১৮৩৪ সালে দ্বারকানাথ তাঁহাকে স্কুল ছাড়াইয়া তাঁহারই স্থাপিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহকারী কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পুত্রকে হাতে কলমে কাজ শিখাইয়া তবেই ডিরেক্টর করিয়া দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "আমার পিতামহের অধিকাংশ অর্থ যে ব্যাঙ্কে খাটত সেইখানে তাঁরই নির্দেশক্রমে সামান্য পারিশ্রমিকে আমার পিতাকে কাজ করতে হত। যাতে তিনি বিষয়কর্মে নিপুণ হয়ে ওঠেন তার জন্য পিতামহ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতেন।"[১১৫]

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের উপর রামমোহনের প্রভাব অতি গভীর ছিল। পরিণত বয়সে ধর্ম বিষয়ে রামমোহনের দুটি বিশেষত্ব তাহার দিশারী হইয়াছিল, ।১। ধর্মে বহু-দেবতার স্থানকে তিনি মানিতে পারেন নাই। ।২। সাকার উপাসনা অর্থাৎ পৌত্তলিকতা তাঁহার রুচিতে ভাল লাগে নাই। আবার হিন্দু কলেজে ডিরোজিও সর্বপ্রকার ধর্মমত ও ধর্মাশ্রিত আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ছাত্রদের স্বাধীনভাবে আলোচনায় উৎসাহ দিতেন এবং সহায়তা করিতেন। সুতরাং হিন্দুকলেজেও ধর্ম সম্বন্ধে সচেতনতা ক্রমে ছাত্রদের উৎসাহ বৃদ্ধি করে এবং পরিণতিতে দেবেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ধর্মচিন্তাও সর্বব্যাপীতার রূপ লইয়া বৈষয়িক, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু হিন্দুকলেজের অন্যান্য ছাত্রদের ন্যায় তাঁহার মধ্যেও স্বাধীন চিন্তনের, কর্মের মধ্যদিয়া আদর্শের প্রকাশন, পূর্ব নির্ধারিত কোন তত্ত্বকেই অমোঘ বলিয়া না মানিয়া অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের দ্বারা

সত্য নির্ধারণ করা, মানবিকতার পূজক ও চরিত্রবান হইয়া স্বদেশ সেবার প্রচেষ্টা করা এবং পরমত সহিষ্ণুতা অধিক ছিল। অবশ্য ডিরোজিয়ানদের ন্যায় দ্রুতগতি পরিবর্তনকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই—তাই স্বতন্ত্র ব্রাহ্মধর্মের স্রষ্টা হইয়াও তাহার নিজস্ব পন্থায় বৃহৎ হিন্দুগোষ্ঠীর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছেন।

আদর্শ মানুষ হওয়াই ছিল হিন্দুকলেজের ছাত্রদের প্রধান উদ্দেশ্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে তাহারই পরিণত রূপ দেখা যায়। এই পরিণতি বিস্ময়কর কারণ, ইহার একটা ক্রমবিকাশের ধারা বর্তমান। জ্ঞানাহরণের সাধনার কর্মের, ত্যাগের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে রাজসিক ভোগবিলাসিতা হইতে তিনি সাত্ত্বিকতায় উন্নীত হইয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর হঠাৎ তিনি রাতারাতি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া বাংলাদেশের মানুষের চোখ ঝলসাইয়া দেন নাই। বরং সংসারের মধ্যে থাকিয়া পারিবারিক অভিজাত্যও রক্ষা করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ সাত্ত্বিকগুণসম্পন্ন হইয়া 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিয়া দুটাকেই গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রামকৃষ্ণদেব হইতে প্রয়াসী হন নাই। সংসারের আভিজাত্য, পারিবারিক মর্যাদা-বোধ ইত্যাদি যেমন সাংসারিকের ন্যায় আছে, তেমনি আছে সৌখিনতাও। পূর্বে বাবু সংস্কৃতির ধ্বজাধারীর ন্যায় ভোগবিলাসী অপব্যায় ছিল উদ্দেশ্য; কিন্তু পরে, চারিত্রিক পরিবর্তন স্পষ্ট। ভোগের মোহ আর নাই। দৃষ্টিভঙ্গীর হইয়াছে আমূল পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তাঁহার ভাণ্ডার ধর্মপ্রচারের জন্য মুক্ত ছিল—কত অনাথ পরিবারের তিনি আশ্রয় ছিলেন, কত দরিদ্র গুণীকে তিনি অভাবের পেষণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, দেশের কত হিতকর্মে তিনি বিনা আড়ম্বরে গোপনে সাহায্য দিয়াছেন।"[১১৬]

রামমোহন রায়ের সহকর্মী পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপদেশে তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া ঠাকুরবাড়ীর ১০জন যুবকের সাহচর্যে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করিলেন ২১-১০-১৮৩৯ তারিখ। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভার নাম হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। সভার নিয়মপত্রে বলা হইয়াছে, "বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন।" অন্যত্র বিশদভাবে বলা হইয়াছে, "পরমব্রহ্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি সকলের মনে গাঢ়রূপে নিবেশ করিবার নিমিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক গ্রন্থ-সকল প্রকাশ করা, সমুদয় বেদ সংগ্রহপূর্বক তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপন এদেশে পুনঃ স্থাপন করা এবং পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রসকল কালেকালে কি তাৎপর্যে প্রণীত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান ও জ্ঞাপন করা এ সভার বিশেষ প্রয়োজন।"[১১৭]

উদ্ধৃতাংশ হইতে স্পষ্টই মনে হয় তত্ত্বোবোধিনী সভা একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কার্যত সর্বদা ধর্মাশ্রয়ী থাকা এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, বরং অন্য বিষয় অধিক প্রাধান্য পাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তাও ছিল একান্ত ভাবেই ধর্মাশ্রয়ী এবং সেজন্য তত্ত্ববোধিনী সভায় ধর্ম সম্বন্ধে মতামতের পার্থক্য

থাকিলেও স্বাদেশিকতার সকল কর্মকেই ধর্মীয় কর্মরূপে শ্রদ্ধার চক্ষেই তিনি দেখিতেন। তাই তত্ত্ববোধিনী সভা জাতির সর্বপ্রকার মঙ্গলসাধন করিবে—ইহাই ছিল যুগজয়ী দেবেন্দ্রনাথের সেকালের ধর্মীয় দৃষ্টির বিশেষত্ব। দেবেন্দ্রনাথ ভারতে ইংরাজদের সকল শিক্ষা প্রচেষ্টা ও সংস্কার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সন্দেহাকুল ছিলেন। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে স্থাপিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যে সঙ্গতভাবেই স্বাদেশিকতার প্রচার কর্মের ও সংগঠকের নেতা হইয়াছেন দেবেন্দ্রনাথ। তাই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠার দ্বারাই সভার কর্ম আরম্ভ হয় বিদ্যালয়টি পরে অর্থাভাবে ও অন্য কারণে উঠিয়া গেলেও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথপ্রদর্শক এই প্রচেষ্টাই। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১৮৪৫ সালে বলা হইয়াছে, "এইক্ষণে ১২৭ জন ছাত্র ছয় শ্রেণীতে নিযুক্ত থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান, ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বঙ্গ এবং ইংলণ্ডীয় ভাষায় অধ্যয়ন করিতেছে।……পদার্থবিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গভাষাতে প্রদানের তাৎপর্য এই যে, বঙ্গভাষা স্বদেশীয় ভাষা, অতএব তাহাতে উক্ত শাস্ত্রসকল প্রচারিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারিবেক।"[১১৮] দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিলেন ছাত্রদের জন্য। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথমাবধি শিক্ষক ছিলেন এবং বর্ণমালা, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তকাদি লিখিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত এবং পরে ইংরাজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল সম্পূর্ণ বাংলা মাধ্যমে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে সেকালে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবোধ জাতীয়তাবোধ হইতে পার্থক্য বজায় রাখে নাই ; এবং সবকিছুতেই তিনি ধর্ম ও স্বদেশ মিলাইয়া এক নব চিন্তাধারার সূত্রপাত করিয়াছেন এবং ভারতীয় স্বভাবত ধর্মাশ্রয়ী জীবনে ও সমাজে সাড়া জাগাইয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী সভার পর্যায় কার্যক্রম আলোচনা করিলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্ম ও কর্মের ক্রমপরিণতির সন্ধান অনেকাংশেই পাওয়া যাইবে। ইহার প্রথম পর্যায়ে যেমন দেখা যায় ধর্মচিন্তা তাঁহার সর্বক্ষেত্রের কর্মধারাকেই স্বদেশিকতার জারকে জারিত করিয়া জনসাধারণের কর্মক্ষেত্রে তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিল, পরে ক্রমেই সেইক্ষেত্রে ধর্মচিন্তা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কিত চিন্তা ও কর্মেই নিবদ্ধ হইতে থাকিল।

গতানুগতিক পন্থায় দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার পরিণতি হয় নাই। ২২-১২-১৮৪৩ তারিখ তিনি তাঁহার ২০জন বন্ধু ও আত্মীয়সহ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘকাল গ্রন্থপাঠ, আলোচনা ও নিজস্ব ধারায় গভীর চিন্তনের মধ্য দিয়া ক্রমে তিনি স্বীয় ধর্মমত স্থিরীকৃত করেন। তাহার যুক্তিসিদ্ধ মন আলোচনার মধ্য দিয়া বেদের অভ্রান্ততা ও ঐশ্বরিকতা প্রভৃতি সংস্কার মুক্ত হইলে উপনিষদেও তাঁহার অচলাভক্তি রহিল না। তাই তিনি শেষ অবধি উপনিষদ আশ্রয় করিয়া এক গ্রন্থ সংকলন করেন এবং নাম করেন 'ব্রাহ্মী উপনিষদ' অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যয় অনুযায়ী যে শ্লোক তিনি পাইলেন তাহাই গ্রহণ করিলেন। রেনেসাঁর ধর্মবোধের বিশেষত্ব দেবেন্দ্রনাথেও

স্পষ্ট, সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি-অনুভূতি ও উপলব্ধিসাপেক্ষ ধর্মবোধ। তাই পিতৃশ্রাদ্ধের কালে তিনি নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী শ্রাদ্ধ করিয়াছেন পরিজনদের বিরোধিতা সত্ত্বেও। গৃহের বিভিন্ন পূজা অনুষ্ঠানে তিনি সর্বদাই অনুপস্থিত থাকিয়াছেন – সংঘাত এড়াইবার নিমিত্ত। তাই ভ্রমণ তাঁহার জীবনে অবধারিত হইয়া উঠে।

দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজের ও হিন্দুধর্মের সকল প্রথাগুলির আমূল সংস্কারের কর্মে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই, শঙ্কিত হইয়াছেন সংস্কারের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্যের আগ্রাসী ভাবের সর্বনাশের সম্ভাবনায়। তাই দ্রুতগতি পরিবর্তনের সীমিত ক্ষমতা কার্যকারীতা সম্বন্ধে তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, "উৎসাহে লোকাচার দেশাচার উন্মূলন ও বিজাতীয় সভ্যতা আনয়ন করিবার নিমিত্তে সময়ের ব্যবধান সংকোচ করিতে গেলে আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধি আরও সুদূর পরাহত হইবে।"

দেশের পরিবেশই নয়—পরিবারের পরিবেশও দেবেন্দ্রনাথকে দেশের বিভিন্ন আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করে। [১১৯] এই পরিবেশে হিন্দু কলেজের ছাত্র হইয়াও তিনি যে প্রস্তরবৎ ভাবলেশহীন ছিলেন না বাস্তব ঘটনা তাহারই সাক্ষ্য দেয়।[১২০] ৩০-১২-১৮৩২ রামমোহন রায়ের অ্যাংলো হিন্দুস্কুল ভবনে সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা স্থাপিত হয়—দেবেন্দ্রনাথ ও রমাপ্রসাদ রায়ের উদ্যোগে। এই সভার বৈশিষ্ট্য হইল 'বাংলা ভাষাতেই সভার প্রতিটি কাজ সমাধা হইবে।' ইয়ংবেঙ্গলদের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় সভার উদ্দেশ্যের বিশেষ প্রশংসা করা হয়।[১২১] সুতরাং ছাত্রাবস্থা হইতেই হিন্দুকলেজের হাওয়া তাহাকে ভালভাবেই স্পর্শ করিয়াছিল এবং ডিরোজিয়ানরাও যে দেবেন্দ্রনাথের কর্মের প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের বিরূপতার পরিবর্তে সদ্‌ভাবেরই নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

বস্তুতপক্ষে তিনি বিভিন্ন আন্দোলনের ও সংস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৮-৪-১৮৪৩ তারিখে কলিকাতা টাউন হলে সরকারী চাকুরিতে ভারতীয় নিয়োগের উপর গুরুত্ব দিয়া তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে দেখা যায়। তিনি সভার প্রথম প্রস্তাবের প্রস্তাবক।[১২২] ভারতীয়দের সরকারী কর্মে বহুল নিয়োগের জন্য জন সুলিভানের পার্লামেণ্টে প্রয়াসের জন্য তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সভার দুদিন পরই 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা ভারতীয়দের জাতীয় সংগ্রামের প্রচেষ্টায় একটি বিশেষ পদক্ষেপ। ভবিষ্যতে ক্রমে এই সভা হইতেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়— ভারতীয় স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইলেন ইহার প্রথম সম্পাদক। ভারতীয় ও ইংরাজের স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের দ্রুত প্রসার হয় এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনদ প্রাপ্তির পরিবেশে ক্রমে ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের পথ নির্দ্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হয়। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বোম্বাই ও মাদ্রাজের জননায়কদের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং

ফলে ক্রমে বোম্বাই ও মাদ্রাজে এইরূপ সভা স্থাপিত হইয়া যৌথ জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ হয়।

১১-১২-১৮৫১ দেবেন্দ্রনাথ বেথুন সোসাইটি স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা করেন।[১২৩] এই সভায় ইংরাজী, বাংলা, উর্দু যে কোন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা দান প্রচলিত ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ লবণ করের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের নীতি অনুযায়ী কেবলমাত্র জমিদারদের উপর কর প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধেই বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, দরিদ্র রাইয়তদের প্রতি সুবিচারের প্রশ্নও তুলিয়াছেন। কারণ আইন লঙ্ঘনের জন্য তাহাদের সম্পত্তির সমমূল্যে জরিমানা করা হইত সামান্য লবণ তৈরীর জন্যও।

গ্রাম্য দরিদ্রের রক্ষায় সরকারের দায়িত্ব সম্বন্ধেও তিনি অবহিত করিয়াছেন।[১২৭] এই দুই ক্ষেত্রেই তাঁহার মানবিক ধর্মচিন্তা রাজনৈতিক ও স্বাদেশিকতার ভাবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং তিনি এইক্ষেত্রে সোচ্চার সংগ্রামী।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে ১৫-১২-১৮৫৪ তারিখে 'সমাজোন্নতি বিধায়নী সুহৃদ সমিতি' স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন, বহুবিবাহ প্রচলন নিরোধ। হিন্দুবিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন সম্বন্ধীয় অক্ষমতা দূর করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করিবার প্রস্তাব সমিতির প্রথম সভাতেই গৃহীত হয়। এই সমিতি সম্পূর্ণভাবে বিদেশীবর্জিত এবং স্বদেশীয়দের লইয়া গঠিত। এখানেও ডিরোজিওয়ানদের সহিত তিনি সংযুক্ত। ১৮৫৫ সনের প্রারম্ভে অন্তর্জলী-প্রথার বিলোপের প্রচেষ্টা হয় এই সভার মাধ্যমে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে, কিশোরীচাঁদের কাশীপুরের বাসভবনে, একটি বালিকা বিদ্যালয় সমিতির আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার সভাপতিত্বে স্ত্রীলোকের অধিকার স্থাপনের প্রচেষ্টায় এবং নারী স্বাধীনতার ও ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের যে ঢেউ তাঁহার পরিবারে সত্যেন্দ্রনাথের প্রয়াসে তাঁহারই বর্তমানে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি সম্পূর্ণভাবে নেতিবাচক অর্থে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে উক্তি 'সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়' করেন নাই।' ফলে স্বাদেশিকতার পীঠস্থান হইয়া নব এক ভারতীয়-আদর্শের পথিকৃত হয় ঠাকুর বাড়ী।

কর্মব্যাপদেশে হিন্দু কলেজের সহিত দেবেন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিন্ন হইলেও হিন্দু কলেজের ছাত্রগোষ্ঠির সহিত বিশেষত ডিরোজিয়ানদের সহিত তাঁহার যে যোগাযোগ ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার সময় ও পরেও সে সম্পর্ক যে অটুট ছিল তাহারও পরিচয় পাওয়া যায় সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার প্রকাশিত পুস্তক খণ্ডের সভ্য তালিকা হইতে। দেশোন্নতি, জ্ঞান বৃদ্ধি, স্ব-অভিজ্ঞতা বর্ণন দ্বারা সাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করা যে স্বদেশের উন্নতির

প্রচেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টার মাধ্যমে বঙ্গ ভাষার উন্নয়ন যে শিক্ষিতের কর্তব্য তাহা ডিরোজিয়ান ও দেবেন্দ্রনাথকে সমভাবেই চিন্তিত করিয়া কর্মপ্রয়াসে একত্রিত করিয়াছিল।

রাজনারায়ণ বসু

রাজনারায়ণ বসু উনবিংশ শতাব্দীর যুগমানসকে সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন আপন আত্মচরিতে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুগান্তকারী চিন্তাধারাগুলির স্ফুরণ হইয়াছিল হিন্দু কলেজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বগুলির মধ্য দিয়া। সে যুগে ধর্ম লইয়া চিন্তা ও বিশ্লেষণের অন্ত ছিল না। যুগের হাওয়া অনুযায়ী হিন্দুকলেজে পাঠকালেই ছাত্ররা ধর্মতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হইতেন। কিশোর বয়সের ভাবাবেগ ধর্ম সম্বন্ধে কিরূপ অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিত তাঁহার সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন,

"হিন্দুকলেজে পড়িবার সময় আমার ধর্ম্মতে পরপর কতকগুলি পরিবর্তন হয়; কিন্তু উনবিংশ বৎসরের সময় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্তবাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইলে যে আদিব্রহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম হই, তাহা এখনও আছি। শেভালিয়র র‍্যামজের 'সাইরাসেজ ট্যাভেলজ' পড়িয়া প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশ্বাস বিচলিত হয়। তৎপরে রামমোহন রায়ের 'অ্যাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক ইন ফেভর অফ দি প্রিসেপ্টস্ অফ জীসাস' এবং চ্যানিঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইউনিটেরিয়ান খ্রীস্টিয়ান হই, তৎপরে ঈষৎ মুসলমান হই, পরিশেষে কলেজ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হিউম পড়িয়া সংশয়বাদী হই। যে পুস্তক যখনই পাঠ করা যায় তখনই সেইরূপ হওয়া অবশ্য বালকতা বলিতে হইবে। আর তখন যথার্থই বালক ছিলাম।[১২৫]

সত্যই সংসারের রূঢ় বাস্তব ঘাতপ্রতিঘাতে আবেগ ক্রমে প্রাধান্য হারাইয়া ফেলিলে মানসিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়, তাহাতেও ধর্ম বিশ্বাস পরিবর্তিত হইতে থাকে। এইরূপ পরিবর্তন ক্রমে যুক্তিবিচার সিদ্ধ পরিণত রূপগ্রহণ করিত উনবিংশ শতাব্দীর নবশিক্ষিতদের মধ্যে। রাজনারায়ণ বসুও তাহার ব্যতিক্রম নয়। তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "কিন্তু আমার স্ত্রী ও পিতার মৃত্যু আমাকে প্রকৃতিস্থ করিল। পুনরায় ধর্মে আমার বিশ্বাস হইল; কিন্তু এবার আমার পৈতৃক ও সে-সময়ের তত্ত্ববোধিনী সভার প্রচারিত বৈদান্তিক ধর্মে বিশ্বাস হইল।"[১২৬] অবশ্য রাজনারায়ণ বসুর এই ব্রাহ্মধর্ম নিষ্ঠা ছিল আমরণ।

কিন্তু হিন্দুকলেজীয়দের মধ্যে এই ধর্মনিষ্ঠা কোন সংকীর্ণতার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। পূর্বের হিন্দু ধর্ম-ভাবকে তাঁহারা পাশ্চাত্যের নব মানবিকতার ভাবধারায় সিঞ্চিত ও পরিশোধিত করিয়া আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দু বা ব্রাহ্ম বলিয়া সম্পূর্ণ পৃথক অস্তিত্বের রূপ রাজনারায়ণ বসুর নিকট কখনই

প্রাধান্য পায় নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা অপরাপর খৃষ্ট ধর্মগ্রহণকারীদের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যেও ছিল সংস্কার মুক্ত হইবার বালকোচিত বহিরাঙ্গিক আচরণের প্রাধান্য। হিন্দু রক্ষণশীলদের গোঁড়ামির মূলে আঘাত করিয়া শিক্ষিত তরুণদিগের মনে কুসংস্কারের মোহ কাটাইবার প্রয়াসে এবং তারুণ্যের প্রকাশধর্মীতায় তাঁহারা সকলেই ছিলেন একই পন্থার পথিক। ইহা বহুলাংশেই ছিল নবজাগরণের স্বাভাবিক স্পর্ধিত প্রয়াসের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কারণ ধর্ম তাঁহাদের নিকট ঠিক মধ্যযুগীয় স্বরূপ লইয়া মানসিক অচলায়তন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। মানসিক প্রসারতা মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসের সংকীর্ণতা মুক্ত হইয়া বিশ্বমানবিকতার উদার চিন্তাশ্রয়ী হইয়াছিল। ইহা ছিল একান্তভাবেই ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধি সাপেক্ষ। কিন্তু সংস্কার মুক্তির বিষয়ে বাহিক উগ্রতা মুক্ত হইতে রাজনারায়ণও পারেন নাই। তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "যেদিন প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সেদিন আমি স্বগ্রামের দুই-একজন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত তাহা করি। যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইযা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। জাতি বিভেদ আমরা মানিনা, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্যপান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদের সময় পর্যন্ত টানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে। আমি এই সময়ে অতি পরিমিতরূপে পান করিতাম।"[১২৭]

রাজনারায়ণ বসু পিতার অধ্যাত্ম বিশ্বাসকে ভক্তিরসের ভাবকে স্নিগ্ধ করিয়া লন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্তি মূলক ব্রাহ্ম ধর্মের দ্বারা। ব্রাহ্ম ধর্মকে কখনই তিনি সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম নিরপেক্ষ ভাবিতে পারিতে নাই। পিতা ব্রহ্মবাদী ও ব্যক্তিগত জীবনে নিভৃতে মুসলমান অশনে আসক্ত হইলেও জনজীবনে, সমাজ হিন্দু আচার ব্যবহার মানিয়া চলিতেন। ভবিষ্যত জীবনে রাজনারায়ণ কিন্তু কখনই উগ্র হইতে পারেন নাই। তাই হিন্দু ব্রাহ্ম সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন।

হিন্দুকলেজীয়রা ভবিষ্যত জীবনে ধর্ম সম্বন্ধে নানা ধর্ম অনুসারী হইয়াছেন। কিন্তু সেই ধর্মাশ্রয়ী জীবন যেমন ছিল ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধি-সাপেক্ষ তেমনি অনেকাংশেই সমন্বয়বাদী ও উদার। যুক্তি ও ভক্তির আশ্রয়ে সহাবস্থানের প্রয়াসে তাঁহারা হন কল্যাণধর্মী। তাই অক্ষয়কুমার দত্তের যুক্তিবাদ প্রাধান্য ও দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিবাদের শ্রদ্ধা ব্রাহ্মধর্মে এবং ক্রমে হিন্দুধর্মে উদারতার প্রাধান্য আনিয়া দেয়। আধুনিক ব্যক্তিত্ব কর্মাশ্রয়ী ও কল্যাণধর্মী। তাই কেবলমাত্র ধর্মালোচনাতেই সম্পূর্ণ ব্যাপৃত না থাকিয়া রাজনারায়ণ বসু ও অপরাপর শিক্ষিতগণ সম্মিলিত হইয়াছেন জাতীয় ও দেশীয় স্বার্থে মানব কল্যাণ সাধন প্রয়াসে। রাজনারায়ণ ১৮৫১ সাল হইতে ১৮৬৬ সাল পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক

ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বিশেষ কর্মের তালিকা হইতে তাঁহার কর্মজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়,

১। মেদিনীপুর জিলা স্কুলের উন্নতি সাধন।

২। মেদিনীপুর ব্রাহ্ম সমাজের পুনঃ সংশোধন ও উন্নতি সাধন।

৩। জাতীয় গৌরব সম্পাদনা সভা সংস্থাপন।

৪। সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপন।

৫। বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন।

৬। ধর্মতত্ত্ব দীপিকা প্রমুখ রচনা।

৭। Defence of Brahmaism and Brahmosamaj. গ্রন্থরচনা ইত্যাদি।

ইয়ংবেঙ্গলরা এই সময়ে সাংগঠনিক পন্থায় স্থায়ী কর্মপ্রচেষ্টায় ব্যাপৃত। রাজনারায়ণ বসুও সেই পন্থারই পথিক। ছাত্রদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল প্রখর এবং বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তিদানও তিনি বন্ধ করেন। বিদ্যালয় স্থাপন, সভাসমিতি স্থাপন ও নানাক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে এবং সাক্ষাতভাবে সমাজ সংস্কারের পন্থা গ্রহণ করেন। সুরাপান নিবারণী সভা ও জাতীয় গৌরব সম্পাদনা সভার মাধ্যমে আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা স্পষ্ট। বায়রণ, স্পেন্সার ও টমসনের প্রভাব তাঁহার স্বদেশপ্রীতির ভাবধারাকে গভীর করিয়াছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "প্রকাশ্য সভায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দান বা রচনা-পাঠের কথা ইতিপূর্বে কোন শিক্ষিত বাঙ্গালী চিন্তাই করিতে পারেন নাই।"[১২৮] এই জাতীয়তার ভাবধারা প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাস-আশ্রয়ী-বীর ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের পুনরায় গৌরবোজ্জলরূপে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তদানীন্তন দেশীয়দের মধ্যে আত্মবিশ্বসের স্ফুরণ করাই ছিল রাজনারায়ণ বসুর উদ্দেশ্য। সেই প্রয়াসে অনেকক্ষেত্রে নব ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "তাঁহার (রাজনারায়ণ বসু) নিকট হইতে বাঙ্গালী রাজা বিজয় সিংহের সিংহল বিজয়ের কাহিনীটি প্রাপ্ত হই। এই বাঙ্গালী বীরের কাহিনী বলিতে বলিতে গর্বে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।—নবগোপাল মিত্র মহাশয় রাজনারায়ণ বাবুর নিকট হইতেই তাঁহার স্বদেশী মেলা প্রবর্তনের প্রেরণা লাভ করেন।"[১২৯]

হিন্দুধর্মের চিন্তাধারার ত্রুটি ও দুর্বলতা লইয়া ইয়ংবেঙ্গলরা সচেতনভাবে হিন্দু-ধর্মকে সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতিরাও প্রতিমা পূজা ও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সমালোচক হইয়া উঠেন এবং নিজেরাও তাহার সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হন। ভারতীয় সভ্যতার গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় রাজনারায়ণও আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৭৩ সালে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতাটির মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় চিন্তা-

ধারারও দিক পরিবর্তন করাইয়া দেন। 'রাধামোহন, ডিরোজিও', ইয়ংবেঙ্গলের অতীত গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের সন্ধানের প্রচেষ্টারই এক নব রূপায়ণ হয় ইহার মাধ্যমে। ইহা জাতীয়তাবাদের এক দৃঢ় পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। তিনি মোটামুটিভাবে ১২টি দিক হইতে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণে সচেষ্ট হন। ইহা তদানীন্তনকালের ছাত্রদের সকল ধর্ম লইয়া আলোচনার ও উপলব্ধির সুফল বলা যাইতে পারে। 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' বক্তৃতায় সর্বধর্ম ও গোষ্ঠী-আশ্রয়ী ভারতভূমির স্থান পাইয়াছে এবং তাহা অসাম্প্রদায়িক। ইহাতে বুঝিবা 'ভারততীর্থ' কবিতারই অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসু নিজেকে 'Hindu Theist' মনে করিতেন। ইয়ংবেঙ্গলদের যুক্তিবাদী চিন্তাধারার সহিত তিনি স্বাজাত্যবোধকে আরও দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট করিয়া দিতে সক্ষম হইলেন। তিনি বিধবা বিবাহসংস্কারে উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তাহাদের (দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব, রাজনারায়ণ) সর্বকর্মে বাংলা ব্যবহারের প্রচেষ্টার যেন পূর্ণ পরিণতি দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রেনেসাঁর একটি বিশেষত্বই মাতৃভাষার প্রাধান্য দান ও মাতৃভাষার যোগে প্রগতির দ্রুত প্রসার-করণ। তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন। 'বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য' বিষয়ক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনের প্রতি জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।" তিনি ইংরাজী ও বাংলাভাষার সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারের দ্বারা সাহিত্যিক মান সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করিয়াছেন। হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' লিখিয়া তিনি হিন্দু কলেজের বিশেষত্বের দিকটাই স্পষ্ট করিয়াছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদ অবধি যে আদর্শবাদগুলি বাঙালী মানসকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহাদের উৎস ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় আশ্রিত আদর্শবাদের প্রবাহকে বিশিষ্টরূপে সংজ্ঞায়িত করিয়া বলা যায়—'বাঙালী মানসের ভারতমুখীনতা।' জাতীয় জীবনের সবদিকগুলি সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি ছিল যেমন অতি গভীর অনুসন্ধানী, তেমনি জাতির সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন স্থির নিশ্চিত।

তাঁহার চিন্তাধারার বিশ্লেষণে দুইটি প্রধান বিশেষত্ব স্পষ্ট হইয়া ওঠে,

১। অতীতমুখী জিজ্ঞাসা; অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের মধ্যেই তিনি ভারতের চিরন্তন প্রয়োজনীয় সত্যকে ও আদর্শকে দেখিয়াছিলেন। পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ ছিলেন তাঁহার প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ-পুরুষের জীবন্ত বিগ্রহ —'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্র সেই স্বাক্ষর বহন করিতেছে। আধুনিক জীবনধারায় সেই আদর্শ দৃষ্টির শান্ত গম্ভীর ভাবের শান্তি বিরাজমান নাই।

২। ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গী, অতীত ও ভবিষ্যৎ ভারতের মধ্যে আদর্শগতভাবে বুদ্ধি ও যুক্তি সুষ্ঠযোগ স্থাপনাই তাঁহার প্রতিভার বিশিষ্ট প্রয়াস। এই দৃষ্টি দ্বারাই

ভারতবাসীর সমগ্র ব্যক্তিক, পারিবারিক, জাতীয় ও ধর্মীয় জীবনকে তিনি এক শৃঙ্খল সূত্রে আবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এই শৃঙ্খল সামাজিক জীবন হইতে ভারতের চিরকালের আদর্শ শান্ত সৌম্য মহামানব নেতার আবির্ভাব ঘটাইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ, জগৎসভায় আবার শ্রেষ্ঠ হইবে।

সকল দেশের আচার অনুষ্ঠান জাতীয় সমাজ সংস্কারের ও ধর্মের দ্বারা লালিত পালিত। অধিকাংশ স্থলেই স্বীয় জাতি, সমাজ ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির দ্বারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই বিশ্বজনীনতার আদর্শ স্থাপনা কল্যাণকর। সেইজন্যই হয়তো রামমোহন-ডিরোজিয়ান প্রভৃতির চিন্তাধারা ও রচনার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের মানবিকতাবোধের সঞ্চার হইলেও সম্পূর্ণ নিরশ্বর কোন মতাদর্শই ভারতের শিক্ষিত সমাজেও স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ভূদেব মুখোপাধ্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের বিদেশী প্রবণতা ও ভারতীয় জীবনবোধ সম্বন্ধে সংশয় ও অবজ্ঞার মনোভাব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল ধর্ম সংস্থাপনার মধ্যেই সর্বাধিক মঙ্গল ও শান্তির উৎস নিহিত। তাই মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বাদেশিকতা তাহার কাব্যপ্রতিভার মধ্যে প্রকাশিত হইলেও তিনি রাজনারায়ণ বসুর স্বাদেশিকতাকেই শেষ ভাবিয়াছেন। পিতৃভূমি দর্শনের প্রেরণা তাঁহার গোঁড়া আর্যাবর্তবাদী মনোভাবেরই প্রকাশনা। তাই তাঁহার দেশাত্মবোধ অপরাপরের ন্যায় বাঙালী দেশাত্মবোধ না হইয়া হিন্দু আর্যাবর্তবোধ রূপেই প্রকট হইয়াছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা স্থল প্রধানত হিন্দু কলেজে। তিনি মেধাবী ছাত্র বলিয়া স্বীকৃত। তাঁহার আদর্শের উপর মাতা পিতার প্রভাব ছিল গভীর। হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে ৬০্ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক রূপে তাঁহার চাকুরী জীবনের আরম্ভ। লৌকিক শিক্ষাদানের সহিত ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থায় তিনি আদর্শগত সন্তুষ্টি পাইলেও, মাত্র বছর খানেক চাকুরি করেন। কলিকাতা মাদ্রাসায় দ্বিতীয় শিক্ষক-রূপে চাকুরী জীবন আরম্ভ করিয়া প্রথম শ্রেণীর স্কুল ইন্সপেক্টর পদে বৃত হন। তাঁহার চাকুরি জীবন সমুজ্জ্বল। সেকালের অপরাপরের ন্যায় প্রয়োজনে স্বীয় মতবাদকে জনসাধারণের মধ্যে কার্যকরীরূপে প্রচার করিবার জন্যই সংবাদপত্র সেবা ও সাহিত্য সেবা, 'শিক্ষা দর্শন', 'সংবাদ সার'. 'এডুকেশন গেজেট', 'সাপ্তাহিক বার্তাবহ' প্রভৃতি পত্র পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। 'এডুকেশন গেজেট' বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়।

হিন্দু কলেজে পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার জীবনের কয়েকটি ঘটনা পাশ্চাত্যপন্থীদের ভারত সম্বন্ধে সীমিত ধারণার যে নিদর্শন দিয়াছে তাহা তাহার দেশীয় ঐতিহ্যবোধকে তরুণ বয়সেই আঘাত করিয়াছে এবং ইহার ফল হইয়াছে দীর্ঘস্থায়ী। এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা গেল, "রামচন্দ্র মিত্র ভূগোল পড়াইবার সময় পৃথিবীর

গোলকের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজীওয়ালা মাত্রেই বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষকেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে ভালবাসেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, রামচন্দ্রবাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল, কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করবেন না।" আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটির পর বাড়ি আসিলাম। কাপড় চোপড় ছাড়িতে দেরী সহিল না। একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাবা, পৃথিবীর আকার কি রকম।' তিঁনি বলিলেন, 'কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।' এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুঁথি দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, 'ঐ গোলাধ্যায় পুঁথিখানির অমুক স্থানটি দেখ দেখি।' আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম তথায় লেখা রহিয়াছে, 'করতলকলিতা-মিলকবদমলং বিদন্তি যে গোলম্।' রচনাটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে ঐটি টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্র বাবুকে বলিলাম, 'আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা তো পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন', এই দেখুন তিনি বরং এই শ্লোকটি আমাকে পুঁথি মধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।' রামচন্দ্র বাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, 'কথাটি বলায় আমার একটু দোষ হইযাছিল,' 'তা তোমার বাবা বলবেন বৈকি ; তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।" দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও বাল্যকালের এই দৃষ্টান্তটি [১৩০] পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্মরণের মধ্যে সেকালের বিদেশানুরাগী ইংরাজী ওয়ালাদের অশালীন ভাবে দেশীয় সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রতি অবজ্ঞা ও অজ্ঞানতা যেমন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি ইহারই প্রতিক্রিয়ায় ভূদেবের রক্ষণশীলতার অঙ্কুরোদ্‌গমেরও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। সমালোচকের জ্ঞানের স্বল্পতা এইরূপেই বহুক্ষেত্রে প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বকে আরও দৃঢ়মূল করিয়া তোলে। ভূদেবের স্বভাবজ সত্যানুসন্ধিৎসা হিন্দুকলেজে আবদ্ধ থাকিতে পারে নাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ধান করিয়া প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত স্বরূপ লক্ষ্য করিয়াই তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার দেশীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা আরও প্রগাঢ় হইয়াছে, আবার কুসমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় বিদেশী ভাবধারার প্রতি অশ্রদ্ধাও বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাই ভূদেবের মধ্যে আপাত বিরোধ ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত কোথাও তিনি চরম রক্ষণশীল (সামাজিক কোন সংস্কারই তিনি ভালভাবে গ্রহণ করেন নাই) আবার কোথাও প্রগতিবাদী (মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধা, হিন্দীর প্রতিষ্ঠা দান প্রভৃতি। তিনি পরমহংসদেবের ন্যায় বিশ্বাস করেন,' 'সত্য একও বটে, বহুও বটে' এবং জগতের ধর্মসমূহ পরস্পর বিরোধী নয়।' তাই কনৌজে রাজনারায়ণ বসু ও ব্রাহ্মণের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধীয় তর্কের

এককথায় তিনি মীমাংসা করিয়া দেন সর্বজনগ্রাহ্য ভাবে "সব অপনে অপনে জগহ পর ঠিক হ্যায়।"

ইহাই হিন্দুধর্মের পরমসহিষ্ণুতার সহস্রাব্দীর রূপ। উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু কলেজীয় গোঁড়া হিন্দু ভূদেবের এই আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেও গ্রাহ্য। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও এই কথারই স্বীকৃতি সোচ্চার হইয়াছে।

তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমেই প্রধানতঃ তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচিতি স্পষ্ট। সামাজিক প্রয়োজনে তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টি। তিনি পুস্তক রচনা করিয়াছেন বিদ্যালয়ের জন্য, হিন্দুসমাজের জন্য এবং সর্বসাধারণের জন্য। তাঁহার নিরলঙ্কার ঋজু ভাষা, জটিল বিষয়ের প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশ ক্ষমতা, তথ্যনিষ্ঠা, পরমত সহিষ্ণুতা ও যুক্তি শৃঙ্খলামণ্ডিত গঠন বাংলা সাহিত্যে বিরল। ভূদেব বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। মোটামুটি ভাবে তাঁহার সাহিত্যকে দুই ভাবে বিভক্ত করা যায়—

১। গভীর জ্ঞান ও মননশীলতার নিদর্শন স্বরূপ প্রবন্ধাবলী— 'পারিবারিক প্রবন্ধ, 'সামাজিক প্রবন্ধ;' আচার প্রবন্ধ;' বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ও ২য়), রূপকাকারে লিখিত 'পুষ্পাঞ্জলি'। এই রচনাগুলি পাঠকের চিন্তা উদ্দীপন করে।

২। সৃষ্টিশীল কল্পনার প্রকাশ—'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস।' এই গ্রন্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস সাহিত্যের ও বঙ্কিমী সাহিত্যের সার্থক পথ প্রদর্শনকারী সূচনা—(সফল স্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময়।)

ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দু শাস্ত্রীয় উদারতার সহিত সমাজ এক করিয়া ফেলিয়াছেন। ভাবালুতাই তাঁহার আশাবাদীতার মধ্যে স্পষ্ট, যুক্তি নয়। পাশ্চাত্য স্বদেশানুরাগের সন্ধানে তিনি ধর্মস্থানকেই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি করিরাছেন। তাই ইংরাজ চাতুরী সম্বন্ধে তিনি অধিক সচেতন। স্বাধীন বা অবাধ বাণিজ্য (বিবিধ প্রবন্ধ ২য়) প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন," 'ইংরাজকৃত যাবতীয় কার্যের হাড়ে হাড়ে যে স্বার্থপরতা মিশাইয়া থাকে তাহা তাঁহার অনুমোদিত স্বাধীন বা শুল্কবিহীন বাণিজ্য প্রণালীয় ইতিবৃত্ত এবং তদ্বিষয়ক বিচার প্রণালীর পর্যালোচনার দ্বারা অতি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়।[১৩১]" দুর্বল বাঙালীর ট্রাজিক সমাজ জীবনের মনন ধারার বাস্তবহীনতা ভূদেবের মধ্যে আশ্রয় করিয়াছিল পাশ্চাত্য যুক্তি প্রয়োগ পদ্ধতির দ্বারা। অর্থাৎ যেখানেই শক্তি, সাহস, বুদ্ধি, শ্রদ্ধেয় বা গর্বযোগ্য কিছু প্রাচীন হিন্দুর শাস্ত্রে পাইয়াছেন তাহারই আশ্রয়ে ইংরাজের সমকক্ষ হইবার আশা তিনি পোষণ করিয়াছেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

"তিলোত্তমা সম্ভব" কাব্য উপহার পাইয়া বাল্যবন্ধু রাজনারায়ণ বসু মাইকেল মধুসূদন দত্তকে ১৮৬০ সনের ২৯শে জুন লিখিয়াছিলেন ;

"Your reward is very great indeed, immortality."

সত্যই মাইকেল মধুসূদন দত্ত কেবল মাত্র বাংলা সাহিত্যেই অমর এমন নয়—আধুনিক বাংলা তথা ভারতের নব জাগরণযুগের ভাবরাজ্যে বিপ্লবের প্রথম সার্থক রূপস্রষ্টা। বাঙালী কিম্বা অবাঙালী ভারতীয়, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া ঋণ স্বীকার করিবেই। তাই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের' কবির স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি উপহার পাইয়া শুধু নিজেকেই ধন্য মনে করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই—নিজ বংশধরদিগের দৃষ্টিতেও যে তিনি স্বয়ং অশেষ শ্রদ্ধেয় হইয়া রহিলেন তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন।[১৩২]

প্রায় চল্লিশ বৎসর সুসংবদ্ধ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে বাংলা সমাজ ও ব্যক্তি মানসের বহুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল বলিয়াই উন্নত শালীন রসবোধের সন্ধান পাওয়া যায় শিক্ষিত সমাজে। মানুষ আর কেবলমাত্র মধ্যযুগীয় সাহিত্য লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে চাহে না। 'এখন আর লোকের মন সুখময় আদিরস সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত পদ্য সৃষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে সন্দেহ নাই।"[১৩৩] বলিয়াছেন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। এই উক্তির মাধ্যমে বাংলার বিভিন্ন মুখী পরিবর্তনের কথাই যেন স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার পূর্বেও বহু কবি খ্যাত হইয়াছেন; কিন্তু কেহই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক না হওয়ায় ভাব জগতে আমূল পরিবর্তনের রূপটি প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। মাইকেল মধুসূদনের সমগ্র জীবনেই এই পরিবর্তনের স্বাক্ষর রহিয়াছে। বিভিন্নমুখী আপাতবিরোধী ভাব ও আবেগের দ্বন্দ্বে মধুসূদনের জীবন হইয়াছে পর্যুদস্ত ও অবিন্যস্ত। আধুনিক সমাজের জটিলতা ব্যক্তি চরিত্রকে অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত করিয়াছে বলিয়াই তাহার প্রকাশ ভাব জগতেও হইয়াছে। তাই মধুসূদনের ভাব জগতের স্বাক্ষর বহন করিয়া তাহার সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে আধুনিকতার অগ্রদূত। অল্প বয়সে হিন্দুকলেজ ছাত্র জীবনে ১৮৪০ সালেই তাহার মধ্যে দ্বিমুখী আপাত বিরোধী (স্বদেশপ্রীতি ও ইংলণ্ড প্রীতি) ভাব দ্বন্দ্বের প্রকাশ হইয়া প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়াছিল। বাংলা ভাষা অশিক্ষিতের ও বর্বরের ভাষা এবং তাহা বিস্মৃত হওয়াই ভাল বলিয়া সাধারণ সংস্কার থাকিলেও তাহার প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাকের অনুরোধে বর্ষা ঋতুর বর্ণনাচ্ছলে ইংরাজী 'এক্লটিক' জাতীয় কবিতার অনুসারে 'বর্ষাকাল' নামে একটি কবিতাও বিনা দ্বিধায় রচনা করেন।[১৩৪]

এই ছাত্রাবস্থাতেই ইংরেজী ভাষার একান্ত সেবক হিসাবেও কবিতা সৃষ্টির সময় তাঁহার মধ্যে এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখা যায়। একটি কবিতায় তাঁহাকে ইংলণ্ডের জন্য হা হুতাশ করিতে দেখা যায়ঃ

"And oh ! I sigh for Albion's stand
As if she were my native land,"

আবার সেই সময়েই অন্য কবিতায় ভারতভূমির প্রেমের কথাও পাই :—

"Oh ! how my heart exalteth which I see
These future flowers to deck my country's brow,
thus kindly nurtured in this Nursery !"

এই পরস্পর বিরোধী ভাবানুভূতির যুগপৎ প্রাধান্য সেকালের ভাবদ্বন্দ্বেই প্রকাশ। কেবলমাত্র মধুসূদনেই নয় সমগ্র শিক্ষিতদিগের মধ্যেই ছিল। রামমোহন রায় ক্ষুদ্র দেশের স্বাধীনতার জন্য ভোজসভার আয়োজন করেন কিন্তু স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তত উদগ্রীব নন। রাধাকান্ত দেব পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবধারায় বাংলার সামাজিক ও ব্যক্তিক জীবনও যে পরিবর্তিত হইবে তাহা বুঝিতে পারেন না। রামমোহন বেদান্ত শিক্ষার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করেন ; কিন্তু আবার ডঃ ডাফের জন্য খ্রীষ্টান স্কুলের সুব্যবস্থা করেন। খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা প্রভাবের বন্যায় যে বেদান্ত শিক্ষা ভাসিয়া যাইতে পারে তাহা তিনি ভাবিতেই পারেন না। কাজেই সেকালের শিক্ষিত সমাজে এই আপাত বিরোধী ভাবের দ্বন্দ্ব আবেগ প্রধান ব্যক্তি মনের স্থিতিশীলতায় দোলার সৃষ্টি করিয়াছিল। ভবিষ্যতে মধুসূদনের প্রতীচ্য জ্ঞান ও ডিরোজিওর প্রভাব তাঁহার চেতনামূলক দেশপ্রেমাত্মক একটি অরূপ (abstract) ভাবালুতার আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। যদিও বঙ্কিম-পূর্ব নাগরিক বাঙালীর কাছে স্বদেশপ্রেম ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্রবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে সমার্থবাচক ছিল না, তথাপি পরবর্তী জীবনের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা লব্ধ স্থিতধী মধুসূদন প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান মেঘনাদ বধ কাব্য।

ডিরোজিও প্রচলিত হিন্দু কলেজীয় যুক্তিনির্ভর বুদ্ধিগ্রাহ্য সমালোচকের দৃষ্টি সম্পন্ন শিক্ষায় এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান ভাণ্ডারলব্ধ জ্ঞান সমৃদ্ধ প্রাপ্ত বয়স্ক মধুসূদন প্রতিভা অদ্ভুতভাবে সমাজ সচেতন হইয়াছিল। সর্বসমাজের সবকিছুই একই নিরিখে বিচার করা আধুনিকতার পরিপন্থী। সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী দৃষ্টি ও বিচার শক্তি না থাকিলে স্বীয় সমাজ সংস্কৃতির উন্নতিসাধন সম্ভব নয়। যুগ সচেতন ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন মুখী বিশ্লেষণী শক্তি সম্পন্ন হইলেই সমাজের সর্বমুখী পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্ভব। মধুসূদনের মধ্যে এই সমাজ সচেতন সমালোচকের দৃষ্টি এতই প্রখর ও বাস্তব ছিল যে সেকালের বাংলায় কি প্রকারের সাহিত্য, ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই যাহারা তাঁহার সাহিত্যকে শেক্সপিয়ারের সাহিত্য বিচারের নিরিখে বিচার করিয়া সমপর্যায়ের রসোপলব্ধিতে সক্ষম হইতেছেন না বলিয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন,

তাঁহাদের সচেতন করিয়া দিতে পিছপা হন নাই। কারণ, দুই সমাজ পৃথক এবং প্রয়োজনও পৃথক। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রসঙ্গে রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন :—

'I have certain dramatic notions of my own, which I follow invariably……as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the cannons of criticism that have been given forth by the master pieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances, Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a mild shape."[১৩৫]

বাংলার নাট্য ঐতিহ্যে সেকালে আধুনিক দ্বন্দ্বমূলক চরিত্রসৃষ্টি সম্ভব ছিল না। কারণ, ভাষার অপূর্ণতা এবং ব্যক্তি ও সমাজজীবনে দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাতের অভাব। মধ্যযুগীয় ধর্মভাব সর্বত্রই এমনভাবে চরিত্রকে বাঁধিয়া রাখে যে চরিত্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যমুখী ব্যক্তিত্বের স্পষ্টরূপ প্রকাশনা সম্ভব হয় না। সর্বত্র কাব্যের ছড়াছড়ি, বাক্-সর্বস্ব-বর্ণনা-বহুল নাট্যকাব্যই প্রধানত দেখা যায়। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানসমৃদ্ধ রসিকজন দেশীয় প্রাচীন কাহিনী অনুযায়ী নাটকে তৃপ্ত হইতে পারেন না। তাই 'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদনের দ্বারা সমৃদ্ধ ও উন্নত পর্যায়ে লিখিত হইলেও পাশ্চাত্য আদর্শ অনুযায়ী হইতে পারে নাই। এ-ত্রুটি মধুসূদনের নয়। কারণ, দেশীয় বাসনা-সংস্কার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিলে সৃষ্ট চরিত্র অসংলগ্ন বলিয়া মনে হইতে পারে এই ত্রুটি প্রাচ্যপ্রেমী উইলসন সাহেবও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই মধুসূদনের প্রয়াস হইল মূল কাহিনী ঠিক রাখিয়া ও আমূল দেশীয় সংস্কার বজায় রাখিয়া নাটকের আধুনিকীকরণ। কারণ নাটক দেশ ও কাল অনুযায়ী হইলেই সার্থক। তাই মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন, 'But this is not the age for the drama to flourish. We want the public ear to be attuned to the melody of the Blank Verse.'[১৩৬]

মধুসূদন বাংলা নাটকের রুদ্ধগতির কারণ সঠিকভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই নূতন নাটকের মধ্য দিয়া আধুনিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দ্বান্দ্বিক চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস নূতন ভাবপ্রকাশের মাধ্যম সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত অসফল হইবে বলিয়াই নব প্রকাশ-মাধ্যমের আবিষ্কারে ব্রতী হইলেন। যদিও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই কর্মে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হাস্যোদ্দীপক প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়া আশাবাদী হইতে পারেন নাই—তথাপি পাশ্চাত্য জ্ঞানসমৃদ্ধ মধুসূদন অতি অল্প আয়াসেই বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টিতে সক্ষম হইলেন। ফরাসী সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে না পারায় জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। কিন্তু মধুসূদন জানিতেন যে বাংলা অতি সমৃদ্ধিশালিনী, সংস্কৃত ভাষার দুহিতা। মধুসূদনের কর্ণ ও জ্ঞান সংস্কৃত ভাষার নমনীয়তা ও সুললিত অদ্ভুত নূতন শব্দ-সৃজনের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ছিল বলিয়াই সংস্কৃত দুহিতা বাংলার সেই ক্ষমতার

৮

কথা তিনি ক্ষণেকেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই মধুসূদনের পরেই বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বষ্ঠু সচেতন প্রয়োগ করিতে দেখি হিন্দুকলেজের আর একটি প্রাক্তন ছাত্র দ্বারা। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের গোড়ায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে দুইটি কবিতা লিখেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান সমৃদ্ধ নয় বলিয়া ঈশ্বর গুপ্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি করিতে যাইয়া হাস্যকর রসসৃষ্টি করিয়াছেন।[১৩৭] অর্থাৎ নবযুগের ভাবপ্রকাশনে পয়ারের ক্ষমতা অতি সীমাবদ্ধ এবং সেইজন্য প্রয়োজন অমিত্রাক্ষর ছন্দের অবাধ গতি। শ্লথগতি সমাজ প্রতিভূ ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক সমাজের গতিধর্ম বুঝিতে অপারগ ছিলেন বলিয়াই তিনি অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। অপর পক্ষে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রথম সর্গ লিখিয়া বেনামীতে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত করিয়া ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "কোন সুচতুর কবির সাহায্যে আমরা নিম্নস্থ কাব্য প্রকটিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন ও অন্ত্যযমকের পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্দ্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়; বর্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।"[১৩৮]

মধুসূদন রেনেসাঁর স্বভাবধর্ম সম্বন্ধে এতই সচেতন ছিলেন যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ভাবধারার অবসান কল্পে ও আধুনিকতার রূপায়ণে অমিত্রাক্ষরের যুগান্তকারী প্রভাব বুঝিয়াই যেন 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গকালে লিখিয়াছিলেন, "যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেননা এরূপ পরীক্ষা বৃক্ষের ফল সদ্য পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগদেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন।"

প্রকৃতপক্ষে এইসকল সাহিত্যে মধ্যযুগের বিদায় পর্ব যেন সাড়ম্বরে আয়োজিত হইল। এই ছন্দপ্রবর্ত্তনে শুধু কাব্য নয়, বাংলা গদ্যও সতেজ ও ওজস্বী হইবার অবকাশ পাইল।

বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ হইতে জানা যায় যে মধুসূদন প্রকৃতপক্ষে হিন্দু কলেজের জুনিয়ার শ্রেণীতে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে পাঠ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ১৮৪৩ সন অবধি সিনিয়র শ্রেণীতে পাঠ করিয়াছিলেন। ৭-৩-১৮৩৪ সনে হিন্দু কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় তিনি আবৃত্তি করিয়াছিলেন।[১৩৯]

১৮৪২ সালে তিনি যখন সিনিয়র বিভাগের ২য় শ্রেণীর ছাত্র সেইসময় পিতামাতা কর্তৃক নির্বাচিত ৮।৯ বৎসরের একটি বালিকাকে বিবাহ করিতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যধর্মী ব্যক্তিত্ব নারাজ ছিল। তিনি শেষ অবধি খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে বিবাহের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে এবং মিশনারী সহায়তায় বিলাত গমনের দ্বারা জ্ঞানবৃদ্ধির সাহায্যে ইংরেজ কবিদিগের সমপর্যায়ের কবিত্ব খ্যাতিসম্পন্ন হইবার পথ বাছিয়া লইলেন। ইহার পর হিন্দুকলেজ ত্যাগ করিয়া তাহাকে বিশপস্ কলেজে ১৮৪৪ সালের নভেম্বর মাস হইতে ১৮৪৭ সালের শেষ অবধি ছাত্ররূপে দেখা যায়। এখানে তিনি গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। মাসিক প্রায় ৬০্ টাকা খরচ তাঁহার পিতাই যোগাইতেন। কিন্তু ১৮৪৭ সালে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁহার অদ্ভুত পোষাকের জন্য বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং পিতাও কোন কারণে বিরক্ত হইয়া তাহাকে অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া দেন।

১৮৪৮ মাদ্রাজে শিক্ষকতা করিতে করিতে এক ইংরেজ নীলকর কন্যাকে বিবাহ করেন। আয় পর্যাপ্ত না হওয়ায় সাংসারিক প্রয়োজনে তিনি কয়েকটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৫১ সনে তিনি 'Hindu Chronicle'—প্রকাশ ও সম্পাদনাও করেন। ১৮৪৮-৪৯ সনে 'Madras Circulator'-পত্রে মধুসূদনের 'A vision', 'Captive Ladie' ও অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। পিতৃবিয়োগের পর তিনি কলিকাতায় বিভিন্ন সরকারী কর্মে নিযুক্ত হন। তাঁহার মাতৃভাষা সেবা ও স্বদেশ সেবা এই সঙ্গে চলিতে থাকে। পরিণতিতে ব্যারিষ্টার হন, বিলাত গমন করেন, আপন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঋণ পরিশোধ করেন। হেনরিয়েটাকে বিবাহ করিয়া তিনি ভারতীয় নারীদিগের আদর্শ রূপটিরই সাক্ষাত পান। শেষ অবধি ১৮৬৫ সনে ভার্সাই অবস্থান কালে চতুর্দশ পদী কবিতা রচনাকালে বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখিলেন,

"I should scorn the pretensions of that man to be called "educated" who is not master of his own language."

মেঘনাদবধ কাব্য ১ম খণ্ডে প্রকাশিত হইলে, ১২-২-১৮৬১ সনে বিদ্যোৎসাহিনী সভায় কালীপ্রসন্ন সিংহ সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া একখানি মানপত্র প্রদান করেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সমর্থিত হইবার সৌভাগ্য বোধ হয়, মধুসূদনই প্রথম পাইয়াছিলেন।

১৮৭১ সনে ঢাকাবাসীগণ তাঁহাকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন। ২২-৯-১৮৭১ 'এডুকেশন গেজেটে' ঢাকার 'হিন্দু হিতৈষিণী' হইতে উদ্ধৃতি মাধ্যমে জানা যায়।'

"গত শনিবার ঢাকায় জ্ঞানকরী সভায় বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ের আন্দোলন হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় মনুবচনে বহু বিবাহের ব্যবস্থার স্থূল উল্লেখ করিয়াছিলেন। তথায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়া

দুঃখিত হইলাম, দত্তজ মহাশয় মন্বাদি শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া তাহা বুড়িগঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।''১৭০

সামাজিক কর্তব্য সাধনে তিনি হিন্দু কলেজের ঐতিহ্যবাহীদিগের অনুসারী। তিনি ধর্মত্যাগ করিয়াও স্বাদেশিক। ইংরাজি ভাষার সাধনা করিয়াও 'বঙ্গ ভাষার আদি কবি' এবং রেনেঁসার বাণীস্বরূপ স্রষ্টা।

তাহার ব্যক্তিত্বের মৌল উপাদানে বাঙালীত্বের মূল ছিল অতি গভীরে প্রোথিত। তিনি ঢাকায় বলিয়াছিলেন, "আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আরো, আমি শুধু বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটী যশোহর।"১৪১

উনবিংশ শতাব্দীর নাগরিক বাংলায় চলিয়াছিল অত্যুগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগ। ডিরোজিও বিদ্যাসাগর রামমোহনের ন্যায় কালজয়ী পৌরুষের মধ্যেই সেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের রূপটি প্রোজ্জ্বল হইয়াছিল এমন নয়—হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে তাহা আরও প্রখর হইয়াছিল। তাহারা বিদ্রোহী! কেবল ধর্ম বিদ্রোহী নয়, মর্মে বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহের আদর্শ চেতনা পুঞ্জিত হইয়াছিল সেকালের ইংরাজি শিক্ষিত বাংলার উগ্র অমিত বল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র-দম্ভের মর্মমূলে। আধুনিকতার এক উৎস সুস্থ বলিষ্ঠ জননিরপেক্ষ মানব বিশ্বাস। এই মানুষ ধর্ম, সংস্কার, পরিবার, জাতি কোন কিছুরই পূর্ব সংস্কারকে দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার করিতে চাহে না। 'শিক্ষক ডিরোজিওর প্রভাব পুষ্ট মনে ঈশ্বর বিশ্বাসও অবশ্য বিচার্য। এই মানুষ নিজের মধ্যেই যেন মনুষ্যত্বের অমেয় শক্তিকে আবিষ্কার করিয়াছে এবং যেন এই শক্তিই তাহার নিকট অমোঘ সত্য। এই মানব শক্তির মর্যাদা রক্ষায় সর্বস্ব পণ করিতেও কুণ্ঠিত নয় এবং মর্যাদা রক্ষায় অপারগ হইয়া সর্বস্বের অধিক বিসর্জন দিতেও পরাঙ্মুখ নয়। তাই পরাজিত হইয়াও রাবণ পরাভব মানে নাই। সবংশে মরিয়াছে, তবুও শক্তিহীনতার দুর্বলতা স্বীকার করে নাই। ইহা যেন বহুলাংশে ইয়ংবেঙ্গলের আলেখ্য। তাই ইয়ংবেঙ্গল ও মধুসূদনের ন্যায় রাবণ কেবল 'গ্র্যাণ্ড' নয় 'ট্রাজিক'ও।

আধুনিক যুগের দ্রুত অগ্রগতির সহিত তাল রাখিয়া বাংলা সাহিত্যের বন্ধন মুক্তি হইল মাইকেল মধুসূদনের হাতে এবং বাংলা সাহিত্যের আমূল পরিবর্তনের পথও প্রশস্ত হইল। মধুসূদনই ক্রমে বাংলায় চতুর্দশপদাবলী কবিতা সৃষ্টি করিলেন। প্রহসনে সেকালের সমস্যা অতি ঘরোয়া ভাবে পরিবেশনের দ্বারা নাটকের পরিবর্তন আনিলেন। কথ্য ভাষার সুষ্ঠু প্রচলনে নাটক হইল সর্বসাধারণের। গদ্যেরও হইল আমূল পরিবর্তন। অর্থাৎ দেশ, কাল ও ব্যক্তির পরিবর্তনে আধুনিকতার মূর্ত রূপটি বাংলা সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম সার্থক সচেতন শিল্পীর ন্যায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সহস্র বৎসরের ব্যবধান ঘুচাইয়া আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের প্রশস্ত রাজপথে দ্বিধা ভয় মুক্ত হইয়া দৃঢ় সাবলীল পদক্ষেপ করিতে শিখাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দু কলেজীয় ও ইয়ংবেঙ্গলের বিভিন্নমুখী প্রভাব

ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের ইচ্ছায় ভারতের কৌলিক এবং সাম্প্রদায়িক শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় মাদ্রাসা ও কাশীতে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়। এই ব্যবস্থায় হিন্দুগণ তাহাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে সঙ্কুচিত, এবং মুসলমানগণ তাহাদের মধ্যযুগীয় ইসলামিক জ্ঞানচর্চার মধ্যে নিমজ্জিত থাকিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক হইতে ইংরাজ স্বার্থ কৌশলে তাহাদের দূরে সরাইয়া রাখিতে সচেষ্ট হইল। কিন্তু ১৮১৩ সালেও নূতন চার্টারের শর্ত অনুসারে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যৎকিঞ্চিৎ অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইল এবং মিশনারীদিগের ভারতে আসা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইল। অর্থাৎ পাশ্চাত্য ধর্ম প্রচার ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রসারের পথ কোম্পানির অনিচ্ছা সত্ত্বে উন্মুক্ত হইল। পূর্বের অধ্যায়গুলিতে ইহার নানা প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনায় নব সংস্কৃতির প্রবর্তকদিগের আবির্ভাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

নব সংস্কৃতির প্রবর্তকদিগের পূর্ব পুরাতন সমাজ মানস, পুরাতন সমাজিক শ্রেণীগুলির ন্যায় নূতনের আঘাত অনুভব করিয়াছিল। সে সমাজ সংস্থায় ব্যক্তির স্থান ছিল নিতান্তই গৌণ। পরিবারকে সমাজ কাঠামোর সর্বনিম্ন অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিয়া পরিবারের সদস্যদিগের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ সর্বাংশে পরিবার কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত হইত এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ অন্য-নিরপেক্ষ সেই সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্ক সর্ববিষয়ে ছিল সমাজের বিধানে সুনির্দিষ্ট। সর্বোপরি ছিল কর্মপ্রসার অনুশাসন। বর্ণভেদ, যুক্তিভেদ, স্বতন্ত্র সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বিধি বর্ণ এবং গ্রাম্য গোষ্ঠীসমাজ-বিধানের সহিত পূর্ণ সঙ্গতি স্থাপন করিয়াই ব্যক্তির মানস পরিমণ্ডল গঠিত হইত। স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি ছিল অচল। পরিবেশকে জয় করিবার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হইবার চেতনা অনুপস্থিত ছিল। পরিবর্তে বরং ছিল পরাভবের নিঃসঙ্কোচ স্বীকৃতি। অর্থাৎ তৎকালীন সমাজ মানস ছিল সর্বাংশেই আচ্ছন্ন। কুসংস্কার, নিরন্তর পরাভব চেতনা, প্রাকৃতিক শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ, যুগান্তবিস্তৃত বিধিব্যবস্থার নিকট প্রশ্নহীন আত্মবিক্রয় ব্যক্তি মানসকে সর্বপ্রকার আত্মচেতনা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। সেই পরিবেশে স্বৈরাচার স্বাভাবিক; কেবল রাষ্ট্রিক শাসন ব্যবস্থায় নয়, ভাবাদর্শেও। সমাজ মানস ছিল সর্বপ্রকার গতিশীল সৃষ্টিধর্মী গুণবর্জিত কার্যকারণ সম্পর্কের চেতনাহীন যুক্তিবিমুখ।

তদনীন্তন অবস্থায় জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্ভব ছিল না। সমস্ত দিক হইতে অগ্রগমনের সম্ভাবনা মুক্ত হইয়া সমকালীন দেশীয় সমাজ বহুবিধ সামাজিক ব্যভি—

চারাক্রান্ত হইয়া আত্মক্ষয় করিয়া চলিয়াছিল। দৃঢ় নৈতিক চরিত্র অপেক্ষা শ্লথ চারিত্রিক বিচারকেই সামাজিক পদমর্যাদা অর্জনের মাপকাঠি বলিয়া গণ্য করা হইত। পারমার্থিক কল্যাণের বিধায়কদিগের মধ্যেও দুর্নীতির প্রসার ছিল ব্যাপক। ধোপা, নাপিত, বৈষ্ণব, মালি, কামার, এমনকি মুসলমান কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করাতেও কুলীনদিগের কৌলীন্য ম্লান হইত না অথবা তাহাতেও তাহারা জাতিভ্রষ্ট হইত না। সমাজের বিধান-দাতাদিগের পক্ষে এইরূপ ব্যাভিচারে লিপ্ত হইতে বাধা ছিল না। ধর্মবোধ, পরমার্থিক ক্রিয়াকলাপ, আচার অনুষ্ঠানের রুচি ও পদ্ধতি নিতান্ত বিকৃত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও আত্মনিগ্রহ পরায়ণ ছিল।

নব সংস্কৃতির প্রবর্তকগণ এইরূপ অচল সামাজিক আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। পূর্বতন সমাজ ও সামাজিক ক্রিয়াপ্রকরণ সৃষ্টিশীল মানসের সম্মুখে যে বিরাট অচলায়তন সৃষ্টি করিয়া সমাজের গতিবেগ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা অস্বীকৃতির মধ্যে নিঃসন্দেহে যুক্তি, বলিষ্ঠতা এবং সৃষ্টিধর্মী প্রেরণা রহিয়াছে। অস্বীকৃতিতেই তাহার গৌরব, প্রতিষ্ঠায় দুর্বল হইলেও দেশীয় সমাজের ধর্ম ও বিধান অস্বীকার ও বর্জনের দ্বারা নূতন শ্রেণীর সমাজ-ধর্ম অনেকাংশেই নেতিধর্মী হইয়াছিল। স্বাভাবিক স্বীকৃতির অভাবে যেন জোর করিয়া সামাজিক স্থিতিলাভ ও তাহাদের আবির্ভাবের সামাজিক ফাঁক ভরাটের চেষ্টা তাঁহাদের মধ্যে দেখা দেয়। নব সমাজ-বিন্যাসে বর্ণভেদে বৃত্তিভেদ নীতির পরিবর্তে বর্ণ নিরপেক্ষ সুস্পষ্ট অর্থ-নৈতিক শ্রেণীর বিকাশ শুরু হওয়ায় সামাজিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রূপ বদলাইতে থাকে। পরিবারের স্থানে ব্যক্তির আবির্ভাব হয় এবং ব্যক্তির আচরণেও পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে। ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে ব্যক্তিমননের এই অবাধ স্বাধীনতার প্রচেষ্টার স্বাক্ষব স্পষ্ট হয়। কৌলীন্য—অকৌলীন্য প্রথা বিসর্জন দিয়া বর্ণ হিন্দুদিগের বর্ণ বিগর্হিত বৃত্তি গ্রহণের মধ্যে ওই চেতনার বাস্তব প্রকাশ। পূর্বতন সামাজিক বিধিনিষেধ অবজ্ঞাত হওয়ায় জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে, তদৃচ্ছ ভাবে, যে কোন পরিস্থিতে প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে ব্যক্তির আর কোন বাধা রহিল না। শুধু নাগরিক সমাজেই নয়, পল্লী সমাজেও এই প্রভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। "এক্ষণে সকলেই স্বাধীনভাবে কিছু কিছু উপার্জন করিয়া থাকে, কেহ কাহারও অধীন বা বশবর্তী নয়। সুতরাং কেহ কাহারও শাসনানুগত নহে।"[১]

আত্মনির্ভর ব্যক্তিমনের বিস্তৃতির সহিত সমাজ মানসও বিস্তৃতি লাভ করিয়া পূর্বের সংকীর্ণ গ্রামীণ অবরুদ্ধ দৃষ্টিকোণ ক্রমে ব্যাপকতর, দেশকালের বন্ধনমুক্ত উদার হইয়াছে। সমসাময়িক সাময়িকপত্রে ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা ১৮৩০ সালে লিখিতেছে যে পূর্বে তাহারা যখন বিদেশের সংবাদ প্রকাশ করিত, তখন পাঠকদের নিকট হইতে তিরস্কার পূর্ণ পত্র আসিত, কিন্তু এখন কলিকাতার সংবাদপত্রে পরিবেশিত বিদেশী সংবাদ সাদরে গৃহীত হইতেছে।[২] শিক্ষিতের দৃষ্টিকোণের এই উদারতা ও ব্যাপকতা স্পষ্ট হইয়াছে।

ইহা যুক্তিসঙ্গত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সমাজ কাঠামোর রূপায়ণে প্রেরণা যোগাইয়াছে। যুক্তিবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করাই হইল কাম্য। যুগযুগান্তর ধরিয়া যাহা চলিয়া আসিতেছে, যাহা অমোঘ শাস্ত্রবচন বলিয়া কথিত, তাহার নিকট আর আত্মসমর্পণ নয়। যুক্তিবাদের মানদণ্ডে যদি তাহার যথার্থ ব্যবহারিক সার্থকতা ও কার্যকারিতা প্রকাশিত হয় তবেই তাহা গ্রাহ্য। এই বিচার ও অনুসন্ধান পদ্ধতি ইয়ংবেঙ্গলদিগের প্রত্যেকের মধ্যেই অল্পবিস্তর ছিল এবং সমসাময়িক যুগে ইহার প্রভাব ক্রমে অপরাপর ইংরাজি শিক্ষিতদিগের উপরও বিস্তৃত হয়। এই দৃষ্টিমার্গের বিকাশ সমাজ মানসের বিবর্তনে বৈপ্লবিক। কারণ, এই দৃষ্টি হইতে সমাজ, সামাজিক বিন্যাস, সমাজের অন্তর্নিহিত বিধি ব্যবস্থা ইত্যাদি নব আলোকে প্রতিভাত হইয়া ক্রমে পুরাতনকেও নূতনভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া মানুষ ভবিষ্যৎকে নূতনভাবে সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হয়।

এই পুনরুজ্জীবনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ভারতের নব সংস্কৃতির নির্মাতাগণ অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীর হিন্দু। পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে ধর্মভীত প্রেমবোধ ও বাস্তববোধের বিকাশের পক্ষে সেকালীন সমাজ পরিবেশ প্রশস্ত ছিল না। এই বৈচিত্র সত্ত্বেও এবং নব সংস্কৃতির প্রবর্তক ইয়ংবেঙ্গলদের সামাজিক ভিত্তি ফাঁকা হইলেও তাহাদের সর্বগ্রাসী সৃষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে শুভ ভবিষ্যতের সূচনা হইতেছিল। এই সৃষ্টি চেতনা হইতেই তাঁহাদের মাত্রাহীন প্রাণময়তা ভবিষ্যৎকে ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করিয়াছিল। তাঁহাদেরই অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমৃদ্ধির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় অন্যান্য শ্রেণী ও সমৃদ্ধির কিঞ্চিৎ স্পর্শ লাভ করিয়াছিল এবং জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবে বর্ধিষ্ণু বণিকশ্রেণীর সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জিগির সামন্ত প্রথার ধ্বংস করিয়া জনসাধারণকেও মুক্ত করিয়া তাহাদের মানব স্বীকৃতি দিয়াছিল। সেইরূপ সামাজিক বা নাগরিক অধিকার, সমাজ বিন্যাসের ভিত্তি, রাষ্ট্রীয় আদর্শ, ধর্মাচরণের যৌক্তিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা এবং ব্যবহারিক সুবিধা আমাদের আন্দোলন প্রধানত মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থ সম্পর্কিত হইলেও পরোক্ষে ক্রমে সমাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল যে ইহার সৃষ্টিধর্মী প্রভাব জনজীবনেও অনুসৃত হয়। ধর্মীয় সংস্কার, শিক্ষার বিস্তার, সামাজিক রীতি নীতি সংস্কার ইত্যাদি সংস্কারের মধ্যদিয়া ভারতীয় সমাজ ভবিষ্যতের পথে পদক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। ফলে ভারতীয় মানসে বিশ্বমানসের বিচিত্র ঐশ্বর্য নূতন সম্ভাবনা লইয়া আন্দোলিত হইতে থাকে।

ধর্ম

বাংলাদেশে "১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাঙালীদের মধ্যে কৃষ্ণ পাল নামে এক ছুতার সর্বপ্রথম স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীস্টধর্ম বরণ করেন।"[৩] অথচ ভারতীয়গণ

ইউরোপীয়দিগের প্রভাব সংস্পর্শে আসিয়াছে ১৫৫ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে; হিন্দু ধর্ম জলাঞ্জলি দিবার প্রবণতা দেখা দেয় নাই। কারণ মুসলমান নবাবী আমলে শাসনযন্ত্র ছিল কর আদায়ী মাত্র। সময়ানুসারে কর দিলে জমিদার বা খাস প্রজার ব্যক্তিগত জীবন শাসনযন্ত্রের আওতায় আনিবার কোন শাসনতান্ত্রিক ইচ্ছা তাহাদের ছিল না। ব্যক্তিগত ধর্মান্ধতাজনিত রাজকীয় অত্যাচারের কথা অবশ্য এই প্রসঙ্গে ধরা হয় নাই। বিদ্যা ছিল প্রধানত ধর্মশাস্ত্রাশ্রয়ী। দেবদেবী বাস্তবগ্রাহ্য কল্পনা মাত্র ছিল না। মঙ্গলকাব্যেও তাহার যথেষ্ট উল্লেখ আছে।

ধর্ম ছিল মানুষের জীবনে মধ্যমণি। পারিবারিক জীবন একান্নবর্তী এবং ইহার উত্তরাধিকার পিণ্ডদানের সহিত গ্রথিত। পুরুষের বিবাহ একান্ত প্রয়োজন; কারণ পুত্রই পিণ্ডদানের প্রথম অধিকারী। ইংরেজ আগমনের প্রাক্কালে পুরুষের বহুবিবাহ ও নারীর পক্ষে অচ্ছেদ্য-বিবাহ প্রচলিত রীতি। স্বামী নারীর একমাত্র উপাস্য দেবতা সুতরাং নারী জন্ম বৃথা, স্বামী অবর্তমানে হয় সহমরণ, অন্যথায় পরজীবনের আশা করিয়া আজীবন বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করা। সুতরাং পদে পদে অনাচার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে চলিত। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সব ধর্ম মতাবলম্বীদের মধ্যে অনাচার থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি ও জাতিতে বিধর্মীর হাত হইতে আচরণগত ভাবে রক্ষায় ব্যবস্থা করাই ছিল প্রধন লক্ষ্য, ফলে আসিল ন্যায় তর্কের প্রাধান্যে কূর্মবৃত্তি। স্মৃতির বিধান সমস্যার ধর্মগত সমাধানে ব্যস্ত। সুতরাং প্রয়োজন হ'চ্ছে নিত্য চুলচেরা বিচার, নিত্য নব নব বিশ্লেষণ ও নব নব বাধার আরোপে ব্যক্তি ও জাতিগতভাবে বাঁচিয়া থাকিবার প্রচেষ্টা। অবশ্য ধর্মবিশ্বাসে ইসলামীয় একেশ্বরবাদ ও হিন্দুর আচরণগত বহু দেবতাবাদে দ্বন্দ্ব আসিলেও কবীর, নানক, প্রভৃতির প্রভাবে বহুর পশ্চাতে একেশ্বরের অস্তিত্বের প্রচারে বিরোধ বিশেষ তীব্র হইতে পারে নাই। বিশেষত হিন্দুর বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ ইত্যাদির এবং কোরাণের অপৌরুষেয়ত্ব প্রচলিত থাকায় এবং দুই ধর্মেই ঈশ্বর সাক্ষাতকার নিত্য বলিয়া মানিয়া লওয়ায় হিন্দুর পরিবর্তন বিশেষ হইতে পারে নাই। তদুপরি বিভূতি সম্পন্নদিগের প্রতি শ্রদ্ধা থাকায় এবং তাঁহাদেরও সমাজের পরিবর্তনের বিশেষ চেষ্টা না থাকায় জন্মান্তরবাদ হন সাধারণকে পরজন্মের সুখের আশাদিয়া ইহজন্মের দুঃখের তীব্রতায় বিদ্রোহী হইতে দেয় নাই। কারণ দুঃখ বোধও হইয়াছিল মোহনীয়। হিন্দু মুসলমান ছিল আপ্তাশ্রয়ী। অর্থাৎ বেদ কোরাণ তাঁহাদের শেষ কথা। আর এই সুযোগে নব্যন্যায়ের যুক্তিজালে শাস্ত্র হইয়াছিল বিভীষিকার স্থল। মুসলমাণের আত্মরক্ষার্থে হিন্দুর স্মার্ত বিধিনিষেধ বাড়িয়াই চলে।" অবিনাশী সৎ আস্থা, 'জীব ব্রহ্ম' ইত্যাদির ব্যাখ্যায় ব্যবহারিক জীবনে পার্থক্য বজায় রাখিয়াও একাত্মতার বিশ্বাস প্রচারিত হইতে থাকে।

"স্মৃতের্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবোধে পরিত্যজেৎ।"[৪]

"বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য, সেইরূপ স্মৃতির বিপরীতহইলে দেশাচারকে অগ্রাহ্য করিতে হইবেক।"

হঠাৎ শুনিলে মনে হয় সমাধান বুঝিবা অতি অল্পয়াসসাধ্য। কিন্তু আজও সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত সম্পূর্ণ হইয়াছে কিনা বলা দায়। কারণ, বিভিন্নস্থানে বহু পুঁথি প্রচলিত এবং সবই বেদ হইতে প্রাণবায়ু সংগ্রহ করে বলিয়াই শাস্ত্রবিদদিগের দাবী। সুতরাং এই বিরোধ নিষ্পত্তি করণচেষ্টা পণ্ডিতদিগের সৃষ্ট এক বিরাট গোলকধাঁধায় সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। এবং এই সকল ধর্মাধিকরণের ধর্মাচরণে বিকৃতিও চরম হইয়াছিল।

হিন্দু ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রপিতামহ বলিয়াছিলেন,

"যাবন্মেরৌ স্থিতা দেবা, যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে,
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবত্, তাবদ্বিপ্রকুলে বয়ম্।"[৫]

অর্থাৎ দেবগণ যতদিন মেরুতে আছেন, গঙ্গা যতদিন পৃথিবীতে আছেন, ততদিন আমরা ব্রাহ্মণ কুলে আছি।'

সমাজে এইরূপ অন্ধ-বিশ্বাস-নির্ভর চিন্তাধারায় প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও ইংরেজদিগের সাহচর্যে সমাজজীবনে অর্থনীতির পরিবর্তনের প্রাবল্য সমাজ মানসেই ভাঙন ধরাইয়াছিল। রামরাম বসু মিশনারীদিগের ধর্মপ্রচারে নানা পুস্তক লিখিয়া সহায়তা করিয়া আর্থিক উন্নতি সাধন করিয়াও ধর্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসে যে ভাঙন ধরিয়াছিল এবং ক্রমে খ্রীস্টান প্রাধান্যে হিন্দু বহু দেবদেবত্ববাদ হইতে অনেকাংশেই মুক্ত হইয়া তিনি একেশ্বরবাদের দিকে ঝুকিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট।[৬]

কলিকাতার অবস্থানের পর ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে রামমোহন রায় আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মসম্বন্ধীয় একেশ্বরবাদী ধর্মমূলক আলোচনার সূত্রে হিন্দু ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণের বাদানুবাদ ও অপরপক্ষে মিশনারীগণের যীশুর অবতারবাদ ও ত্রিতত্ত্ববাদীদের বিশ্বাসের সমালোচনা চালাইয়া যান। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে 'প্রিসেপ্টস অব জেসাস দি গাইড টু পিস অ্যাণ্ড হ্যাপিনেস' লিখিয়া তদনীন্তন বাংলাদেশে ধর্ম সম্বন্ধীয় বাদানুবাদের ঝড় বহাইয়াছেন। উইলিয়াম এ্যাডম নামে একজন ব্যাপটিস্ট পাদরী রামমোহনের প্রভাবে একেশ্বরবাদী হওয়াতে খ্রীস্টানদের দ্বারা 'সেকেণ্ড ফল অব অ্যাডাম' বলিয়া ধিকৃত হন। ১৮২১ সালে 'ইউনি টারিয়ান সভা স্থাপিত হয়। 'আত্মীয় সভায়' প্রকাশ্যরূপে সাধারণের জন্য ছিল না।[৭] তথাপি এই সভায় ধর্ম সম্পর্কিত সকল বিষয়ই আলোচিত হইত বলিয়া ধর্ম লইয়া বাদানুবাদের মাত্রা বাড়িয়া যায়।

সর্বসাধারণের জন্য এই সভাগুলি না হইলেও মিশনারী, বিত্তবান ও সমাজপতিদিগের মধ্যে সাড়া জাগাইয়াছিল। অবশ্য এই সভাগুলি স্বল্পায়ু হইয়াছিল। ১৮১৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ (২০-৮-১৮১৮) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সম্পাদক হন

হিন্দুকলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও ভবিষ্যৎ ইয়ংবেঙ্গলদিগের অন্যতম নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তী। একেশ্বরের উপাসনার মাধ্যমে, হিন্দুদের পৌত্তলিকার অবসান ও সমাজ সংস্কারই ছিল রামমোহনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তথাপি তিনি স্বয়ং উপবীত ত্যাগ করিতে পারেন নাই। হিন্দু সংস্কারও অনেকাংশেই সেই সমাজে ছিল। হিন্দু-কলেজের অপর ছাত্র এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, "তখন সূর্য অস্ত হইবার কিছু পূর্বে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সমাজের পার্শ্ব-গৃহে উপনিষদ পাঠ করিতেন সেখানে কেবল রামমোহন রায়, বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে পারিতেন, শূদ্রদিগের সেখানে যাইবার অধিকার ছিল না। সূর্য অস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও উৎসবানন্দ গোস্বামী সমাজের ঘরে আসিয়া বেদীতে বসিতেন। উৎসবানন্দ উপনিষদ ব্যাখ্যা করিতেন এবং কখন যখন বেদান্ত দর্শনেরও ব্যাখ্যা করিতেন। সঙ্গীত হইয়া সেই সমাজ ভঙ্গ হইত। সেই সমাজের, মধ্যে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খৃস্টান, মুসলমান সকলেরই সমান অধিকার ছিল।"[৮] দেবেন্দ্রনাথ বহু সংস্কার না ছাড়িতে পারিলেও ক্রমে বেদপাঠের পরিবর্তন করিয়াছিলেন। রামমোহনের আভিজাত্যের জন্য তাঁহার প্রভাব সাধারণে স্পষ্ট না হইলেও হিন্দু কলেজ ছাত্রদিগের উপর কিঞ্চিৎ পড়িয়াছিল। এই সময়ই প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী সভার সক্রিয় পোষক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি দলিলকে, যাহা রামমোহন লিখিয়া যান,' তাহার সারমর্ম হইতে স্পষ্ট হয় যে 'অসাম্প্রদায়িকভাবে একমাত্র উপাস্য পরমেশ্বরের শ্রদ্ধায় উপাসনার জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বসাধারণের জন্য মূর্তি-চিত্র হীন মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। অহিংসা, পান ভোজন হীন, সাম্প্রদায়িক বিদ্রূপ হীন ধ্যান ধারণার মাধ্যমে প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতির দ্বারা সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনার্থে উপদেশ দান, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে। অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গি বহুলাংশে আন্তরিকভাবে আচরিত না হইলেও হিন্দু কলেজীয়দিগকে ইহার আধুনিক মানবমুখীনতার জন্য আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহারা রক্ষণশীলদিগের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ও প্রসারতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাই ইয়ংবেঙ্গলগোষ্ঠী রক্ষণশীলদের প্রতি ছিলেন অধিক কঠোর। ইয়ংবেঙ্গলদিগের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব অন্যান্য নানা বিষয়ের ন্যায় ধর্ম সম্বন্ধেও তাহাদিগকে করিয়াছিল সম্পূর্ণ অনুভূতি ও উপলব্ধির বশ। ভাবে ও আচরিত কর্মজীবনে মুক্তির ভারসাম্য না থাকিলে তাহা অসদাচরণ বলিয়াই গণ্য হইত। সর্বপ্রকার বৈসাদৃশ্যেরই বিরোধী ছিলেন তাঁহারা। রামমোহনের বৈসাদৃশ্যও তাহারা হজম করিতে নারাজ ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্বন্ধে ইয়ংবেঙ্গলদল ছাত্রাবস্থাতেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মমতে নীতিগভাবে পৌত্তলিকতা বর্জন করিয়াও

স্বগৃহে ও পরিবারে ঠিক পৌত্তলিকদের মতই আচরণ করিয়া দুর্গাপূজা ধুমধামের সহিত করিতেন। এনকোয়ারার পত্রিকায় সেই প্রসঙ্গে তীব্র সমালোচনা হয়। ডিরোজিও স্বয়ং 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' পত্রিকায় আলোচনা করিয়া প্রসন্নকুমারের এই দ্বিচারীবৃত্তির নিন্দা করেন।[১০] আসলে সকল প্রকার অন্ধতারই বিরুদ্ধে ছিলেন এই নব্যগোষ্ঠী। এই দেশে ধর্মান্ধতাই যে সব দুঃখের কারণ তাহা বুঝিতে পারিয়াই তাঁহারা ধর্মের নৈতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া মানবধর্মী; কিন্তু ঈশ্বর মাহাত্ম্য বা আলৌকিকতায় সন্দিগ্ধ। ইহাদের নিকট ইহ জীবনে মানুষই ঈশ্বর', মানুষই তাহার সর্বময় প্রভু এবং মানব চিন্তাই ঈশ্বরচিন্তার নামান্তর। মানুষের উপর বড় সত্য পৃথিবীতে কিছু নাই।

হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ বিশেষত ইয়ংবেঙ্গলগণ বাংলার প্রথম বুদ্ধিজীবিগোষ্ঠী। প্রত্যেক সমাজে এমন কিছু সামাজিক গোষ্ঠীর লোক থাকেন যাহাদের বিশেষ কাজ সেই সমাজের মানুষের নিকট বাহিরের জগতের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করা। ইহারাই বুদ্ধিজীবী। ইয়ংবেঙ্গলগণ এই কর্ম সমাধা করিযাছেন বাংলাদেশে। তাহারা যেন সমাজে নিজেদের বিশেষ দায়িত্বের সম্বন্ধে সচেতন এবং সেই জন্যই সর্বপ্রথম এক বৈপ্লবিক ধারা প্রবর্তনের জন্য সংগ্রাম করেন। তাহাদের বিরোধী ডঃ ডাফও ১৮৩০ সালে হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের সম্বন্ধে বলিযাছেন, "তাঁহারা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিতে সক্ষম।[১১] ইহাদের প্রভাবেই একদিন সমগ্র ভারতবর্ষের চিন্তানায়কের দাযিত্ব আসিয়াছিল বাঙালীর স্কন্ধে।[১২] নূতন সামাজিক অবস্থায় এই বুদ্ধিজীবী ইয়ংবেঙ্গলগোষ্ঠী ধর্ম সম্বন্ধেও রামমোহনের আংশিক প্রাগসরতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। ইহাদের দৃষ্টিতে ধর্ম সম্পূর্ণভাবে অনুভূতি ও উপলব্ধির বস্তু এবং আধুনিক যুক্তিনির্ভর। যুগপ্রয়োজনে মানুষের প্রতিষ্ঠায় যদি তাহা প্রয়োজন বলিয়া সিদ্ধ হয় তাহা হইলে গ্রাহ্য, নতুবা তাহা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য। ব্যক্তি আর সমাজপতিদিগের রক্তচক্ষুর দাস হইয়া থাকিতে পারে না, তাঁহার স্বাধীনভাবে বাঁচিবার সুযোগ এই যুগে আসিয়াছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া মুক্ত নাগরিক ব্যক্তি, সুতরাং পর-নির্ভর হইয়া থাকিবে কেন? তাই পিতার মৃত্যুর পর সমাজপতিগণ যখন মৃতদেহ সংকারের সর্ত রাখিল —'হয় রামগোপাল ঘোষকে আপন নব্য বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে, নয়তো পিতার মৃতদেহ সংকার হইবে না—এবং ফলে সমাজচ্যুত হইয়া পরকালেও নরকবাসী হইবে', তখন ইয়ংবেঙ্গল নেতা রামগোপাল ঘোষ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ, অশ্রুপাত সত্ত্বেও আপন বুদ্ধিনির্ভর আধুনিক চিন্তাধারা হইতে বিচ্যুত হন নাই। ক্রমে দেখা গেল সমাজ আর উদ্যমশীল ব্যক্তির নিয়ন্ত্রক নয়। হিন্দু সমাজের চিরাচরিত আচার ব্যবহার রীতিনীতি, প্রথা সংস্কার ঐতিহ্য প্রভৃতির প্রতি ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষত অন্ধ আচরণের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে

ধর্মের প্রতি উপেক্ষা কতদূর হইয়াছিল তাহার নিদর্শন তদানীন্তন কালের সাময়িক পত্রেই দেখা যায়,

"শিক্ষিত দলের মধ্যে অনেকে যে ধর্মের প্রতি উদাসীন্য অবলম্বন করিয়া আছেন তাহা একবিধ কারণে নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, প্রচলিত ধর্মই তাঁহাদের উন্নত অবস্থার উপযুক্ত নহে। অনেকে ধর্মের নাম অত্যন্ত বিবাদাস্পদ দেখিয়া সমাজের শান্তিভঙ্গের ভয়ে উদাসীন্য অবলম্বন করেন। কেহ কেহ ধর্মের অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে অনেকের নিকট এদেশের ধর্মসংস্কার বিষয়ে আশানুরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না।[১৩]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এই মন্তব্য স্পষ্টই ধর্ম সম্পর্কে নব যুগের পথীকৃতদিগের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছে। ধর্ম সম্পর্কে সোমপ্রকাশ তাই লিখিয়াছে, "উপধর্ম দূষিত হিন্দুসমাজের নানা দোষ ইহাদিগের বিষম নয়নপথে উপনীত হইতেছে। ইহারা সেগুলির নিকট মস্তক নত করিতে পারিতেছেন না।"[১৪] ফলে ইহাদের প্রভাবে বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে ও মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা কেবলমাত্র ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, তাহা সম্ভবত নয়। কারণ ব্যক্তিমানস স্বভাবতই আধুনিকতার স্বাতন্ত্রধর্মী মানবনির্ভর ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাইতেছে এই পরিবর্তনে। তাই সেই প্রভাব সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যেও দৃঢ়ভাবে সংক্রামিত হইল। তাঁহারা স্বয়ং প্রগতির জন্য অগ্রসর হইলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অনেকেই ইয়ংবেঙ্গলদিগের আন্দোলন সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া নিজেরাও উদ্যোগী হইলেন।

ইয়ংবেঙ্গলগণ কিন্তু ১৮২৭-২৮ সালেই 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা কবিয়া ধার্মিক, সামাজিক প্রভৃতি সর্ববিষয়ে সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহারা যুক্তিবাদী এবং সন্দেহাকুল। তাই ইয়ংবেঙ্গলদের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মগণ 'মডারেট' ও 'হাফলিবারেল'। ইহারা খ্রীষ্টান, হিন্দু, ব্রাহ্মবাদী সকল ধর্মীয় মতবাদীদিগের অক্ষমতাকেই উপহাস বিদ্রূপ করিতেন। ইহা খ্রীস্টান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার আত্মচরিতেও লিখিয়াছেন।[১৫]

সুপ্রিমকোর্টে এক হত্যার মামলায় ইয়ংবেঙ্গলগোষ্ঠীভুক্ত রসিককৃষ্ণ মল্লিক জুরি ছিলেন। তাঁহাকে গতানুতিক শপথ করাইতে গিয়া সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ তিনি গতানুগতিক প্রথায় গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ গ্রহণ না করিয়া বলেন 'আমি গঙ্গার পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না।' তিনি স্বয়ং আপন ইচ্ছামত বাক্যে শপথ গ্রহণ করিতে জজ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন।[১৬] তিনি এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আহারে গতানুগতিকতার সীমা লঙ্ঘন করায় রাজা রাধাকান্ত দেব কর্তৃক পটলডাঙ্গার স্কুল হইতে শিক্ষকতার কর্ম হারান। অথচ বর্তমানে আমরা জানি একদা গোমাংস ভক্ষণ হিন্দুধর্ম বিরোধী মনে করা হইত না। ইহাদিগের সর্ববিষয়ে

যুক্তির বশ হইবার প্রচেষ্টায় ধর্মপতি ও সমাজপতিদিগের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং সমাজে গতির সঞ্চার হয়। সমাজের বাঁধ ভাঙিতে থাকে। কিন্তু ইহাদের প্রভাবের ফল হইয়াছিল সুদূর প্রসারী। ইহাদের ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত ও উমাচরণ শেঠ মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বিশিষ্ট ছাত্র। উচ্চতম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এই ছাত্রগণ সর্বপ্রথম শবব্যবচ্ছেদ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দেন।[১৭] এবং ইহাতেই শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রসারতা আসে। বেথুন সাহেব ইহার রোমাঞ্চকর প্রভাবের কথা লিখিয়া গিয়াছেন।" মধুসূদন কিন্তু সবল দৃঢ় হস্তে ছুরিকা ধরিয়াছিল এবং ক্ষিপ্রগতিতে ইহা, মৃতদেহের বক্ষে বসাইয়া দিল। বাহিরের দর্শকগণ দম ফেলিয়া বাঁচিল, যেন তাহারা এক ভৌতিক ঘটনার চাপে পড়িয়াছিল। তাহাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছিল।"[১৮] দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্রের লেখাতেও তেমনি অন্ধ ধর্মভাবের যুক্তিসিদ্ধ পরিবর্তনের সন্ধান পাই, "জাহ্নবী তীরস্থ স্থানসমূহ অতিশয় অপবিত্র ছিল। জলের স্থলের বহুলোক তথায় নিরন্তর মলমূত্র ত্যাগ করিত। সেখানে দাঁড়াইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ও দর্শনেন্দ্রিয়ের যাতনার সীমা থাকিত না।...একদা কোন যোগে আত্মীয়গণের সহিত জগন্নাথের ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিলাম ; কিন্তু জলের অবস্থা দেখিয়া আমার স্নান করিতে কোনরূপেই প্রবৃত্তি হইল না। সেদিন আমাকে অস্নাত থাকিতে হইল।[১৯]

এই যুক্তিবাদী দৃষ্টিই আধুনিকতার স্পষ্ট স্বাক্ষর। তাই খ্রীস্টধর্ম হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন বিভেদ তাহাদের মধ্যে হয় নাই। ইয়ংবেঙ্গলদিগের মধ্যে কেহ কেহ খ্রীস্টান হইলেও ইয়ংবেঙ্গলেরা গোষ্ঠীর কর্তব্য হইতে কেহই জীবনে সরিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই। হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রক্ষণশীলগণ নিয়ম করিলেন, "কোন সভা সমিতিতে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা যোগদান করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ ধর্মসভায়।" কিন্তু কোন ফলই হইল না। শেষ অবধি তারুণ্যের উচ্ছৃঙ্খলতায় অপরের গৃহে গোমাংস নিক্ষেপের দোষে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় স্বয়ং দোষী না হইলেও গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহাকে সামাজিক অত্যাচারেই খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে হিন্দু সমাজের মধ্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১৮ বৎসরের কিশোর ইয়ংবেঙ্গলের কৃষ্ণমোহন আপনার বুদ্ধিজীবিগোষ্ঠীর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। তিনি তীব্র ভাষায় এনকোয়ারারে লিখিলেন,

"ধর্মের নামে কুসংস্কারের বেদীমূলে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে প্রস্তুত নই। আমাদের বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে এবং তাহা পরিত্যাগ করিতে রাজী নই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা ন্যায় ও সত্যের পথে চলিতেছি।...বিরুদ্ধ-বাদীরা যদি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া মারমুখী হন, তাঁহাদের আক্রমণ যদি আমরা প্রতিরোধ করিতে না পারি তাহা হইলে আমরা প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তবু আমরা সঙ্গত অধিকারের ক্ষেত্র হইতে এক ইঞ্চি সরিব না। আমরা হিন্দুধর্মের সংস্কারের কর্মে ব্রতী হইয়াছি। আমরা প্রগতির ভেরী বাজাইয়াছি।

আরও বাড়াইব। আমরা হিন্দুধর্মের সংস্কারেরও গোঁড়ামিকে আক্রমণ করিয়াছি, ভবিষ্যতে আরও করিব। যতদিন না আমরা জয়ী হইব ততদিন সকল নির্যাতন নীরবে সহ্য করিয়া আক্রমণ চালাইয়া যাইব।"

'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮) তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯) প্রভৃতিতে ক্রমে হিন্দুকলেজীয়দিগের ও নব্য শিক্ষিতদিগের সমাবেশ হয় ধর্ম ও কর্মের যোগসাধনের প্রয়াস আরও প্রসারিত করিবার জন্য। দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতিরাও ইয়ংবেঙ্গলদিগের সহিত বহুকর্মে সহযোগিতায় অগ্রসর হন। ইহারাও ক্রমে পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হন। তত্ত্বাবোধিনী পাঠশালা (১৮৪০) স্থাপিত হইলেও, কিন্তু যে সামাজিক পরিবর্তন আসিয়াছিল তাহাতে মধ্যবিত্তগণ আর ধর্মশিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন নাই। বাস্তব-মুখীন সমাজ ইহজগতের আকর্ষণই চায়। কিন্তু এই সামাজিক পরিবর্তনে ধর্ম-ভিত্তিক কোন সংস্থাই আর হিন্দুকলেজের মত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে নাই। ১৮৫৪ সাল অবধি ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শুধু ধর্ম লইয়া বিচার করিতে উৎসুক নয়। বরং হিন্দুরা কেন খ্রীস্টান হয় তাহার কারণ অনুসন্ধানী।

"তত্ত্ববিচারে কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া প্রচারকগণ মাথা ঘামায়, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাহা চিন্তনীয় বিষয় বলিয়া মনে করেন না। তাহা হইলে হিন্দুরা খ্রীস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় কেন? কারণ—কেহ যদি যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ প্রয়োগ অনুসন্ধান করিয়া খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা কঠিন হইত না। ধর্মান্তরের প্রধান কারণগুলি হইল—।১। গৃহকলহ, ।২। দারিদ্র্য, ।৩। দোষাকর দেশাচার, ।৪। কলঙ্ক ও নিগ্রহভয়।

ইয়ংবেঙ্গল উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মের মোহভঙ্গ করিয়া সমাজে গতিসঞ্চার করিরাছিলেন তাহারই ফলে শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর পরিবর্তন আসিয়াছে দ্রুত। তাহাদের চিন্তাধারার মূল কথা ধর্মীয় অন্ধতা ছিল না; ছিল মানুষের নিজের প্রতি বিশ্বাস। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে গতানুগতিক স্থির অনড় সিদ্ধান্তের পরিবর্তে সত্যের নব রূপ আবিষ্কার করিয়া দেশ ও কালের পরিবর্তনকে নূতন পৃথিবীর সহিত সমন্বিত করিয়া দেওয়াই ছিল তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই খ্রীস্টান হইয়াও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গোঁড়া হিন্দু উত্তমরূপে 'ষড়্‌দর্শন-সংবাদ' লিখিয়া হিন্দু ধর্মীয় ধারার সুসংঘবদ্ধ রূপটি তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রীস্টান হইয়াও রামায়ণ মহাভারতের রসগ্রাহী রূপ দিতে পারিয়াছিলেন। যুগ প্রয়োজনে যুক্তিবাদী মনের দ্বারা দেশীয় স্বার্থ বড় করিয়া দেখাই হইয়াছিল প্রধান কর্তব্য, ধর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তি অনুভূতির বস্তুই ছিল। ডিরোজিও ইয়ংবেঙ্গলদিগের মনে ভারতমাতার অনুধ্যান জাগরিত করিতে পারিয়া ছিলেন বলিয়াই যুক্তিবাদী শিষ্যগণ ভারতী সংস্কৃতিকেও নবনব চিন্তার দানে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ যুগে যুগে যেমন নব নব চিন্তা-

ধারার দানে সমৃদ্ধ হইয়া স্বীকরনের মাধ্যমে আপন উদার সত্যে উপস্থিত হইয়াছে —তেমনি ইয়ংবেঙ্গলদের দ্বারা প্রাচীন ধর্মীয় কুসংস্কারের জগদ্দল প্রস্তর দূরীভূত হইয়া স্বাধীন নব ধর্মীয় উদার দৃষ্টির পথও উন্মুক্ত করিয়াছিল। ধর্মান্ধতা নয় ধর্ম নিরপেক্ষতাই পরবর্তী যুগের ভারতের বাণী। ইয়ংবেঙ্গলদিগের তীব্র আঘাত ভারতের ধর্মীয় চিন্তার পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। ধর্ম আর সর্বব্যাপী-রূপ লইয়া সমাজ সংস্কৃতি, সাহিত্যকে সংকীর্ণ খাতে বহাইতে পারে নাই— বরং নব নৈতিক ও মানসিকতার রূপ সৃষ্টি করিয়া বিশ্ব আসরে স্থান করিয়া দিয়াছে।

শিক্ষা

"এ ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালিজাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভাল চাকরিবাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়।"[২০]

রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনার প্রভাবে আমাদের দৃষ্টি ও জাতির 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর-পন্থায়' এমনি বহু রাখাল তরুণের একগোষ্ঠীর প্রতি আকর্ষিত হয়। তাঁহারা ঈশ্বরচন্দ্রের আগমনের ও বিকাশের পথকে করিয়াছে সুগম এবং বহুক্ষেত্রে তাঁহারা ঈশ্বরচন্দ্রের দিশারী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহারা রাখালেব ন্যায় বিস্মৃতির ক্রোড়ে লীন হইয়া যায় নাই—বরং ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় আমাদের স্মৃতি আশ্রয়ী ও চিরস্মরণীয়। হিন্দু কলেজীয় ছাত্রগণ, বিশেষত ইয়ংবেঙ্গলগোষ্ঠীর চিরস্মরণীয়তার মুখ্য কারণই ছিল আধুনিক শিক্ষা। ধর্মীয় ক্ষেত্রে 'লণ্ড-ভণ্ড' করিয়া তাঁহারা যে নবধর্মের পথ উন্মুক্ত করিতে পারিয়াছিল—তাহারও শ্রেয় নব পাশ্চাত্য শিক্ষার। ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহারাই হইয়াছিল নবযুগের শিক্ষকশ্রেণী। হিন্দু কলেজের পন্থা অনুসরণ করিয়া বাংলাদেশে অন্যান্য আরও বহু ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া দ্রুত পরিবর্তনের সম্ভবনা স্পষ্ট করিয়াছিল তাঁহারা ইংরাজী জ্ঞানেই পটু এমন নয় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানেও পারদর্শী। ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুলের ছাত্রদিগের পরীক্ষাপ্রসঙ্গে দেশীয় শিক্ষার ধারা বদলের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। সমাচার দর্পণে দেখা যায়, "ইহার পূর্বে আমরা শুনিতাম যে ইংলণ্ডীয় ভাষার ছাত্রেরা যৎকিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়া কেরাণিদের পদ প্রার্থনার্থে সেই ভাষা শিক্ষা করিত কিন্তু আমরা এখন আশ্চর্য দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় বালকেরা ইংলণ্ডীয় অতিশয় কঠিন পুস্তক ও গূঢ় বিদ্যা আক্রমণ করিতে করিতে সাহসিক হইয়াছে এবং ভাষার মধ্যে যাহা অতিশয় দুঃশিক্ষণীয় তাহা আপনাদের অধিকারে আনিয়াছে অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু কলেজের বিদ্যার্থীরা ও শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় ও শ্রীযুক্ত জগমোহন

বসুর পাঠশালায় ছাত্রেরা ইংলণ্ডীয় সাহেবদের নিকটে ইংলণ্ডীয় ভাষার উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে '[২১]

হিন্দুকলেজের রাখাল বালকদিগের সহিত প্রাচীর দ্বারা সংরক্ষিত সংস্কৃত কলেজের বালকদিগের মাঝে মধ্যে ইষ্টক দ্বারা মস্তক বিচূর্ণ করিবার রাখালোচিত ক্রীড়া হইত, পুলিশও আসিত। শেষ অবধি সংস্কৃত কলেজ ছাত্রগণও ইংরাজি শিক্ষার জন্য লালায়িত হয়। দুরন্তদিগের হাতছানিতে ক্রমে উভয় রাখালশ্রেণীকেই সমাজে সম্মিলিতভাবে স্থায়ী সব কিছুকেই লণ্ডভণ্ড করিতে দেখা গেল। হিন্দু কলেজের জাতিভেদহীন ধর্ম নিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগকে মুক্তিপথের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া চলিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সংস্কৃত কলেজকে সর্বশ্রেণীর হিন্দুর জন্য মুক্ত শিক্ষালয়ে পরিণত করেন। ইংরাজী শিক্ষা (১৮৩৫ সালে) সংস্কৃত কলেজে বন্ধ হইলে পর ছাত্রগণ মুগ্ধবোধের মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকিতে না পারিয়া হিন্দু কলেজের রাখাল বালকদিগের ন্যায় দুরন্তপনার পরিচয় দিয়া ইংরাজী পুনঃ প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করে। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন ন্যায় শ্রেণীর ছাত্র। ১৮৩৯ সালে সংস্কৃত কলেজের বহু ছাত্রের সহিযুক্ত যে আবেদনপত্রটি সেক্রেটারী মার্শাল মহোদয়ের নিকট এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয় রবীন্দ্রনাথের রাখালবালক তাহাদের মধ্যে একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। সংস্কৃত রাখাল বালকগণের নিকট নব অর্থভিত্তিক সামাজিক অবস্থায় ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন জ্ঞানে ও কর্মে। ইহা সামাজিক প্রতিষ্ঠার উন্নয়নের সোপান এবং ইংরাজী শিক্ষিতের মর্যাদা লক্ষপতি ব্যবসায়ী অপেক্ষাও অধিক।

ইয়ংবেঙ্গলদিগের শিক্ষার প্রভাব স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে নবীনদিগের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে এই কথাটি স্পষ্ট হইয়াছে যে নূতন শিক্ষায় শিক্ষিতগণ সমাজে গোষ্ঠীযুক্ত না হইয়াও ব্যক্তিত্ব লইয়া বাঁচিতে পারে। তাঁহাদের চারিত্রিক সদগুণাবলী, স্বাতন্ত্র্য ও নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত তরুণ মনকে কলকাতার নিকটস্থ স্থানে পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ করিয়াছে। তাঁহারা ডিরোজিও শিক্ষিত পন্থার সমাজে বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রেরণা জাগাইয়া সর্বপ্রকার অন্যায় ও অন্ধতা-মুক্তির প্রচেষ্টার পথ নির্দেশ করিয়া চলিয়াছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনির্বাণ আগ্রহ জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়া তাঁহারা সর্ববিষয়ে আলোচনার দ্বারা ভাবের ক্ষেত্রে মূল্যগত নব বিচারের পন্থা উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। সভা-সমিতি স্থাপনের দ্বারা শিক্ষিতগণকে তর্ক বিতর্কে নিরত করিয়া সত্য নির্দ্ধারিত ও অসত্যকে দূর করিতে সচেষ্ট করিলেন। ক্রমে এই উদ্দেশ্যে পত্র পত্রিকাও প্রকাশিত হইল। বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে সংস্কারমুক্ত তরুণ সৃষ্টির প্রচেষ্টায় তাঁহারা নিরত। নব চিন্তাধারাই পাশ্চাত্য পুস্তক ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করেন।

অবাধ চিন্তার পথ উন্মুক্ত করিয়া তাহারা জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানকে, সুশিক্ষার দ্বারা

অশিক্ষা ও কুশিক্ষাকে, যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা অলৌকিকতার মোহকে জয় করিবার প্রচেষ্টায় নিরত হইলেন। উদ্দেশ্য সাধনার্থে ইয়ংবেঙ্গলগণ প্রধানত নিম্নলিখিত প্রচেষ্টা অবলম্বন করিলেন,

১। শিক্ষাদান ও তদুদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষকতা।

২। আলোচনা-সভা-সমিতির স্থাপনা ও তাহাতে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ, তর্কবিতর্ক, বক্তৃতার ব্যবস্থা।

৩। পত্র-পত্রিকা স্থাপিত করিয়া অবাধ চিন্তার প্রসার ও জন শিক্ষা দান করিয়া কুসংস্কারের অন্ত করিবার চেষ্টা।

৪। পুস্তক প্রণয়ন। বিদ্যালয়ে পাঠ্য অথবা অনুবাদের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট উপযুক্ত পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রচার।

শিক্ষাদান

"দেওয়ালে রয়েছে মধু এদিকে চাহিয়ে।
এনাটমি শিখেছিল আগে জাত দিয়ে॥"

কবিতাটি লিখিয়াছেন হিন্দুকলেজ ছাত্র এবং সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। মধু অর্থাৎ মধুসূদন গুপ্ত বঙ্গীয়দিগের মধ্যে সর্বপ্রথম মৃতদেহে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। সেকালে উচ্চবর্ণের হিন্দু অপরিচিত মৃতদেহ স্পর্শ করিলে ধর্ম ও জাতিচ্যুত হইত। সুতরাং পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু তরুণগণ মেধা, নিপুণতা ও সাহসিকতার যে কোন দেশের তরুণদিগের সমকক্ষ। তাই ধর্ম ও সংস্কারের বাঁধ বিরাট প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণর জেনারেল গোপন ইস্তাহারে মতামত দেন যে' "বিজ্ঞানের যে কোন শাখায় অদ্ভুত পারদর্শিতা অর্জনের মাধ্যমে দেশীয়গণের বুদ্ধির যোগ্যতা ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে শিক্ষাদাতৃগণ যদি বিষয়গুলি সুন্দরভাবে ছাত্রদিগের অনুযায়ী বোধগম্য করিয়া শিক্ষা দেন তাহা হইলে পুরাতন প্রচলিত কুসংস্কারও কাটাইয়া উঠা যায়।[২২] অতএব নব আদর্শে শিক্ষিত ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন তরুণের দ্বারাই ইহা সম্ভব—এবং প্রকৃতপক্ষে হইলও তাহাই। ইয়ংবেঙ্গলের রসিককৃষ্ণ মল্লিকের ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত ও উমাচরণ শেঠই মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বিশিষ্ট ছাত্র। রসিককৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক হন। রসিককৃষ্ণ প্রধান শিক্ষক। তাঁহারা শিক্ষকতায় অতি নিপুণ ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে এরূপ গুণ-সম্পন্ন যে, তাঁহাদিগকে হারাইতে তিনি (হেয়ার সাহেব) বাস্তবিক দুঃখিত ছিলেন। রসিককৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহন কর্ম হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেবের ইচ্ছায়। কারণ তাঁহারা হিন্দুকলেজীয় কর্তৃপক্ষের ও হিন্দু সমাজের আচার নিষ্ঠা অমান্য করিয়া অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেন প্রকাশ্যে। তাঁহারা ছাত্রদিগকেও সেইরূপ সর্ব কুসংস্কার

ছিন্ন করিয়া সমাজে নূতন প্রথা প্রবর্তনের জন্য উৎসাহিত করিতেন এবং স্বয়ং সেই দৃষ্টান্ত আচরণ করিতেন। ইহার প্রভাব ছাত্রদিগের উপর পড়িয়াছিল বলিয়াই মধুসূদন গুপ্ত অনায়াসে দ্বিধাহীনভাবে শল্য কর্ম সাধন করিয়া সংস্কার বন্ধন সকলের জন্য ছিন্ন করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। যুবকগণ আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীদ্বারা। ১৮৪৫ সালেই ডাঃ ফ্রেড জে ময়াট (Dr. Freud J. Moat, M. D.) কাউনসিল অব এডুকেশনের সেক্রেটারী হিসেবে ২৫-১০-১৮৪৫ তারিখে লিখিয়াছিলেন যে 'ব্রিটেনের ছাত্রদের অপেক্ষা অনেক সুষ্ঠুভাবে অনেক উচ্চ মানের শল্য চিকিৎসায় ভারতীয় ছাত্রগণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে।'

হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ কলেজে অধ্যয়নকালেই কলিকাতায় অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আবার অনেকে কলেজ ত্যাগের পরও এরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার অপর এক বন্ধুর সহযোগিতায় নিজ গৃহে এইরূপ একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[২৩] রাধানাথ শিকদার ও শিবচন্দ্র দেব সেই বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে রীতিমত পড়াইতেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের এনকোয়ারার নাম পত্রে ছাত্রদের শিক্ষা প্রচেষ্টা সম্পর্কে এক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার মর্মাংশ সমাচার দর্পণ হইতে উদ্ধৃত করা গেল—'হিতৈষী বিদেশীয়দের স্থাপিত বিদ্যালয় ব্যতিরেকে (এদেশে) অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্তু কালক্রমে মহারূপান্তর হইয়াছে। এইরূপে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা স্বদেশীয়েরদিগকে ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং স্বদেশীয়েরদের উপকারার্থ যাহা কর্তব্য তাহা তাঁহারা সুজ্ঞাত হইয়াছেন। হিন্দুরদিগকে বিদ্যাবিতরণার্থ কলিকাতায় নানা পল্লীতে হিন্দুরদের কর্তৃক নানা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। আবার কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁহার রোজনামচায় লিখিয়াছেন, "দাদা রাধানাথের সহিত এ অঞ্চলে একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সম্বন্ধে বহুক্ষণ কথাবার্তা হয়। এই বিদ্যালয়টি দরিদ্রদিগের জন্য এবং গরীব ভদ্রশ্রেণীর লোকদের জন্য হওয়া উচিত। ··· বাংলা শিক্ষার প্রচার করিতে হইবে।"[২৪]

ইয়ংবেঙ্গলের নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তীও স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। হিন্দুকলেজের অপরাপর ছাত্রগণ যাহারা ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী হইতে দূরে সরিয়াছিলেন—যেমন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতিরাও শিক্ষকতা ও শিক্ষায়তন স্থাপনের কর্মে সর্বদাই নিরত ছিলেন। ইয়ংবেঙ্গলের রামতনু লাহিড়ী সর্বকালের আদর্শ শিক্ষক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসু ১৮৪৯ সালের মে মাসে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহার নিকট অল্পবিস্তর ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন।[২৫] প্যারীচরণ সরকার প্রেসিডেন্সী কলেজের বিখ্যাত

অধ্যাপক ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাদ্রাজে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন বাংলায় ফিরিয়া আসা পর্যন্ত।

অর্থাৎ হিন্দু কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য তাঁহারা বহুলাংশেই সিদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া তাহার প্রসার কল্পে দূতরূপে তাঁহারা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া শিক্ষা প্রসারের দ্বারা অজ্ঞানতা দূরীকরণ করেন। এই শিক্ষা প্রসারের ফল বাংলার ভূমি হইতে বহুদূরে বোম্বাই সহরে ও প্রেসিডেন্সীতে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। বোম্বাই সহরের নাগরিকগণ ২৫-১-১৮৩১ বৃটিশ পার্লামেণ্টে আবেদন করেন ১২ বৎসর পর কোন ভারতীয় সরকারী কর্মে বিশেষত বিচার বিভাগে, অর্থনীতি সংক্রান্ত বিভাগে ইংরাজী বলা, পড়া ও লেখা না জানিলে যেন নিযুক্ত হইতে না পারে;[২৬] সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারতা ভারতের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে ও দ্রুততালে অগ্রসর হইয়া চলিল। কাউন্সিল অব এডুকেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে হইল ১৫১টি শিক্ষায়তন, ছাত্র সংখ্যা ১৩১৬৩ জন। ৫টি এ্যাংলো ভার্নাকুলার কলেজ সরকারের সাক্ষাত অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল এবং শিক্ষার বাৎসরিক খরচ—৫,৯৪,৪২৮ টাকা।[২৭] দেশীয়দিগের প্রচেষ্টায় কোন বিদ্যালয় খুব দীর্ঘ স্থায়ী হইতে পারে নাই বিশেষত রক্ষণশীলদিগের দলাদলি ইত্যাদির জন্য; কিন্তু নিত্য নূতন প্রচেষ্টার স্বাক্ষর সর্বত্রই স্পষ্ট ছিল।

এই বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি যে ইয়ংবেঙ্গলদিগেরই প্রচেষ্টার অবদান তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। কারণ রক্ষণশীলগণও বিদ্যালয় স্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমে অগ্রসর হইয়া হিন্দুকলেজের আদর্শে বিদ্যালয় স্থাপনার যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টায় ছিল দ্বিধাগ্রস্থতা। পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিকতার পদক্ষেপকে স্তব্ধ করিতে তাঁহাদের বৃথা চেষ্টায় বিদ্যালয়ই অস্তিত্ব হারাইয়াছে, কিন্তু সমাজের গতি স্তব্ধ হয় নাই। ইয়ংবেঙ্গলদিগের সেই দ্বিধা না থাকায় তাহাদের প্রচেষ্টা সর্বদাই কার্যকরী ছিল। যদিও তাঁহাদিগের সকলেই সরকারী ও বিভিন্ন কার্যব্যপদেশে কার্যক্ষেত্রের বদলের জন্য শিক্ষকতার ইতি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু কথায় বলে 'স্বভাব যায় না মলে'—ইয়ংবেঙ্গলদিগের অবস্থাও ছিল সেইরূপ। হিন্দু কলেজের শিক্ষার, বিশেষত ডিরোজিও প্রভাবের ইহাই ফল। ডেভিড হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষকে লিখিত একটি চিঠিতে (১৮,৪,১৮২৪) ছাত্রদিগের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন।

"হিন্দুকলেজে ছাত্র পাঠাইবার উদ্দেশ্যই হইল এমন একদল সুশিক্ষিত যুবক সৃষ্টি করা, যাহারা পরে তাহাদের স্বদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করিবে।[২৮] তাই দেখি ১৮৩৩-৩৪ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় অর্থ সঙ্কট হেতু সোসাইটির কার্য সঙ্কুচিত করিতে হইলে শেষ অবধি তাহার আরপুলি পাঠশালাও উঠিয়া যায়। তারপর হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ও সহরতলীর অবৈতনিক

ইংরাজী বাংলা স্কুলগুলিই তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাঁহারা যে শিক্ষার আলোক জ্বালাইয়াছেন, তাহার রশ্মি জনসমাজে বিকিরণ করিবার জন্য কলিকাতার নানাস্থানে উপকণ্ঠে-বেহালায়, এমনকি আন্দুল পর্যন্ত নূতন আদর্শে অবৈতনিক ইংরাজী বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াসিলেন ইয়ংবেঙ্গলরা।

শিক্ষায় মাতৃভাষা ঃ বাংলা

প্রকৃত শিক্ষাদান মাতৃভাষা মাধ্যমেই সম্ভব। এই বোধ ইয়ংবেঙ্গলদিগের ছিল। সেজন্য তাঁহারা এইসকল বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার প্রসার করেন এবং মাধ্যম বাংলা রাখিবার প্রয়াসী হইয়া সক্রিয়ভাবে কর্ম করেন। ১৮৩৩-৩৪ সালে শিক্ষার মাধ্যম লইয়া যখন দুইটি দলে সমগ্র প্রবীণ পণ্ডিতগণ বাদবিবাদ আরম্ভ করিলেন তখন রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাদের 'এনকোয়ারার' ও জ্ঞানান্বেষণ (দ্বিভাষিক বাংলা ও ইংরাজী) পত্রে আরবী-ফারসী-সংস্কৃত মাধ্যমের অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া অদূর ভবিষ্যতে মাতৃভাষাকেই মাধ্যম করিবার প্রয়াসে সাময়িক ইংরাজীর প্রচলনের কথাই উল্লেখ করেন। এই উপলক্ষে এক জনসভার আয়োজন করিয়া রসিককৃষ্ণ ইহার সম্বন্ধে প্রস্তাব পাস করাইয়া বড়লাটের নিকট আবেদন করেন দেশীয় ভাষাগুলির চর্চায় অধিক ব্যয় বরাদ্দের জন্য। ক্রমে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে রাজকার্যে ও বিচারালয়ে দেশীয় ভাষার চলন হয়। ইংরাজীকে সাময়িক 'আপনধর্ম' হিসাবেই তাঁহারা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। শিক্ষা বিষয়ে বস্তুবাদী চিন্তার গতি অতি সূক্ষ্ম এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে ইহার পরিধি অতি বিরাট। তাই হিন্দুকলেজের বাংলা শিক্ষা প্রণালীর কঠোর সমালোচনা করিতেও তাঁহারা পশ্চাদপদ হন নাই। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অনুশাসনের প্রয়োজনীয়তার কথা লইয়া জনমত সৃষ্টির প্রয়াসও করিয়াছেন। অনাদৃত বাংলাভাষাকে উন্নত করিয়া তাহার মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা প্রসারের চিন্তা কার্যকরী করিবার প্রয়াসে সংবাদপত্রে আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দু কলেজে ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে বাংলা শিক্ষার চরম অবনতির জন্য তীব্র সমালোচনায় মুখর হইয়াছে ইয়ংবেঙ্গলদল। বাংলা ভাষা শিক্ষা যদি সুষ্ঠু না হয় তাহা হইলে তাহাদের 'একদিন বাংলা ইংরাজীর সমতুল্য হইয়া শিক্ষার মাধ্যম হইবে'—এই স্বপ্ন কদাপি সার্থক হইবে না। সুতরাং তাঁহারা বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকায় আলোচনা করিয়া এই ব্যবস্থার সংশোধনে প্রচেষ্ট হন। ১-৮-১৮৪৩ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আলোচনা মাধ্যমে বলিলেন, "আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত বিদ্যালয়ের সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্টের পণ্ডিত মহাশয়েরা এ পর্য্যন্ত ভদ্রস্থ ছাত্রগণের বাংলা ভাষা শিক্ষার বিষয়ে মনযোগ করেন নাই, ঐ ডিপার্টমেণ্টের নিম্ন চারিশ্রেণীতে কেবল গৌড়ীয় ব্যাকরণের পাঠ ও অনুবাদকরণ দ্বারা বাঙ্গালা শিক্ষা হয়—আমরা জানিতে প্রার্থনা করি যে এতদ্দেশীয় ভাষার পুস্তক সংগ্রহার্থে যে সব কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিলেন

তাঁহারা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কি করিলেন ? এবং এক্ষণে এতদ্দেশে, কাউন্সেল অব এডুকেশনের অধীনে যে সকল পাঠশালা আছে তাহাতে গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষাদানের বিষয়ে কাউন্সিলেরই বা মত কি ? এদেশের লোকদিগকে সভ্য করিতে হইলে এদেশের ভাষার আলোচনা করা অতি কর্তব্য আর এই ব্যাপার প্রয়োজনীয় ও উপকারক অতএব ইহাকে সফল করিবার নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক।"[২৯]

তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই অংশে স্পষ্ট। তাই তাঁহাদের ভাষা আন্দোলনে কেবলমাত্র মধ্যবিত্তের একাংশই লাভবান হয় নাই—জনসাধারণকেও ক্রমে সামন্তযুগীয় মনোবৃত্তি হইতে জাগ্রত করিয়া আধুনিকতা সচেতন করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছে। শিক্ষার আলোর এই মাধ্যম না হইলে সর্বসাধারণের জ্ঞানদৃষ্টি উন্মীলিত হইবে না। ক্রমে এই প্রচেষ্টার পরিণতি হয় রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশের দ্বারা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত সমাস-সন্ধি-মুক্ত করিয়া সাধারণ বাঙালীর বুদ্ধি গ্রাহ্য প্রাত্যহিকতার স্পর্শ সম্পৃক্ত করিবার মধ্যদিয়া।

সাধারণ গ্রন্থাগার

বাংলা মাধ্যমের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে সাধারণ জনসমাজে প্রচারের মাধ্যমে ব্যক্তির মুক্তিপথের সন্ধান দান। সেই উদ্দেশ্যে সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা হয়। ৩১-৮-১৮৩৫ তারিখ টাউন হলে ইংরাজ ও বাঙালী নেতৃস্থানীয়দের মিলিত সভায় পুস্তকালয় স্থাপনার্থে একটি কমিটি গঠিত হয়। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রসময় দত্ত কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন। রসিককৃষ্ণের উৎসাহে একটি প্রস্তাবে দরিদ্র ছাত্রদিগের পাঠের সুবিধার জন্য টিকিটের ব্যবস্থা হয়।[৩০] এই ক্যালকাটা লাইব্রেরী পরে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পরিণত হয়।

ইয়ংবেঙ্গলদের ইচ্ছা ছিল বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারকে আয়ত্তের মধ্যে আনয়নের। জ্ঞানের তৃষ্ণা জাগ্রত করিবার জন্য তাঁহাদের পুস্তক পাঠাভ্যাসের অনুবর্তী করিতে প্রয়াসী হন। তাঁহারা নিজ আচরণের মধ্য দিয়া পুস্তক পাঠাভ্যাসের যে তীব্র আগ্রহের নিদর্শন দিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে জানা যায় পাদরী আলেকজাণ্ডারের কথায়, "কেবলাত্র একটা জাহাজেই এক হাজার সংখ্যা 'এইজ অব রিজন' কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছিল : প্রথম দিকে প্রতিটী বই এক টাকা করিয়া বিক্রী হয়। কিন্তু এই বই-এর চাহিদা এতই অধিক ছিল যে দেখিতে দেখিতে ইহার মূল্য অনেক বাড়িয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যে টমাস পেইনের (Thomas Paine) সব লেখার একটা সস্তা সংস্করণ প্রকাশিত হইল'। The Rights of Man ও বহুল প্রচারিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ১৮৫৩ সালে ব্যালেণ্টাইনের সমালোচনা করিয়া এইরূপ বাঙালী স্বভাবের কথাই বলিয়াছিলেন—"মিলের পুস্তকের মূল্য

অধিক,—ডাঃ ব্যালেণ্টাইনের সংক্ষিপ্তসারের প্রচলন প্রস্তাবের প্রধান কারণ ইহাই মনে হয়। আমাদের ছাত্রদের গ্রন্থ সমূহ একটু বেশী দাম দিয়াও কিনিবার অভ্যাস হইয়াছে। কাজেই মূল্যাধিক্যের জন্য এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রচলন হইতে বিরত থাকিবার কারণ নাই।"[৩১] ইয়ংবেঙ্গলদের প্রত্যেকেরই বিরাট ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রায় ৫।৭ হাজার টাকার মূল্যের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার বেথুন বালিকা বিদ্যালয়কে দান করিয়াছিলেন। এই স্বভাব বাঙালী জীবনে এখনও বর্তমান। হিন্দুকলেজ শিক্ষা পদ্ধতির ইহা অমূল্য প্রভাব। রাজনারায়ণ বসু এই পদ্ধতির সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ছাত্রদিগকে কতই পড়িতে হইত, তাহার সীমা নাই।"[৩২] তাই সেকালে ছাত্রগণ হইত বহুভাষাবিদ কারণ মূল গ্রন্থ পাঠ না হইলে ইহা সম্ভব নয়। অনুবাদের জন্যও ইহা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। বাংলাভাষা ও বাংলার মানস গঠনে ইহা সেকালে একান্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্য ছিল এবং ইয়ংবেঙ্গলরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

স্ত্রী শিক্ষা

ভারতে নারী, অন্ত্যজদিগের ন্যায় সব অধিকারে বঞ্চিত ছিল। জাতির অর্ধাংশ উপেক্ষিত হইয়া থাকিলে সেই জাতির উন্নয়ন অসম্ভব। ইয়ংবেঙ্গল নারীর এই অধঃ-পতিত রূপকে পরিবর্তিত করিবার প্রয়াসে উদ্যোগী হন। স্বাধীনতার পূজারী ইয়ংবেঙ্গল নারীর মুক্তির কামনায় পত্র পত্রিকায়, সভাসমিতিতেই আলোচনা দ্বারা যে প্রচেষ্টায় যতিচিহ্ন আঁকিয়া দিতে পারেন নাই, অগ্রসর হইয়াছেন নারী-শিক্ষার চেষ্টায়।

নব্য শিক্ষিতরা এই উদ্দেশ্যে স্বীয় পরিবারে শিক্ষার প্রসার কার্যকরী করিবার প্রচেষ্টায় স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতিকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে সে প্রচেষ্টা রক্ষণশীল-দিগকেও উৎসাহিত করিল। অবশ্য কদাচিৎ কোন কোন গৃহে সাধারণ বাংলা অক্ষরজ্ঞান দানের প্রথা ছিল। রামায়ণ-মহাভারত বা বাংলা মঙ্গলকাব্য-জাতীয় কাব্য পড়িবার প্রথাও বর্তমান ছিল। কিন্তু তাহা একান্ত নগণ্য। কারণ দেশে কোন সাধারণ বালিকা বিদ্যালয় ছিল না।

নারীর মুক্তি সংগ্রামে সুষ্ঠুভাবে সাধারণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কর্মে অগ্রসর হন ভারতের আইন সচিব ও শিক্ষা পরিষদের সভাপতি জন ইলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন। সঙ্গে এই কর্মে অগ্রসর হইলেন রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জন স্কুলের জন্য সাড়ে পাঁচ বিঘা জমি ও প্রায় ৫।৭ হাজার টাকা মূল্যের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীটি দান করিলেন। এই কর্মে এবং নারীশিক্ষার সার্বিক প্রচেষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান চিরস্মরণীয়। বেথুন সাহেব বিদ্যালয়টিকে হিন্দুকলেজের আদর্শেই গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী হন। অভিজ্ঞ বেথুন সাহেব বাংলায় রক্ষণশীল নেতাদের সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলিয়াই ৭-৫-১৮৪৯

তারিখ স্কুল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ, আশুতোষ দেব প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ জানান নাই। ইউরোপীয়দিগকেও তিনি এড়াইয়া গিয়াছেন। রক্ষণশীলগণ সমাজের গায়ে কালের লেখা পড়িতে ভুল করিয়া বাধার সৃষ্টি করিলেন সত্য, কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া ক্রমে সুবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া নিজেরাও বিদ্যালয় স্থাপনে চেষ্টিত হইলেন। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নানা প্রচেষ্টার কথাও স্মরণীয়। বেথুন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণ আপনাপন কন্যা ও আত্মীয়দের শিক্ষার নিমিত্ত পাঠাইতে দ্বিধা করেন নাই। রাম-গোপাল ঘোষের বাড়ীর মহিলাদিগের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কন্যা সৌদামিনী দেবীকে এই বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারেরও স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের প্রয়াসের অবদান স্মরণীয়। তিনি নানা প্রগতিমূলক কর্মে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহকর্মী ও সহযোগী। আপন কন্যাদের (ভুবনবালা ও কুন্দবালা) সর্ব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও বিদ্যালয়ে পাঠাইবার সাহস তিনি দেখাইয়াছিলেন।

বেথুন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে স্ত্রী-শিক্ষার মাধ্যম হয় বাংলা। ছাত্রী সংখ্যা ২১ জন। হিন্দুকলেজের ন্যায় এই আদর্শে সৃষ্ট বেথুন স্কুলেও ক্রমে স্ত্রী-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হইয়াছিল। 'বেথুন কলেজ'ই' ভারতের প্রথম মহিলা কলেজ।

স্ত্রী-শিক্ষাকে প্রবল সামাজিক আন্দোলনের রূপ দানে ইয়ংবেঙ্গলদের প্রচেষ্টা স্মরণীয়। তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য—উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৪০ সালে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে Native Female Education নামে একটি প্রবন্ধ ইংরেজীতে লিখিয়া পুরস্কৃত হন। ১৮৪২ সালে রামগোপাল ঘোষ স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য হিন্দু কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগের একটি সোনার ও একটি রূপার পদক পারিতোষিক ঘোষণা করিলে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় হন মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত তাহার বিদ্যাদর্শন পত্রিকাতেও এই বিষয়ে লিখিয়াছিলেন। ১৮৪৭ সালে বারাসতে প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র ও নবীনকৃষ্ণ মিত্রের প্রচেষ্টায় বাঙালীর প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁহারা এজন্য লাঞ্ছিতও হইয়াছিলেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৫০ সালে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে যে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে অর্থসর্বস্ব সে যুগে নারীর ও নরের বুদ্ধি ও প্রতিভার বিশ্লেষণের দ্বারা উভয়ের অর্থকরী ক্ষমতার সমতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

অবশ্য অন্তঃপুরের বাহিরে কর্মের মাধ্যমে মহিলাদিগের অর্থোপার্জনের কথা তিনিও স্বয়ং ভাবিতে পারেন নাই। হিন্দুকলেজীয়দিগের সহিত সংস্কৃত কলেজীয়দিগের সংযোগে আধুনিকতার জয়যাত্রা দ্রুততর হইয়াছে। ক্রমে উত্তরপাড়া, নিধুদিয়া,

সুখসাগর, যশোহর প্রভৃতি স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অবশ্য ইত্যবসরে হিন্দু কলেজীয় প্রতিবাদীরা আপনাপন পরিবারে সুপ্রচেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমনকি একজনের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে "ইয়ংবেঙ্গলদের একজন প্রগতিবাদী আপনার স্ত্রীকে ইংরাজী 'Political Reader No. 5—পড়া সমাপ্ত করাইয়াছেন এবং ইংরাজীতে লিখিতেও শিক্ষা দিয়াছেন।"[৩৪]

মিশনারীদিগের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে সার্থকতা যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। ১৮৫০ সালে মিশনারীদিগের প্রচেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার একটি সূচী দেওয়া গেল।[৩৫]

১৮৫০ সন

স্থান	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	বোর্ডিং স্কুল	ছাত্রী সংখ্যা
বাংলা	২৬	৬৯০	২৮	৮৩৬
মাদ্রাজ	২২২	৬,৯২৯	৪১	১,১০১
সমগ্র ভারত সিংহল অন্তর্ভুক্ত	৩৫৪	১১,৫৪৯	৯১	২,৪৪৬

কিন্তু ইহাদের প্রায় সকলেই নিম্নশ্রেণীর ছাত্রী। উচ্চবর্ণের ছাত্রী অতি অল্প। ১৯৩৮ সালের Mr. Adm's (3rd Report) অনুযায়ী দেখা যায়,[৩৬]

বর্ধমান জেলা—৪টি স্কুল ১৭৫ জন ছাত্রী। ১৫ মুসলমান, ৩৬ জন খৃস্টান,

১৩৮ জন হিন্দু

(বাগদী—৫৮, মুচী—১৮, ডোম—১৭, হারিয়া—১২, বৈষ্ণব—৬, চণ্ডাল—২ কুর্মী—১, তাঁতি—৬, ও অন্যান্য—১৮)।

মুর্শিদাবাদ—সকলেই হিন্দু—বাগদী—১৭, মাল—৬, কৈবর্ত—৩, বৈষ্ণব—২

আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রী পাওয়া যাইত। কিন্তু অন্য সাধারণ বিদ্যালয়ের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়।

কিন্তু এই ধরণের মিশনারী প্রচেষ্টা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছিল। তাহার কারণ এই বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টাই ছিল প্রধান। সুতরাং সেকালের বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে এমনকি ইয়ং বেঙ্গলের খ্রীস্টান কৃষ্ণমোহন ধর্মীয় ভাবধারা প্রথম শিক্ষা প্রচেষ্টার সমর্থন করিতে পারেন নাই।[৩৭] ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে কেবলমাত্র ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা নব যুগের বাংলায় উপযুক্ত ছিলনা। ইয়ংবেঙ্গলদিগের প্রচেষ্টাই ছিল সার্থক।

আলোচনা সভা-সমিতি

সেকালে রাজনৈতিক সচেতনতা তখনও সমাজ জীবনে স্পষ্ট হয় নাই। কারণ জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতনতা তখনও সমাজে প্রকট হইতে পারে নাই। প্রধানতঃ শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, জীবনদর্শন ইত্যাদি বিষয়েই আলোচনা তর্ক-বিতর্কের দ্বারা শিক্ষিত সমাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্দোলনের ঢেউ উঠিতেছিল। ঊনবিংশ শতকের বিদ্বৎসভা প্রতিষ্ঠায় বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবেই। স্বাধীন চিন্তা, যুক্তি ও বুদ্ধির আলোর প্রভাবে ইয়ংবেঙ্গল মানবমুখী সমাজ চিন্তার আলোকে হিন্দুকলেজ অর্জিত জ্ঞানের প্রদীপ দিকে দিকে জ্বালাইয়া সমগ্র শিক্ষিত তরুণকে নূতন পথের সন্ধান দিতে চেষ্টিত হইল। নব্যচিন্তার প্রসারণের প্রধান সহায় হয় এই সভাসমিতি অর্থাৎ বিদ্বৎসভা। ডিরোজিও ১৮২৮ সনেই 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে সপ্তাহে সপ্তাহে কাব্য দর্শন আলোচনার সহিত ধর্ম, সমাজমূলক নানা প্রশ্ন—স্বদেশপ্রেম, পাপপুণ্য, সত্যবাদিতা, পৌত্তলিকতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নাস্তিকতাবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। ছাত্রগণ তাহাতে অংশগ্রহণ করিত সহরের বিশিষ্ট শিক্ষিতদের সমক্ষে। হিন্দুকলেজের পাঠের মধ্যদিয়া যে জ্ঞানের অঙ্কুরোদ্গম হইত তাহারই বিশেষ প্রসার লাভ করিত এই সভায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তিরিশ দশকে রামমোহন গোষ্ঠী, রক্ষণশীল হিন্দুগণ ও ছাত্রগণ বহু বিদ্বৎসভা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য,

ক। ধর্মসভা—সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৩০।

খ। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু এ্যাসোসিয়েশন—১৮৩০ সালে ছাত্রদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। রামমোহন রায় ইহার উৎসাহদাতা।

গ। বঙ্গহিত সভা—ছাত্রদিগের সভা—১৮৩০ প্রতিষ্ঠিত।

ঘ। ডিবেটিং ক্লাব—সাধারণ সভা চোরবাগান—১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত।

ঙ। বঙ্গরঞ্জিনী সভা—ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদক—১৮৩০ সাল।

চ। সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক—১৮৩৩।

ছ। জ্ঞানচন্দ্রোদয় সভা—সাধারণ সভা—১৮৩৬ ঠনঠনিয়া।

জ। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা—সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী; সম্পাদক—রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র—১৮৩৮।

ঝ। তত্ত্ববোধিনী সভা—প্রতিষ্ঠাতা—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৮৩৯।

ইহা ছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্রসভা স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে রামমোহন রায়ের "আত্মীয় সভা" প্রতিষ্ঠায় বাঙালী সংগঠিত বিদ্বৎসভায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই প্রচেষ্টা হিন্দুকলেজীয়দিগের বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়ের বাধাবন্ধহীন মুক্ত আলোচনার যে সামাজিক মানসে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহারাই ফলশ্রুতি এইরূপ অসংখ্য বাঙালী বিদ্বৎসভার প্রতিষ্ঠা।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা

তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকৃষ্ণ দে, ও রামতনু লাহিড়ী সাক্ষরিত একটি প্রচারপত্রে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার (Society for the Acquisition of General knowledge)—উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। সভায় দর্শন, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভূগোল, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি, সকল বিষয় লইয়াই আলোচনা হইত। ইয়ংবেঙ্গলদিগের এই প্রচেষ্টা উল্লেখণীয়।

তত্ত্ববোধিনী সভা

হিন্দুকলেজের অপর গোষ্ঠীব অন্যতম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাতে প্রধানত ব্রহ্মধর্ম বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য হইলেও (প্রথম নাম 'তত্ত্ববোধিনী সভা') এবং ইহার ইচ্ছায় ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা হইলেও তত্ত্ববোধিনী সভা শেষ অবধি অক্ষয়কুমার দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, রাধানাথ শিকদারের প্রভাবে বাংলার যুগান্তকারী সভায় পরিণত হইয়া সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী বলিয়া ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা পায়। মাত্র ১০ জন সভ্য লইয়া আরম্ভ হইলেও ১৮৪১ ৪২ সালে সভ্য সংখ্যা হয় প্রায় ৫০০ এবং পরে প্রায় ৮০০ অবধি সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে ইহার অবদান স্মরণীয়।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

হিন্দুকলেজের ছাত্র কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' বিশেষত সাংস্কৃতিক বিষয় লইয়াই সভার কার্য সীমিত রাখে (১৮৫৩) এই সভায় সর্বপ্রথম একজন বাঙালীকে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য জন-সম্বর্দ্ধনা জানায় ও মানপত্র দেয়। এই সভা দ্বারাই হিন্দুকলেজের কৃতি প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম বাঙালী জাতীয় কবির সম্বর্দ্ধনা পান।[৩৮] আবার প্রয়োজনে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে অগ্রণী হইতেও এই সভা পিছুপা হয় নাই। নীলদর্পণ প্রচার এবং নীলদর্পণ লইয়া মামলায় ইহার দান বাঙালী কখনই ভূলিতে পারিবে না।

বেথুন সোসাইটি

বাঙালী ও ইংরেজের একযোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত (১৮৫৩)। এই সোসাইটিতে ইয়ংবেঙ্গল নেতাগণ, ব্রাহ্ম গোষ্ঠীর নেতাগণ ও রক্ষণশীলগণ সহযোগিতা করেন। এই সভাতে মার্কিন একেশ্বরবাদী পাদ্রি সি এইচ. এভ্যান, জেমস হিউম, প্রমুখদের সঙ্গে ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, ডঃ গুডিভ চক্রবর্তী, বিদ্যাসাগর, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, নবীনকৃষ্ণ বসু, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পাদ্রি লং। এই সভাতেই বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনার প্রসার হয়। এই সভারই সদস্য তারাপ্রসাদ চক্রবর্তী

(১৮৫৯-৬০ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা) সর্বপ্রথম উক্তি করেন যে ইংরেজ ভারত ত্যাগ না করিলে ভারতীয় বা ইংরাজ কাহারও মঙ্গল নাই।[৩৯]

বিদ্বৎসভার মাধ্যমে আধুনিক ব্যক্তিসম্পন্ন চরিত্র সৃষ্টি করিয়া সংগঠিতভাবে প্রগতির বিরোধী সংস্কার হইতে মানুষকে মুক্ত করিবার প্রচেষ্টা সার্থক হয়।

পত্র-পত্রিকা

সেকালের অধিকাংশ কৃতী পুরুষের প্রয়োজনের ভাষা ছিল ইংরাজী—বাংলা ছিল গৌণ। বাংলার ভাব বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেও সংবাদপত্রের দানও ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যের বিকাশ বিশেষত গদ্য সাহিত্যিক ভাষার বিস্তারও হয় সংবাদ-পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই। 'Enquirer'এতে (১৮৩১ মে) লিখিত হয়,

"Having thus launched our bark under thc denomination of Enquirer, we set sail in quest of truth and happiness".[৪০]

পার্থেনন

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ডিরোজিওর সাহায্যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র হিসাবে ইয়ংবেঙ্গলদিগের ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হয়। দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত ইংরাজী সংবাদপত্রের মধ্যে ইহাই প্রথম। এই পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া অধিকদিন সূর্যালোক দেখিতে পায় নাই। ইয়ংবেঙ্গল দিগের প্রতিষ্ঠিত অপর একটি দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) পত্রিকা এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছে :—প্রথম পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় স্ত্রী-শিক্ষা এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক ভারতবর্ষে বাস—এই দুই বিষয়ে প্রস্তাব ছিল, এবং হিন্দু ধর্ম ও গভর্নমেণ্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্দয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল। কিন্তু যদিও হিন্দু ধর্মাবলম্বি মহাশয়েরা তদ্দর্শন মাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতঃ তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই; তথাপি পত্র প্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই।"[৪১]

জ্ঞানান্বেষণ

৩১-৫-১৮৩১ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় জ্ঞানান্বেষণ নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। বাংলা ভাষায় দেশ বিদেশের সংবাদ, যুক্তিসম্মতভাবে শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি প্রকাশের উদ্দেশ্যেই ইহা প্রকাশিত।-১৮৩৩-এর জানুয়ারী হইতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিকের পরিচালনায় এবং রসিককৃষ্ণের সম্পাদকীয় দায়িত্বে "জ্ঞানান্বেষণ' বাংলা-ইংরেজী দ্বিভাষী পত্রিকায় পরিণত হয়। এই পত্রিকায় ইয়ংবেঙ্গলদিগের চিন্তাধারায় আধুনিকতার যে পরিচয় প্রকট হইয়াছে তাহা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর হইতেও অনেক গভীর সমাজ চেতনা সম্পন্ন।

জ্ঞান সিন্ধু-তরঙ্গ

রসিককৃষ্ণ ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে দার্শনিক আলোচনার জন্য জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বেঙ্গল স্পেকটেটর

ইয়ং বেঙ্গলদিগের দ্বিভাষিক (প্রথমাবস্থায়) মাসিক পত্রিকা। ইহাতে নানা-বিষয়ের এমনকি রাজনীতির চর্চা হইত। ইহা ১৮৪২ হইতে পাক্ষিক এবং ১৮৪৩ মার্চ হইতে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। তাবাচাঁদ চক্রবর্তী বহুদিন ইহারা সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটি নব্যবঙ্গের মুখপাত্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রগতিমূলক সকল প্রচেষ্টায় ইহা অগ্রণী ছিল। সরকারের সমালোচনাও সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি লইয়া আলোচনায় ইহা জনমত সংগঠনে সমর্থ হয়। অর্থকৃচ্ছতায় ইহা ১৮৪৩ নভেম্বর হইতে উঠিয়া যায়।

দি কুইল

বেঙ্গল স্পেকৃটেটর বন্ধ হইয়া যাইবায় পর রাজনীতি চর্চার জন্যই বিশেষত তারাচাঁদ চক্রবর্তী 'দি-কুইল' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইহা গবর্নমেণ্ট পক্ষীয় ব্যক্তিগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়

১০-৬-১৮৩৫ সালে প্রকাশিত প্রথম সাহিত্য পত্রিকা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ইহা ছিল তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র। এই পত্রিকাটির সহিত অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি বহুজন সংযুক্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ধর্মালোচনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্টিত হইলেও ইহা সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতি সাধনে অদ্ভুত কর্ম করিয়াছিল ;

হিন্দুকলেজ ছাত্রদিগের মধ্যে অন্যান্যরাও পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে 'রিফরমার' (১৮৩৪-১৮৩৫) ও কাশীপ্রসাদ ঘোষের Hindu Intelligencer' উল্লেখযোগ্য।

বাংলায় এইসময় প্রায় ২৮টি পত্র-পত্রিকা প্রচলিত ছিল। যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা, লৌকিক সংস্কার মুক্ত চেতনার প্রকাশে, গোষ্ঠিচেতনা জাগ্রত করায় সংবাদ-পত্রগুলির অবদান ইয়ং বেঙ্গলের শিক্ষার সার্বিকতাই প্রতিপন্ন করে। তাঁহারা পত্র পত্রিকা মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের তথ্য বাংলাভাষায় প্রচার করিয়া সমাজ চেতনাকে প্রসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

পুস্তক প্রণয়ন

জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে,

'...তৃতীয়ত এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যাপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানাপ্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতিবিস্তারিত রূপ প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশুবোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে ২ প্রকাশ করিব। এবং অন্য ২ বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।"

পুস্তকরচনা দুই শ্রেণীর হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রথমটি দেশীয়শাস্ত্র হইতে বাংলা ভাষায় অনুবাদের দ্বারা সর্বসাধারণের শাস্ত্র, ধর্ম এবং সামাজিক আচার আচারণ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানোদয় করিয়া তথাকথিত ধর্মাধিকারীদিগের যথেচ্ছা ভুল শাস্ত্র-বাণী প্রয়োগ দ্বারা কুসংস্কার বজায় রাখিবার প্রচেষ্টায় বাধা দান। ফলে জনগণ এই মোহমুক্ত হইয়া ঐহিক উন্নতির প্রচেষ্টায় নিরত হইবার সুযোগ পাইবে এবং সমাজ ও দেশ সম্পর্কে ব্যক্তির কর্তব্য সাধনে যত্নবান হইবে।

তৃতীয় অংশের উদ্দেশ্য হইতেছে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানের প্রচেষ্টায় যে পরিবর্তন সাধিত হইয়া অপরাপর দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইতেছে তাহার সম্পর্কে দেশীয় গণকে সচেতন করা এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের দ্বারা দেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে শিক্ষাজগতের ও ব্যবহারিক জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধন করা। ইহার নিমিত্ত ইউরোপীয় ভাষার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের ও বাংলাভাষায় সরল অনুবাদ করা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাক্ষাত পরিচয়ের বৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় জনসধোরণের গোচরীভূত করা।

প্রথম চেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা সভায় ও পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনার প্রয়াসে ইয়ংবেঙ্গলগণ সংস্কৃত পাঠ সুষ্ঠুভাবে আরম্ভ করেন।[৪২] রাধানাথ শিকদার কলেজ ত্যাগ করিবার পর ডঃ টাইটলারের সহায়তায় ইংরেজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিবার কার্যে নিয়োজিত হন। তাই তিনি বিশেষভাবে সংস্কৃত চর্চা করিতে আরম্ভ করেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী ডঃ উইলসনের তত্ত্বাবধানে এবং রামকমল সেন ও হিন্দুকলেজের আর একজন ছাত্র শিবচন্দ্র ঠাকুরের সহযোগে পুরাণ সমূহের ইংরেজী অনুবাদ কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তিনি এবং শিবচন্দ্র ঠাকুর সেই কর্ম অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই কর্মের ফলে ডঃ উইলসন এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে হিন্দু-শাস্ত্র সমূহের ব্যাখ্যান প্রকাশ করিতে যথেষ্ট সুবিধা পান ও প্রকৃত শাস্ত্রীয় সত্যের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী স্যার উইলিয়ম জোন্সের অনুবাদ ও মূল সংস্কৃত পাশাপাশি রাখিয়া টীকাটিপ্পনী সমেত মনুসংহিতার পাঁচ খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় পর্যন্ত সেই অনুবাদের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নীতি ও ধর্ম বিষয়ে প্রবন্ধমালা 'উপদেশ মালা' প্রকাশ করেন ১৮৪০ সালে। তাহার 'ষড়দর্শন-সংবাদ' উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া

তাহার রচিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' বহু প্রাচীন সংস্কার সম্বন্ধে সঠিক অনুবাদ দ্বারা অন্ধতা দূরীকরণে সহায় হইয়াছে। 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' বা 'সর্বার্থ-সংগ্রহ' দ্বিভাষিক ইংরাজী ও বাংলা পাশাপাশি থাকিত।

ইয়ংবেঙ্গলগোষ্ঠী বহির্ভূত হিন্দুকলেজীয়দিগের মধ্যে সংস্কৃত চর্চা ও অনুবাদ দ্বারা জনসাধারণের শাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া কুসংস্কার দূরীকরণের কর্মে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। রাজনারায়ণ বসুও এই কর্মে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

হিন্দুকলেজের আর একজন বিখ্যাত ছাত্র কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলায় মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ করিয়া অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রাখিয়াছেন।

নব্য বাঙালী—আধুনিকতার উষাকালে বুঝিতে পারিল যে 'বিজ্ঞান শিক্ষার ও শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সংগঠন করিতে হইবে'। ইহাই পাশ্চাত্য শিক্ষিতের দৃষ্টিতে নূতনের বিচরণ পথ এবং হিন্দুকলেজগোষ্ঠী এই লক্ষ্যে অগ্রসর হইতেছিল। তাই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার নিভৃত গজদন্তমিনারে উদাসীন এককভাবে বাস করিতে পারেন নাই। রামমোহন এবং দ্বারকানাথ মধ্যযুগীয় ধার্মিক মোহের ভাব কাটাইয়া না উঠিতে পারিলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়াসী ছিলেন। ইয়ংবেঙ্গলরা সমাজের সাধারণের শিক্ষার উন্নতির দ্বারা দেশের সম্পর্কে পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হন। ইয়ংবেঙ্গলগণ জ্ঞানের প্রসার চাহিয়াছিলেন প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব স্থাপনের দ্বারা মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলার্থে। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতাকে দূর করিয়া বাস্তবমুখী প্রকাশের মাধ্যমে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষ্য।[৪৩]

বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও আংশিক অনুবাদ নামমাত্র হইয়াছিল ইয়ংবেঙ্গলদিগের পূর্বে। ১৮৩২ খৃস্টাব্দে হোরেস হেম্যান উইলসনের আনুকূল্যে বিজ্ঞান বিষয়ে একমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, নাম 'বিজ্ঞান সেবধি'। ১৮৩৪ সালে 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' নামে এক পাক্ষিক দ্বিভাষী পত্রিকা প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর হইতে। ইয়ংবেঙ্গলদিগের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভূগোল, জ্যামিতি' ইত্যাদি বিষয়ে অনেকগুলি অনুবাদ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন প্রাঞ্জল ভাষায়।

রাধানাথ শিকদারই ইংরাজী ভাষায় কিছু বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পুস্তকাংশ রচনা করেন। তিনি অতি সূক্ষ্ম ত্রিকোণামিতি ক্যালকুলাস ও জরিপ বিষয়ের জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম হিসাব করিয়া এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গের সর্বোচ্চতা সম্পর্কে পৃথিবীকে জানান। "ম্যানুয়েল অফ সার্ভেয়িং" পুস্তকের বিজ্ঞান ভাগ সম্পূর্ণ তাহারই লেখা। এই কথা বলিলেই হয়তো যথেষ্ট হইবে যে, সকলের মতেই এইরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ে ইহাই প্রাথমিক গ্রন্থ।"[৪৪] 'ম্যানুয়েল অফ সার্ভেয়িং' ভারতে জরিপ সংক্রান্ত সর্বপ্রথম পুস্তক, ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। জরিপ বিভাগে গণনার কার্যে সুবিধার্থে ১৮৫১ সনে তিনি 'Auxiliary Tables' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা দেখিয়া এইচ. এল

খুইলিয়র এবং সি. টি. হেগ-এর তত্ত্বাবধানে পুনরায় একটি পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে।

ইয়ংবেঙ্গলদিগের স্বাধীন চিন্তনের দ্বারা এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রসার হয়। তাহারা প্রচলিত সমাজে কাঠামো সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া আধুনিক যুক্তি নির্ভর যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রবর্তনের সম্পর্কে খুব আশাবাদী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ বিজ্ঞান শিক্ষা পুরাতন মানসিক ভাবধারার কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত প্রয়োগে সফল হওয়া সম্ভব। উনিশ শতকের সপ্তম দশকেও ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন, "আমাদের দেশে যতদিন না বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হবে, বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে উঠবে এবং দেশের লোক বিজ্ঞানের কদর বুঝবে, ততদিন পর্যন্ত দেশবাসীর জীবনের কোন উন্নতি হবে না এবং আমাদের কূপমণ্ডূক সমাজের কোন প্রগতি সম্ভব হবে না।"

ইহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এস. সি প্রবর্তিত এবং ১৫-১-১৮৭৬ তারিখে বিজ্ঞানের একটি জাতীয় সাধনাগার প্রতিষ্ঠিত হয় (ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স)।

রাজনীতি

আধুনিক শিক্ষায় সর্বপ্রকার মোহমুক্ত হইয়া সাহসী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন স্বদেশিক কর্মী হইয়াছিল ইয়ংবেঙ্গলরা। তাঁহারা যেমন কোনপ্রকার পূর্ব সংস্কারের ক্রীতদাস হইতে চান নাই, তেমনি আবার নূতন অর্জিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে নিজেদের কখন কোন অবস্থাতেই হীনমন্যতায় আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই। যুক্তিবাদিতা তাই তাঁহাদের প্রতিপদে বিদ্রোহী করিয়াছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ব্যক্তি-অধিকার সম্বন্ধে তাঁহাদের অতি সচেতন করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের বাণী সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভাব তাঁহাদের এতই প্রভাবিত করিয়াছিল যে অদূর ভবিষ্যতে এই নীতির বাস্তব প্রতিষ্ঠার বিশ্বাসে তাঁহারা নিশ্চিত ছিলেন। [৪৬] এই ভাবে ভাবিত হইয়া ব্যবহারিক জীবনে তাঁহারা প্রতিপদে রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হইয়া সমস্যার সৃষ্টি করিতেন এবং ক্রমে তাঁহাদের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য প্রচারিত নীতি ও নীতিবোধের প্রয়োগের অসামঞ্জস্যের স্বরূপ স্পষ্ট হইয়া, ইংরাজেরও স্বরূপ সম্বন্ধে মোহ ঘুচিয়া গিয়া বাস্তব[৪৬] জীবনকে করিল ঘাত সংঘাতময়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নীতি সম্বন্ধে তাঁহারা হইলেন কূট সমালোচক ও বিশ্লেষক এবং সংবাদপত্র হইল প্রধানত সংগ্রামের হাতিয়ার। ভারতীয় জনজীবনে ইয়ংবেঙ্গলদের ব্যক্তি সংঘর্ষ ও সংঘবদ্ধ সংগ্রাম উভয়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ব্যক্তি সংঘর্ষে দেশীয়গণ দেখিয়াছেন ইহারা ইংরাজ হইতে কোনক্রমেই হেয় নন এবং তাঁহাদের উন্নত মস্তক তরুণদিগের দিশারী হইয়াছে।[৪৭]

রাধানাথ শিকদার জরিপ বিভাগের কর্মে পশ্চিমে ইংরাজ সাহচর্যে বহুদিন ছিলেন।

ইংরাজদিগের মধ্যে তাঁহার বিশাল সুগঠিত স্বাস্থ্যের জন্য তিনি লিভিয়েথান নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেকালে বেআইনী হইলেও কোম্পানীর বিশেষত ইংরাজ কর্মচারীগণ গরিবদের বেগার খাটাইতেন। ১৫-৫-১৮৪৩ দেরাদুনের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ভ্যানসিটার্টের আদেশে রাধানাথ শিকদার ও তাঁহার দুইজন সহকর্মীর পাহাড়িয়া ভৃত্যগণ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মালপত্র লইয়া তাঁহাদের গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। রাধানাথ নিজ ভৃত্যদিগকে বেগার খাটিতে নিষেধ করেন এবং মালপত্র নিজ গৃহে রাখিয়া দেন। শেষ অবধি ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং আসিলে রাধানাথ বিনা রসিদে মালপত্র ছাড়িয়া দিতে অস্বীকৃত হন। বচসায় ম্যাজিস্ট্রেট রাগান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন :—

'জান আমি কে ?'

রাধানাথ সহজভাবে উত্তর দেন—

'জানি। মানুষ। আমারই মত মানুষ।'

ম্যাজিস্ট্রেট ভাবিয়াছিলেন ভীত হইয়া রাধানাথ ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু সাহেব তাহার উত্তর শুনিয়া অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়ার তাঁহারা আকৃতি দেখিয়া শক্তি প্রয়োগে প্রস্তুত না হইয়া বাক্‌যুদ্ধের পর আদালতে রাধানাথকে অভিযুক্ত করেন। মোকদ্দমা বহুদিন চলিবার পর, বিচারে রাধানাথের দুইশত টাকা অর্থদণ্ড হয়। এই উপলক্ষে আদালতের বাহিরেও আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং ক্রমে বেগার খাটান প্রথা কোম্পানী হইতে বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হয়।[৪৮]

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার একটি অধিবেশন হইতেছিল হিন্দুকলেজ গৃহে। সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী সভায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা প্রেসিডেন্সীর ফৌজদারী বিচার ও পুলিশ' সম্বন্ধে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিবার সময় তদানীন্তন হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ স্বনাম ধন্য রিচার্ডসন সাহেব পাঠে বাধা দিয়া রাজদ্রোহের অভিযোগ করিলে বাতবিতণ্ডার আরম্ভ হয় এবং রিচার্ডসনকে তাহার মন্তব্য প্রত্যাহার করিতে বলা হয়। পরে রিচার্ডসন সাহেব মন্তব্য প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। রিচার্ডসন সাহেব ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে অনেক সময় সম্মানজনক অভিমত ব্যক্ত করিতেন না। এই বিষয়টি লইয়াও দেশের বিভিন্ন দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে বাত বিতণ্ডা বহুদিন চলে। ইহার অল্প পরেই বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয়।

এইরূপ ঘটনা ইয়ংবেঙ্গলদিগের সহিত বিদেশীয়দিগের প্রায়শই ঘটিত এবং সর্বত্রই দেশীয়গণ অবাক বিস্ময়ে দেখিয়াছেন আধুনিক ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতা। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে ও মরিশাস ও বুর্বঁতে ভারতীয় শ্রমিকদিগকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও লোভ দেখাইয়া বা অনেকক্ষেত্রে জোর করিয়া চালান দেওয়া হইত। একসময় এইরকম প্রায় একশত কুলিকে কলিকাতার একটি বাড়ীতে জোর করিয়া আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। ডেভিডহেয়ার, মিঃ এন. ক্লার্কের সঙ্গে কিছু তরুণ গিয়া তাহাদের মুক্ত করিয়া দেন।

ইহার পর আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং ১০-৭-১৮৩৮ তারিখ কলিকাতা টাউন হলে একটি মিটিং হয়। এই সভার প্রস্তাব দেখিয়া সরকার একটি অনুসন্ধান কমিটি সুপারিশ অনুসারে একটি আইন পাশ হইয়া এই জাতীয় কুলীদিগের কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। এই সকল ঘটনা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয়বাহী হয়।

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুকলেজের উৎসাহী ছাত্ররা তেরঙ্গা ঝাণ্ডা অকটারলনী মনুমেণ্টে উত্তোলন করে। এই সময়েই একটি ফরাসী জাহাজে বিপ্লবের প্রতি সম্মান দর্শাইয়া ভোজ সভায় বহুজনের সহিত কিছু উৎসাহী ছাত্রের সমাগমও হয়। ইহাতে কিছু ইংরেজ অধিকর্তা ভ্রূকুটি করিলেও ইহাকেও ছাত্রদিগের সম্পূর্ণ সচেতন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা বলিয়াও গণ্য করা যায় না। ইহার অধিকাংশ উচ্ছ্বাস মাত্র।

১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতার ঠিকা বেহারাগণ সরকারী আদেশের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ হইয়া পালকি বহিবার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। ইহাও একান্ত প্রাণধারণের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা মাত্র, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হইতেই শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলদিগের রাজনৈতিক দৃষ্টির উন্মেষের সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু তৃতীয় দশকেই ইয়ংবেঙ্গলদিগের মধ্যে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা আসিয়াছিল। ইংরাজ ও ভারতীয়দিগের অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধেও তাঁহারা সচেতন হন। এই সময়ই দুই দেশের স্বার্থের সংঘাত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া ভারতীয়দিগের পরিত্রানের চেষ্টায় ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সচেতনতা গোষ্ঠীগত স্বার্থ চিন্তায় পরিণত হয় এবং ক্রমে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় তাহা রাজনৈতিক আন্দোলনেও রূপ লয়। ইয়ংবেঙ্গলদিগের মুখপাত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' ১৮৩৮ সালেই বিদ্যা ও বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনায় দেশীয়দিগকে দূরবস্থার কারণ সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে, "ইংলণ্ডীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্যতা হেতু যে ধনাঢ্যতা ইহা সর্বসাধারণ জনকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে কেবল বিদ্যা দ্বারা যে জনদিগের ধনাঢ্যতা সৌভাগ্য হয় এমত তাঁহারা বলেন না বাণিজ্যাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয়।"[৪৯]

ইহার পর দেশীয়গণকে অলসতা ত্যাগ করিয়া উদ্যমশীল হইয়া বাণিজ্য করিতে উৎসাহ দিয়া চাকুরী বিমুখ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, "আমরা জানি এতদ্দেশীয় যাঁহারা পৈতৃক ধন পাইয়াছেন তাঁহারা সেই ধনের উত্তমরূপে ব্যবহার ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টে অতিক্ষুদ্র কার্যের ভার লইয়া তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বৃথা জল্পনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন ইহাতে ইহাদিগের সেইসকল ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে না আর ক্রমে ক্রমে নানাকার্যে মূলধন বিনাশ প্রায় আর কিছুদিন পরে আমরা দেখি যে ঐ ব্যক্তি হয় কারাগারে আছেন "[৫০]

এই আলোচনায় বাঙ্গালীর উদ্যমশীল 'উৎপাদনমুখী'-কর্ম-বিমুখতার' কথাই

বুঝাইতেছে এবং চাকুরী মুখীনতার সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে। এমনকি সেকালের লোভনীয় অর্থকরী 'মচ্ছুদ্দি' কর্মের পরিণতিও যে অতি সর্বনাশমুখী তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অর্থাৎ সেকালের বিজ্ঞানবিমুখতার পরিণতি যে কত ভয়ঙ্কর তাহাও স্পষ্ট ছিল ইয়ংবেঙ্গলদিগের নিকট। তাই ১৮৩১ সালে 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখিয়াছে :—"আমরা শ্রবণ করিতেছি যে মাধব দত্ত মুচ্ছুদ্দিপদ প্রাপ্ত্যর্থ আর. সি. জ্যানকিন কোম্পানীকে ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তিনি যে এই কর্ম লভ্যের জন্য করিয়াছেন, এমত নহে কেবল দস্তুরি লাভমাত্র এই আচরণ অতি কুৎসিত এবং এই ব্যবহার অতি নিন্দনীয়, এমত সকল বৃহত বৃহত ধনী কিন্তু বাণিজ্য দ্বারা কিরূপে অর্থলাভ হয় কি প্রকারে বাণিজ্য করিতে হয় তাহা জ্ঞাত নহেন আর বাণিজ্য যে স্বাধীনতা তাহা ইহারদিগের অন্তঃকরণে একবারও উদয় হয় না ইহারা করেন কি কেবল অর্থপ্রদানপূর্ব্বক দাসত্ব স্বীকার করিয়া আত্মাকে গৌরবান্বিত করিয়া মানেন।"[৫১]

কিন্তু এই আলোচনায় শিল্পায়ণ সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। অবশ্য ইংলণ্ডেও তখন সবেমাত্র পেশাদার যন্ত্রনির্মাতাগণ যন্ত্রদ্বারা যন্ত্রনির্মাণ আরম্ভ করিতেছে।[৫২] সুতরাং ভারতে সেই কল্পনা আসিতেই পারে না। অবশ্য ১৮২০ সালের অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রচেষ্টার সফলতা ১৮৩৩ সালের নূতন ভারত সম্বন্ধীয় কোম্পানীর সনদে দেখা যায়। এই সনদেই ইংরাজের ঔপনিবেশিক নীতির পরিচয় স্পষ্ট হইয়াছে। ১৮৩৪ সালে বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স স্থাপিত হইয়া ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের পূর্ণগ্রাসে ভারতকে আচ্ছাদিত করিতে শুল্ক সুবিধাও আদায় করিয়া লয়। ফলে ইংরাজ মূলধন রেশম, নীল, চা ও কফি উৎপাদনে নিয়োজিত হইয়া ভারতের উদ্যমশীল শিল্প ব্যবসায়ীগণের ভাগ্যবিপর্যয় আনিয়া দেয়।

বিজ্ঞান সচেতনতা না থাকার বিত্তশালীদিগেয় স্বার্থ অনেকাংশে ইংরাজদিগের সহিত যুক্ত ছিল। সুতরাং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অবকাশও খুব বেশী হইতে পারে নাই। বহু শতাব্দীর পরাধীনতার জন্য স্বাজাতিত্ব প্রবল হইয়া শাসক শোষিতের দ্বন্দ্ব প্রকট করে নাই।

ইয়ংবেঙ্গলরা প্রায় সকলেই আত্মীয় বান্ধব হইতে যথেষ্ট বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হন তাহাদের নবীন আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। তাহারা ব্যক্তি কৃতিত্ব মুখী হইলেও পরিবার প্রথা ও গঠনে পুরাতন নীতিবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। সুতরাং সামঞ্জস্যেরও অভাবে দ্বন্দ্বের কারণ হয় এবং অনেকেই পরিবার হইতে ছিন্নমূল হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহারা অনেকেই চাকুরীজীবী ; মাত্র দুই একজন স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাঁহাদের বুদ্ধিবাদী বিকাশ অধিক এবং সংগ্রামও অনেকাংশেই বুদ্ধিবাদী। তাহারা প্রধানত শিল্পপতি নয়। বুদ্ধিবাদী হিসাবেই তাহাদের ইংরাজ সমালোচনার মধ্যদিয়া রাজনৈতিক প্রচেষ্টার প্রকাশনা হয়। তাহাদের মনোভাবের এই পরিবর্তন সংক্রামিত

হয় সকল ইংরেজী শিক্ষিতের মধ্যেই। ইংরেজ প্রভুত্ব আর নির্বিচারে না মানিয়া ইংরেজের দোষগুণের আলোচনায় স্পষ্টতঃ হইতে থাকে দোষ দর্শনেই। সমাজের ন্যায় সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার দাবী করিয়া বিফলতার মধ্যদিয়াই জাতীয়তাবোধের সঞ্চার হয় এবং ইংরাজ বিরোধিতাও রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করে। 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছে, "যাহারা ইংরাজী শিখিতেছেন তাঁহাদিগেরই মন অন্য প্রকার হইয়া উঠিতেছে। তাঁহারা ইংরাজদিগের দোষগুণ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন। ইংরাজ কি পদার্থ বুঝিতে পারিতেছেন,·· অনুমাত্র দোষ দর্শন করিলেই স্পষ্টাক্ষরে তাহা ব্যক্ত করিতে সাহসী হইতেছেন। সর্বতোভাবে সমকক্ষের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন : তুল্যসম্মান ও তুল্যপদ লইয়া বিবাদ করিতেছেন।"[৫৩]

ছাত্রাবস্থায় 'ইয়ংবেঙ্গলদের লইয়া সমাজের সর্বশ্রেণীর আতঙ্ক ছিল বলিয়াই সর্বকর্মে ইহাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইত। কিন্তু ক্রমে সমাজের লোক তাহাদের চিন্তাধারার ও কর্মের মধ্যে আশার আলোক দেখিতে পাইল। তাই হয়তো 'বঙ্গদূত' এই মধ্যবিত্তদের উৎপত্তিতে আশা করিয়াছিল একদিন দেশ স্বাধীন হইবে।[৫৪] কারণ 'পার্থেনন' প্রথম সংখ্যাতেই ইংরাজের ভারতবর্ষে অবস্থান সম্বন্ধে প্রস্তাব ও আইন আদালতে সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় বাহুল্যের প্রতি দোষারোপ করিয়াছিল। 'এনকোয়ারার', 'জ্ঞানান্বেষণ' 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' রাজনীতি আলোচনায় অগ্রসর হয়। শেষ অবধি 'দি কুইল' মুখ্যত রাজনীতি আলোচনারই মুখপত্র হইয়া দাঁড়ায়।

নূতন সনদে ভারতশাসনে ও ব্যবসায়ে কোম্পানীর ব্যয় জনিত সকল ঋণ ভারতবাসীদিগের স্কন্ধে ন্যস্ত হইল। অবাধ বাণিজ্য নীতির জন্য ভারতে ইংরেজ মূলধন ও পণ্য ভারতীয় মূলধন ও শিল্পোদ্যম পর্যুদস্ত করিল। শিক্ষাবিষয়ে ব্যয়ের কোন উল্লেখ না থাকায় নব্য-শিক্ষিতদিগের শঙ্কিত করিল। সভ্যতা বিস্তারের অছিলায় মিশনারীদিগের অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা হইল। লবণ ও আফিমের ব্যবসায় সরকারের কর্তৃত্বাধীন হইল। প্রেস-আইন, সভাবন্ধ আইন যাহা ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক তাহাও রদ করা হইল না। সুপ্রীমকোর্ট স্বাধীন সত্তা হারাইয়া কোম্পানীর অধীন হইল।

এই সনদ লইয়া ভারতে কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারী ও ভারতবাসীর মধ্যে একদিকে দূরত্বের ও দ্বন্দ্বের সূচনা করে। অপরপক্ষে ভারতে অবস্থিত ইংরেজদিগের সহিত কোম্পানীর ও বৃটেনের ব্যবসায়ী ইংরেজের দ্বন্দ্বও আরম্ভ হইল। ইহাতেই সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক পদযাত্রার সূচনা হয়।

৫-১-১৮৩৫ শেরিফ হিকির সভাপতিত্বে দেশীয় ও বিদেশীয় দিগের মিলিত সভায় ইয়ংবেঙ্গল নেতা রসিককৃষ্ণ মল্লিকের অভিমত—ভারতীয়দেরই অভিমত বলা যায়। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম এই, "মিঃ থিওডোর ডিকেন্‌সের সমর্থন করিয়া বলা যায় যে ধারাগুলি ভারতের উপকারের জন্য নয়। কোম্পানীর অংশীদারদের এবং ইংরেজ জাতির স্বার্থেই ইহা করা হইয়াছে। বৃটিশ পার্লামেন্টের এই কথা বিবেচনা করা

উচিত ছিল যে ভারতের রাজস্বের উপর কোম্পানীর ব্যবসায়ের ঋণের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় নাই। কারণ কোম্পানীর কর্মচারীদিগের বোকামি ও অব্যবস্থার জন্য যে ঋণ তাহা তাদের স্কন্ধেই পড়া উচিত আমাদের স্কন্ধে নয়।

১। ডিকেন্‌স মহোদয় যে দুইটি বিষয়ে উল্লেখ করেন নাই আমি সেই সম্বন্ধে বলিব। সামান্য অন্নবস্ত্রের কাঙাল দুর্গত ভারতবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ ভারতীয় রাজস্ব কেন কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য খরচ করা হইবে—যাহা ভারতীয় গণ ঐহিক ও পারত্রিক সুখের পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন।

২। জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক কেই কার্য করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই ইহাও ব্যর্থ করিবার উপায়ও বুঝা যাইবে। বিলাতে হেলিবেরি কলেজে অধ্যয়ন অনাবশ্যক। কারণ ভারতে যারা কার্য করিবেন, ভারতই তাহাদের সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয়। হেলিবেরিতে পাঠ লইয়া ভারতীয়দের অভাব অভিযোগ ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। কারণ ভারতবাসীর পক্ষে এখন বিলাত গমন (জাতিচ্যুতির জন্য) অসম্ভব। সুতরাং পার্লামেন্টের এমন কোন ধারা নির্দ্ধারণ করা উচিত ছিল যদ্বারা ভারতবাসীর সিবিল সার্বিসে প্রবেশ সম্ভব হয়।

ইহাতে ইংলণ্ডবাসীর ষোল আনা স্বার্থ ই রক্ষিত হইয়াছে। তাহাদের জন্যই চা-এর ব্যবসায়ে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হইয়াছে। যদি আমাদের স্বার্থ ই দেখা হইয়া থাকে তাহা হইলে লবণ ও আফিং-এর ব্যবসায়ে কোম্পানীর একমাত্র অধিকার বিলুপ্ত হইল না কেন ?

বড়লাটের অবাধ আইনের আওতায় ও সুপ্রীমকোর্টের কোম্পানীর বিধিবদ্ধ আইনের আওতায় পরিচালনায় ইংরেজ জজের স্বাধীনতা খর্ব হইয়া বড়লাটের স্বেচ্ছাচারীতার বৃদ্ধি হইবে। ভারতীয় ব্যবসার পক্ষে বলবৎ বাধা দূর হইলে এদেশের অর্থ ও শক্তি সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি হইত।

শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথাই নাই, কিন্তু দুটি বিশপের পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা হইল।[৫৫] স্বদেশপ্রীতিই ইহার মুখ্য কথা--বিশ্লেষণ ধারাও সূক্ষ্ম। পার্লামেন্টে, কোম্পানী, ইংরেজ ব্যবসায়ী কাহারও যে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন ইচ্ছাই নাই তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী ইয়ংবেঙ্গলের বিশেষত্ব।

বড়লাট স্যার চার্লস মেটকাফ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দান করিলে ৮-৬-১৯৩৫ তারিখে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সভায় ইংরাজ অসবোর্ন ও ভারতীয়দের মুখপাত্র ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়া ইয়ংবেঙ্গলদের যুক্তি প্রখরতা ও ইংরাজদের দুষ্ট বুদ্ধির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। অসবোর্ন সাহেবের দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা অপ্রয়োজন বলিয়া বক্তৃতা দানের বিরুদ্ধে রসিককৃষ্ণ বলেন, "অসবোর্ন স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি দেশীয় সংবাদপত্র বুঝিতে পারেন না, এমন কি নামগুলিও পড়িতে পারেন না, অথচ তিনি তাহাদের

তুষিয়াছেন। দেশীয় সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে এ বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ জ্ঞানার্জন তার উচিত ছিল। 'সমাচার দর্পণে'-র প্রচার বিভিন্ন জেলায় নানারূপ জ্ঞাতব্য তথ্যে কাগজখানি পূর্ণ থাকে। মহাশয় নিশ্চয় আলোচ্য বিষয়গুলি দেখিয়া ঐ সিদ্ধান্ত করেন নাই। ইংরাজীর ন্যায় দেশীয় সংবাদপত্র একই আইন দ্বারা শাসিত হইতে পারে। এদেশীয়দিগের উপর এরূপ অবিশ্বাস কেন?"[৫৫]

দক্ষিণারঞ্জন তীব্র ভাষায় ভূতপূর্ব গবর্ণর লর্ড বেন্টিং-এর সমালোচনা করেন এই আইন তাঁর সময়ে রহিত না করায়: "প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ না করার জন্য লর্ড উইলিয়ম বেন্টিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগের যথেষ্ট কারণ রহিয়া গিয়াছে। যদি তিনি এই আইন ভাল বিবেচনা না করিতেন তবে উচিত ছিল আইনটি তুলিয়া দেওয়া। এর কোনটাই না করা নিছক ভণ্ডামী মাত্র।"[৫৭]

তীক্ষ্ণ তীব্র ভাষায় সোমপ্রকাশের ষষ্ঠ দশকের অভিমতের সূত্রপাত যে ইয়ংবেঙ্গলরাই করিয়াছেন তৃতীয় দশকেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পরাধীন দেশে প্রথমাবস্থায় বুদ্ধিগত শিক্ষা ও রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না। সেখানে ক্রমে ক্রমে আসে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের প্রচেষ্টা।

প্রতিবাদ সভা ও কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্র অথবা স্মারকলিপি পূর্বেও দেওয়ার রীতি ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য লইয়া রাজনৈতিক সঙ্ঘ বা সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হইয়াছিল হিন্দু কলেজের ইয়ংবেঙ্গল ও ইয়ংবেঙ্গল বহির্ভূত ছাত্ররা। প্রথমাবস্থায় দুই একটি সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সন্ধান পাওয়া যায়,

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা: ভারতবাসীর রাজকার্যের সহিত জড়িত বিষয়ের আলোচনা বিবেচনার সভা। কিন্তু ইহাতে রাজনৈতিক কোন বিচার কখনই হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণের প্রতিবাদে এ সভার চেষ্টা হয়। ব্রহ্মসভা ও ধর্মসভার দলাদলি এর মৃত্যুর কারণ।

ভূম্যধিকারী বা জমিদার সভা: ধর্মসভা ও ব্রহ্মসভার মিলিত ভাবে নিষ্কর ভূমির বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে (১২-১১-১৮৩৭) হিন্দু কলেজে সভা হয়।[১৯] ১৯-৩-১৮৩৮ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। কার্য নির্বাহক সভার সভ্য থিয়োডোর ডিকেন্স, জর্জ প্রিন্সেপ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ রায়, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, আশুতোষ দেব, রামরত্ন রায়, রামকমল সেন, মুনশী আমীর, সত্যচরণ ঘোষাল, রাধাকান্ত দেব। ইহা জমিদারদিগের সভা, সুতরাং ইহাকে পূর্ণ রাজনৈতিক সভা বলা যায় না।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি: রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু উইলিয়াম এডাম

ইংলণ্ডে ভারতবাসীর কল্যাণার্থে ও ইংরেজদিগের ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ইহা স্থাপন করেন (জুলাই ১৮৩১) এই সভা ইংলণ্ডে ভারতীয় ভূম্যধিকারী সভার প্রতিনিধি হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সভার প্রতিনিধি জর্জ টমসনকে সঙ্গে লইয়া সভার আসেন ভারতে ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে (১৮৪২)।

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ঃ ভূম্যধিকারী সভা কখনই সর্বশ্রেণীর বাঙালীর সমস্যা লইয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে ইয়ংবেঙ্গলদিগের প্রচেষ্টা এই উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় সর্ববিষয়েই আলোচনা হইত এবং ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' রাজনীতিক সমালোচনায় সাড়া জাগাইয়া দেয়। ১১-১-১৮৪৩ তারিখ এই সভার পক্ষে টমসন সাহেবকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলার বাগানবাড়ীতে প্রতি সোমবার ইহার অধিবেশন হইত। ইহাতে সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া চিৎপুর ও কলুটোলার মোড়ে ৩১ নং ফৌজদারী বালাখানায় সভার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। সভায় হিন্দু মুসলমানগণ ভারতীয়দিগের আর্থিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থা ও তাহার সম্বন্ধে টমসনের মতামত জানিবার উদ্দেশ্যে আলোচনায় যোগ দিতেন। ইংরাজদের মধ্যেও কেহ কেহ উপস্থিত হইত।

১৮৩৩-এর পূর্ব্বে ভারতে ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার প্রশ্নে এবং নীল চাষের ফলে ভারতীয়দিগের যথেষ্ট উন্নতির কথা রামমোহন রায় বলিলেও ইয়ংবেঙ্গল দল তাহার বিষময় ফল সম্বন্ধে আলোচনায় পিছুপা হন নাই। তাহারা বিভিন্ন দেশে ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার কুফল দেখাইয়া দেশীয়দের সচেতন করিয়াদিয়াছেন। তাহাতে অবশ্য ইংরেজ বসবাস রোধ করা যায় নাই। ক্রমে ইংরাজের অত্যাচারের হাতে ভারতীয় গ্রাম্যজীবন দুঃসহ হইয়া ওঠে। হিন্দু কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণই তাহার সাক্ষ্য। ক্রমেই শিক্ষিত নব আত্মচেতন বুদ্ধিজীবিগণ এই অত্যাচারের দ্বারা সৃষ্ট অসন্তোষকে সঙ্ঘবদ্ধরূপে ইংরেজসরকার-বিমুখ আন্দোলনে পরিণত করে। পত্রিকাগুলি, সভা সমিতি, শিক্ষিত উচ্চপদশালী সৎ কর্মচারী, এমনকি ইংরেজদের মধ্যেও অনেকে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টায় প্রচারে দেশীয়দের সহায়তা করে। ইহাতে ব্যক্তি সচেতনতা জাগ্রত হয় ও জাতীয় অসহায়তার রূপ স্পষ্ট হইয়া সমাধানের জন্য পথ সন্ধানী হয় শিক্ষিত গণ। হিন্দু-কলেজীয়দিগের সচেতন অবদান কতদূর তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছিল— নীল দর্পণ সম্পর্কিত বিচারের সময়। সমগ্র দেশে ইহার প্রভাব প্রবল রূপ ধারণ করে।

১৮৩৩ সালে মেকলে আইনের ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণের প্রয়াসী হইয়া মুখ্যত ব্যর্থ হন। কিন্তু ক্রমে পরিস্থিতি এতই অসহনীয় হইয়া উঠে যে ১৮৪৯ সনে বড়লাটের আইন সচিব জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দের মফস্বলের ফৌজদারী কোর্টের আওতায় বিচারের উদ্দেশ্যে ৪টি আইনের খসড়া

রচনা করেন, আইন কিন্তু খসড়াতেই রহিয়া গেল। ইউরোপীয়রা সমবেত ভাবে ভারতীয়দিগের সহিত সমান পর্যায়ে আসিবার বিরোধিতা করিয়া আন্দোলন করে। কারণ সৎ ভারতীয় বিচারক বা জুরী বর্ণবৈষম্য সম্মুখে রাখিয়া ইউরোপীয়দের বিশেষ সুবিধা না দিলে শোষণ বল্গাহীন ভাবে চালান সম্ভব নয়। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের আদালতের খবরে প্রকাশ মুর, জেমস্, রামান নামে সাহেবদের নরহত্যার অপরাধে ১ বৎসর কারাদণ্ড ও কুড়ি টাকা অর্থ দণ্ড মাত্র হইয়াছিল। ইহা নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। অনেকে আবার একই অপরাধে একসপ্তাহ জেল ও একটাকা জরিমানা দিয়াই রেহাই পাইত। অথচ চুরির দায়ে কানাই মিস্ত্রীর হাত পোড়াইবার আদেশ হয়।[৫৮] আইনের ও ন্যায়ের নামে এইরূপ অত্যাচার চালানই ছিল ঔপনিবেশিক ইংরাজদের নিয়ম। সুতরাং শিক্ষিতগণ বিশেষত ইয়ংবেঙ্গলরা ইংরাজের নিয়মের রাজত্বের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হইলেন। অপর পক্ষে ইংরাজরাও নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে নানাভাবে আন্দোলন করিয়া ইয়ংবেঙ্গলদিগকে নব নব রাজনৈতিক আন্দোলনের পন্থা দেখাইয়া দেওয়াতে বস্তুতপক্ষে সরকারের দৌর্বল্যের স্বরূপ বুঝিয়া ইংরাজ প্রদর্শিত পথে দেশীয়দেরও আন্দোলন আরম্ভ হইল।

রামগোপাল ঘোষ বেথুনের খসড়া আইনের যুক্তি যুক্ততা নানা ঘটনার ও ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন করিয়া একটি পুস্তিকা লেখেন। ইউরোপীয়রা ইহাতে উত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে এগ্রিকালচার ও হর্টিকালচার সোসাইটির সহকারী-সভাপতি পদ হইতে ও সোসাইটির সভ্যপদ হইতে বিতাড়িত করে।

খসড়ার ব্যর্থতায় ইউরোপীয়দের ন্যায় অন্যায় নির্বিশেষে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অদ্ভুত প্রচেষ্টায় ও তাহাদের অন্যায় আন্দোলনের সাফল্যে ভারতীয়রাও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রচেষ্টায় নিরত হইল। 'ভূম্যধিকারী সভা' ও 'বেঙ্গল ব্রিটিশ সোসাইটি' রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হইয়া (১৪-৯-১৮৫১) ন্যাশান্যাল এসোসিয়েশান বা দেশ হিতৈষিণী সভা স্থাপিত হইল। ইহার পরিণত রূপ হইল (২৯-১০-১৮৫১) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা। সম্পাদক হইলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব ও সহ সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ। এই সভায় ইয়ংবেঙ্গল, রামমোহন পন্থী রক্ষণশীল সনাতনী সকলেই যোগ দিলেন। এই সভার বিশেষত্ব হইল ইহাতে কোন ইউরোপীয় সভ্য লওয়া হইল না এবং সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থরক্ষাই হইল মূল উদ্দেশ্য। এই সভাই সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিমূলক ও গণতান্ত্রিক প্রথম সমিতি। ইহার সভ্যবৃন্দ :—রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, আশুতোষ দেব, হরিমোহন সেন ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়।

১৮৫৩ সালে কোম্পানীর সনদের মেয়াদ শেষ হইয়া নূতন সনদ জারি হইবার

কথা। এই জন্যই সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১-১২-১৮৫১ তারিখের সর্বভারতীয় আন্দোলন প্রসারণের উদ্দেশ্যে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের নেতৃস্থানীয়দের নিকট লিখিত পত্রে স্পষ্টরূপে জানান যে "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ শীঘ্রই ফুরাইবে। কাজেই নূতন আন্দোলনের পূর্বে কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে দেশ শাসনের সুব্যবস্থা ও দেশীয়দের উন্নতি সাধনের জন্য শাখা ও মূল সমিতি স্থাপন করা আবশ্যক। শীঘ্রই সকলের একযোগে একটি নিখিল ভারতীয় সভার মাধ্যমে পার্লামেণ্টে আবেদন পত্র পাঠানোই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কারণ ব্রিটিশ ভারতের অঞ্চল সমূহের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন এইরূপ একটি আবেদন পত্র প্রেরণ দ্বারা তাহাই স্পষ্টভাবে সূচিত হইবে"। তিনি আরও জানান 'অবশ্য একান্ত ভাবে যদি একটি সমিতিতে মিলিয়া মিশিয়া কর্ম করা অসুবিধাজনক হয় তাহা হইলে তাঁহারা যেন নিজ নিজ অঞ্চলে প্রতিনিধিমূলক সভা স্থাপন করিয়া ঐরূপ কর্মের আরম্ভ করেন'।

ফলে বোম্বাইতে একটি অনুরূপ স্বতন্ত্র সভা স্থাপিত হয় ১৮৫২ সালের মাঝামাঝি। এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী ছিলেন দাদাভাই নৌরজী। মাদ্রাজ হইতেও প্রচেষ্টা হয়।

শীঘ্রই আবেদন পত্র পার্লামেণ্টে বা বড়লাটের নিকট অথবা উভয়ত প্রেরণের জন্য সর্বপ্রথম শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার কর্ম আরম্ভ হইল। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় উক্ত আবেদন পত্রের মুখ্য রচয়িতা।

প্রস্তাব কিন্তু গৃহীত হয় নাই। অবশ্য ১৮৬২ সালে সরকার লবণের ব্যবসায় ত্যাগ করে। ১৮৫৪ সালের এডুকেশন ডেসপ্যাচ দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ও উচ্চশিক্ষা ইংরাজী মাধ্যমে (স্কুলে) এবং নিম্নশিক্ষা প্রাদেশিক ভাষা মাধ্যমে দিবার কথা স্বীকৃত হইল। ৯-৪-১৮৫৭ তারিখ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন বিচারক ও বিচারাধীনের মধ্যে সাদা কালোর বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রস্তাব করে। সভায় রামগোপাল ঘোষ, টমসন, দিগম্বর মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র ও জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা দান করেন।

কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ায় এই সকল প্রচেষ্টাই ধামাচাপা পড়িয়া গেল। এমনকি ১৮৬১ সাল অবধি ভারতীয়রা ইউরোপীয়দের বিচারের অধিকারও অর্জন করিতে পারে নাই। তথাপি শিক্ষিতদিগের আন্দোলন কিন্তু শুব্ধ হইয়া যায় নাই। সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজ সরকারের কঠোর নীতি শিক্ষিতদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিমুখ করিতে পারে নাই। বিশেষত নীল চাষীদিগের অত্যাচারের প্রতিবাদে আন্দোলন এতই তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে ১৮৬০ সালেই সরকার 'নীল কমিশন' স্থাপনা করিতে বাধ্য হয়। এই কমিশনের সম্মুখে যাহারা যে সব প্রমাণ দাখিল করিয়াছিল তাহার উপেক্ষা করা কমিশনের পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। শেষ অবধি কমিশনের সুপারিশেই ১৮৬৮ সালে নীলচুক্তি আইন রদ হয়।

১৮৫৩ সালের পূর্বে প্রেরিত এই এসোসিয়েশনের আবেদন পত্রতেই সর্বপ্রথম ভারতবাসীদের মতানুযায়ী শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। কংগ্রেস স্থাপনের ৩৫ বৎসর পূর্বে বাঙালী মনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বোধ স্পষ্টভাবে উদিত হইবার পশ্চাতে আধুনিক শিক্ষিত মনের গতির সন্ধান পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীতেই পৃথিবীর সর্বত্র জাতীয়তাবাদের নূতন রাজনৈতিক চেতনা 'জাতীয় রাষ্ট্র' গঠনের প্রেরণা পায়। সুতরাং সেই তুলনামূলক বিচারে ভারতীয় নব্য শিক্ষিতদিগের এই নব-চেতনা উপেক্ষণীয় বলা যায় না।

ইয়ংবেঙ্গলগোষ্ঠী বহির্ভূত রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে ধর্ম ও স্বাদেশিকতা প্রায় সমার্থবাচক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের বিশেষত রাজনারায়ণ বসুর স্বাদেশিকতার প্রেরণা হইতেই উদার হিন্দুদের প্রতি অধিক মোহের প্রাধান্য হইল। নবগোপাল মিত্র তাহার লেখা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ক্রমে হিন্দু মেলা ও পরে জাতীয় সভা স্থাপন করেন। কিন্তু এইসময় হইতেই হিন্দু মুসলমান স্বার্থের সংঘাতে রাজনৈতিক আন্দোলনকেও দ্বিধাগ্রস্ত ও দ্বিমুখী করিয়া তোলে। ইহাতে ইয়ংবেঙ্গলদিগের পাশ্চাত্য ভাবসৃষ্ট সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষতার ভাব স্রোতে বাধা পড়িল।

ডিরোজিয়ান এক বাঙালী সন্ন্যাসী কাথিয়াবাড় রাজ্যে রাজকীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করিয়া রাজকর্মচারীদিগের অন্যায় বন্ধ করিয়াছিলেন এবং রাজাকেও রাজকার্যে বহু সংশোধন করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।[৫৯] এই প্রভাব খ্রীস্টানদেশীয় মিশনারীদিগের মনেও ইংরেজ সম্বন্ধে বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। রেঃ কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় অন্যায়ভাবে বিশপের পদ বিদেশীয়কে অর্পণ করিবার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। রেঃ লালবিহারী দে তাদের ইংরাজ পক্ষপাতিত্বের বিষয় সহজভাবে লইতে পারেন নাই।

সমাজ

ইয়ংবেঙ্গলদের ছাত্রাবস্থার পূর্বেই দেশীয় মধ্যযুগীয় প্রায় চলৎশক্তি হীন সমাজে ভাঙন ধরিয়াছিল সত্য এবং ইহাও সত্য যে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে সামাজিক দ্বন্দ্ব কোন কোন ব্যক্তিকে সামাজিক অযৌক্তিক, অসাময়িক রীতির প্রতি করিয়াছিল শ্রদ্ধাহীন ও সংস্কার চিন্তক। কিছু ফলও হইয়াছিল। গঙ্গাসাগরে শিশু বিসর্জন আইন দ্বারা বন্ধ হইয়াছিল। রামমোহন রায় আত্মীয়সভায় প্রায় সকল সামাজিক প্রথার সম্বন্ধে বিত্তবান সমাজে প্রতিষ্ঠিতদের সহিত যুক্তি শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রালোচনার দ্বারা এইগুলির অসারতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশেষত সতীদাহ বিষয়ে তিনি অগ্রণী হইয়া আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া তাহা আইনদ্বারা বন্ধ করিবার পথ করিয়া দেন। ইহার বিরুদ্ধে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে আন্দোলনও হইয়াছিল। আন্দোলনে হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের সমর্থন ছিল রামমোহনের সহিত। তাহাদের

ভবিষ্যতের একজন নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তী রামমোহনের সকল কর্মের সহকারী ছিলেন। রামমোহনের পূর্বেও বহু পণ্ডিত ব্যক্তিগতভাবে সরকারকে সতীদাহ যে হিন্দুশাস্ত্রের অবধারিত নির্দেশ নয় তাহা জানাইয়াছিল। অবশ্য তাঁহাদের অনেকে আবার সতীদাহের বিরুদ্ধে সংগৃহীত স্বাক্ষরে স্বনাম সংযোজিত করিতেও দ্বিধা করে নাই। তথাপি বলা যায় স্থির সমাজ মানসে গতির সঞ্চার হইয়াছিল তাহা যত স্বল্প হউক না কেন, সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিবার মত নয়।

কিন্তু সেকালের নীতিবোধ ছিল অদ্ভুতভাবে বিসদৃশ। শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস বাঙালী বিত্তবানদের গৃহের দুর্গাপূজা সম্বন্ধে বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

সাহেব অতিথিদিগের জন্য বরফ ও ফরাসী মদ্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আর একদিকের ঘরে বাইজীদের নাচগান চলিয়াছিল পূর্ণোদ্যমে। সাহেব ও বাঙালী বাবুরা আরাম কেদারায় বসিয়া, মৌজ করিয়া হিন্দুস্থানী বাইজীদের গান শুনিতেছিলেন।

স্বয়ং রামমোহনও ইহা হইতে বাদ নহেন। তিনি 'লক্ষ্মী' বাইজীর নৃত্যগীতাদি উপভোগ করিতেন।[৬০] আবার রাজনারায়ণ বসুর পিতৃদেব তাঁহাকে লইয়া গোপনে প্রত্যহ গৃহভ্যন্তরে মুন্‌সী আমীর আলীর বাটী হইতে প্রাপ্ত টিনের বাকসে প্রেরিত বিজাতীয় খাদ্য ও মদ্য গ্রহণ করিতেন। ইহাতে জাতি যাইত না। যবনীগমন লইয়া সংবাদপত্রে রক্ষণশীলদিগকে ধিক্কার দেওয়া হইত।[৬১]

অর্থাৎ দুই একটি সামাজিক সংস্কার-রজ্জু ছিন্ন হইলেও এই অদ্ভুত সামাজিক নীতিবোধের অধিকারী বিত্তবানদের সমাজ-ব্যবস্থার অনুযায়ী সামাজিক অগ্রগতিও সীমাবদ্ধ ছিল। স্বয়ংক্রিয় গতিশক্তি মন্থর হওয়াতে হিন্দু সমাজে সামাজিক বিধি-বিধানের নিত্য নব প্রণয়নে স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যাভিচারও বন্ধ হইলনা—ফলে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক বিধিবিধানও হইল অসীম। কুলবন্ধনের সূচী হইতেই সামাজিক অবক্ষয়ের স্বরূপ স্পষ্ট হইবে—

'কলুদোষ, কোচদোষ, হুলাস্তকদোষ, হেড়াদোষ, রজকদোষ, বেওলা হাড়িদোষ, যবনদোষ, বিপর্যয়দোষ, ত্যাজপুত্রদোষ, অন্যপূর্বদোষ, বলাৎকারদোষ, কন্যাবহির্গম দোষ' ইত্যাদি অন্তহীন সূচী।

কৌলীন্যপ্রথার দ্বারা উদ্ভূত রীতিগুলির বীভৎসতার কিছু নমুনা দেওয়া যায়—,

"সীতারাম বিহা করে তের দিনের মেয়ে।"[৬২]

শুধু ইহাই নয়—"হরি বন্দ্যো বলে কন্যা দিল পার্বতী।
হরিসুত রামদাস বিমাতার পতি।"[৬৩]

আত্মীয়সভার আলোচনার বিষয়বস্তু হইতেই সেকালের আলোচিত সমস্যার কথা জানিতে পারা যায়, জাতিভেদ, নিষিদ্ধ খাদ্য, বালবৈধব্য, বহুবিবাহ, সতীদাহ মরণ, পৌত্তলিকতা ইত্যাদি কুসংস্কার।[৬৪] ইহার সহিত আরও কয়েকটি যোগ করা যাইতে পারে অন্তর্জলি, নরবলি, নারী-শিশু হত্যা, পর্দাপ্রথা, অসবর্ণ বিবাহ, সমুদ্রযাত্রা

নিষিদ্ধ ইত্যাদি।

ইয়ংবেঙ্গলরা প্রতিটি সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তীব্র করিয়া তুলিয়াছেন। আন্দোলনও আরম্ভ হইয়াছিল রামমোহন অনুসৃত সভা সমিতি ও পত্রিকার মাধ্যমেই। কিন্তু দুই গোষ্ঠীর প্রকারগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের জন্যেই ফল হইয়াছে সুদূর প্রসারী ও ব্যাপক। রামমোহনের আত্মীয়সভার গণ্ডি ছিল অতি সীমিত এবং সভ্যগণও ছিল সমাজে উচ্চস্তরের। পক্ষান্তরে হিন্দুকলেজের ছাত্ররা ছিল বয়সে তরুণ, জাতি ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বেপরোয়া, ডিরোজিওর যুক্তিবাদী শিক্ষায় তাহারা পূর্বসংস্কার সম্বন্ধে সন্দিহান এবং নীতিবিচারে আধুনিক একান্ত সত্যের পূজারী ; প্রকাশ্যে সরবে আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় সমাজে, পরিবার উপেক্ষা করিয়া চলিতেন বলিয়াই রক্ষণশীল সমাজ, মিশনারী সকলেই ছিল শঙ্কিত। ন্যায় নীতি বোধ দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বদেশ সেবায় মানব সেবা করিতেন। করুণা নয়, সরবে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাহাদের সংগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই তাহাদের সংগ্রামের পরিধি হইয়াছিল ব্যাপক। তাহারা সমাজের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াই সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রীলোকের সম্পত্তিতে অধিকার, অসবর্ণ বিবাহ একই সূত্রে গ্রথিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখ্য কথা স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। তাই তাহাদের সংগ্রাম শুধুমাত্র একটি সমস্যাকে আইনত স্বীকৃতি দেওয়াই সমস্যার সমাধান ভাবিয়া পরিচালিত হয় নাই। ধর্মচিন্তা, সমাজ-চিন্তা, শিক্ষা চিন্তা সর্বস্তরেই ইহারা পূর্বসংস্কার ভাঙ্গিয়া বৈপ্লবিক ধারা প্রবর্তিত করিয়া চলিলেন। ইহারা খ্রীস্টান হইয়াও হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়নকারী ও ভারতপ্রেমিক এবং ইংরাজ শোষণের বিরোধী সোচ্চার প্রতিবাদী। তাই বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রচেষ্টায় তাহারা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বাদানুবাদের মধ্যেই হারাইয়া যান নাই। বেঙ্গল স্পেকটেটর (এপ্রিল ১৮৪২) সোজাসুজি বলিয়াছে, "বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ; কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামীর পরলোক হইলে বিবাহ করণে সক্ষম না হয়—এতদ্বিষয় প্রস্তাব বহুবৎসরাবধি হইতেছে—কিন্তু যে পর্যন্ত উক্ত প্রতিবন্ধকে সম্পূর্ণরূপে অনাস্থা হইয়া নূতন রীতির সংস্থাপনা না হয়, তদবধি আমরা তদাবশ্যকতার নিপিত্তে বারম্বার অনুশীলন করিতে নিবৃত্ত হইব না।"[৬৫]

শাস্ত্র হইতে স্বীকৃতি পাইয়াও সমাজে ইহার প্রচলন সম্ভব হয় নাই। কারণ ইহার পরও বিত্তশালীগণ স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। তাহারাও শাস্ত্র হইতে বহু যুক্তি দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রের গোলক ধাঁধায় ঈশ্বরচন্দ্র লড়াই করিয়াছেন। শেষ অবধি জন সমর্থনে এবং ব্রিটিশ আনুকূল্যেই বিধবাবিবাহ আইন প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও ফল বিশেষ হয় নাই। কারণ বিধবা বিবাহ সমাজে বিশেষ প্রচলিত হয় নাই। ১৮৫৬ হইতে ১৯০০ অবধি বিধবা বিবাহের হিসাবে দেখা যায়[৬৬]

বাংলা—১১৭ [বিদ্যাসাগরের কালে—৪৬
ব্রাহ্ম সমাজে —৪১
অপরাপর —৩০]

বোম্বাই—১০০

মাদ্রাজ— ৩০

পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ—৩০

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় ইয়ংবেঙ্গলদের সামাজিক দৃষ্টি কতদূর বাস্তবমুখী। কারণ কেবল আইন দ্বারা নারী সমস্যার-মালাটির একটি অংশের সংযোজনে ফল বিশেষ হইবে না। বস্তুত সামাজিক স্বীকৃতির প্রভাব আইনের প্রভাব হইতে অনেক গভীর ও ব্যাপক। তাই তাহারা স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বলিয়াছেন। কারণ স্ত্রী স্বাধীনতা বা স্ত্রী-ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়াই এই সমস্যার প্রকৃত বাস্তব সমাধান হইতে পারে। আর একটি পন্থা হইতেছে শিক্ষিত যুবকগণ যদি অগ্রগামী হইয়া এই বিবাহের প্রতি উন্মুখ হয় তাহা হইলেই সমাজে ক্রমে ইহা স্বীকৃত হইবে। ভীত সন্ত্রস্তভাবে কখনই কোন সামাজিক অন্যায় দূর করা যায় না এবং সত্যের প্রতিষ্ঠাও কাপুরুষের কর্ম নয়। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিধবা বিবাহ করিয়া পথ দেখাইতে দ্বিধা করেন নাই। অপরপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাস্তবে বিধবা বিবাহের প্রচেষ্টায় ঠকিয়া ঠকিয়া শেষ অবধি অতিষ্ঠ হইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। পণ্ডিতা রমাবাই বলিয়াছেন—"উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ আগামী বহু দিনের মধ্যে সর্বস্বীকৃত ও অনুসরিত হইবার আশা নাই।"[৬৭]

সমস্যাটি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল। শিশু হত্যা বিশেষত নারী-শিশু হত্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া জে. পি. গ্রান্ট (সেক্রেটারি ল-কমিশন) কলিকাতা, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের আদালতে বিধবা বিবাহের সম্বন্ধে মতামত জানিতে চাহিয়া দেখিলেন যে কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দু দিগের মধ্যেই সমস্যাটি সীমিত হইলেও ধর্মীয় দৃষ্টিতে ইহকাল পরকালের হিন্দু ধারণা সম্পর্কিত এবং দায় ভাগের (সম্পত্তির অধিকার আইন) মূল ভিত অবধি জড়িত।[৫৮] সুতরাং আইন শুধু বিবাহ সম্পর্কে করিলেই উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। সুতরাং ইংরেজ সরকারও এই সম্পর্কে অতি উৎসাহী হন নাই।

এই সংস্কার প্রচেষ্টা লইয়া গণ সচেতনতা অধিক বৃদ্ধি পাইল। ইয়ংবেঙ্গল দল আরও সোচ্চার হইয়া আমূল সংস্কারের পক্ষে বহু সহি সংগ্রহ করিয়া সরকারে প্রেরণ করিলেন। তাহারা আন্দোলনটিকে এমন তীব্র বাদানুবাদের পর্যায়ে লইয়া গিয়াছিলেন যে রক্ষণশীল দল হইতে রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রায় ৩৭ হাজার স্বাক্ষর সহ ভারত সরকারের নিকট বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে আবেদন পত্র গিয়াছিল। সেখানেও শাস্ত্র হইতে আবেদনের সমর্থনে যুক্তি দিয়া দেখান হইয়াছে যে মনু, মহাভারত, প্রভৃতি মহাগ্রন্থে কোথাও বিধবা বিবাহের সমর্থন নাই।

আইন পাশ হইল, কিন্তু ক্রমে বুঝিতে পারা গেল ইহাতে সমস্যার সমাধান হয় নাই।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গলগণ আইনটির কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংশোধনের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। বিধবা বিবাহ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে না হইলে হিন্দু সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে এবং আদালতের পক্ষে কোনটি সঙ্গত বা কোনটি অসঙ্গত তাহা বিচার করা প্রায় অসম্ভব হইবে। সেইজন্যই তাঁহারা দুটি অঙ্গীকার স্বাক্ষর করিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অঙ্গীকার পত্র দুটি এইরূপ,

1. **Declaration 'A'**

"I ···, widow of bachelor, and I···widow or spinster, do hereby jointly and severally declare that of our own free will and accord, we have solemnized our marriage wirh each other on this day of

Witness our hands etc.
The above declaration were made in the presence of·······

2. **Agreement – 'B'**

"I····, having taken····as my wedded wife on this day, do hereby bind myself not to contract a second marriage during her lifetime, and in breach of this engagement on my part, to pay to her the sum of company's Rupees······on the date of any second marriage."

বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে অঙ্গীকার পত্র দুটি রেজেস্ট্রি করিতে হইবে এবং পাত্রপাত্রী উভয়েই এই চুক্তির শর্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে। বিবাহিত জীবনে বিশ্বাস ভঙ্গ করিলে এই চুক্তিপত্র কার্যকর হইবে না।

ইয়ংবেঙ্গলদের সামাজিক দৃষ্টি বাস্তববাদী বলিয়াই তাঁহারা রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থার প্রচেষ্টায় ছিলেন। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন পাশ হয় ১৮৭২ সালে Civil Marriage Act. III নামে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল এই আইন কেবল বিধবাদের পুনর্বিবাহে মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ না-রাখিয়া, যে কোন স্বাধীন ও স্বেচ্ছাধীন পুরুষ ও নারীর বিবাহের আইনে পরিণত করা। আধুনিক যুগের ইহাই লক্ষণ। নারী ও পুরুষ স্বাধীন এবং স্বেচ্ছায় শর্ত মানিয়া সাক্ষীদের সম্মুখে চুক্তিপত্র করিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের আইন পাস হয় নাই। ফলে ভবিষ্যতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের ঋণে জর্জরিত হইয়া প্রবঞ্চনা বন্ধ করিবার জন্য

পাত্রের নিকট হইতে অঙ্গীকার পত্র সহি করাইয়া লইতেন—একটাকার ষ্ট্যাম্প কাগজে চারজন সম্ভ্রান্ত লোকের স্বাক্ষর সহিত। এই চুক্তি পত্র সমস্যার হইলেও সমাধান হয় নাই।

ইয়ংবেঙ্গল বিধবা বিবাহের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ছিলেন। কারণ নারীর অধিকারবোধ জাগ্রত করিয়া তাহার স্বাধীন সত্তার সামাজিক স্বীকৃতি স্বভাবতই আসিবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হইতে এবং অপরপক্ষে সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতিতে আর্থিক দিক হইতে নারীর স্থায়িত্ব তার অগ্রগমনের প্রয়াসকে করিবে সফল।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ও বেথুন সোসাইটিতে ইয়ংবেঙ্গল স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিয়াছেন আর্থিকভাবে ও সমাজে পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে। এই সকল সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু হইতে জানিতে পারা যায় যে তাহাদের উদ্দাম উৎসাহ না হইলে এই কর্মে অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইত আরও শ্লথগতিতে।

হিন্দুকলেজীয়দের সাহিত্য সাধনার পথের উন্মোচনঃ—বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা দান

হিন্দুকলেজ স্থাপনার ফলে যখন বাংলা তথা ভারতে নবযুগের সূচনা হইয়া নূতন আধুনিক মানুষের যেমন সৃষ্টি হইতে লাগিল, তেমনি এই নূতন সাংস্কৃতিক প্রতিভূ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবযুগের পথ প্রস্তুতের নিমিত্ত মানুষের শ্রেষ্ঠ ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে বাংলা ভাষারও নব রূপায়ণ হইতে লাগিল।

এই সাহিত্যিক ভাষার আধুনিক রূপ পরিগ্রহণের প্রচেষ্টায় নানা ব্যক্তির ও গোষ্ঠীও অবদান ছিল। কিন্তু প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য পরিণতিতে এক ফলমুখী হইয়াছিল—যুগোপযোগী একটি ভব্য, সাবলীল, সর্বজনগ্রাহ্য সাংস্কৃতিক ভাষা প্রচলনের প্রচেষ্টায়। এই প্রচেষ্টায় প্রধানত একই সাংস্কৃতিক ভাষার দুটি ধারার চর্চার প্রয়াস দেখা যায়। একটি সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত আশ্রয়ী এবং অপরটি সংস্কৃত আশ্রয়ী হইয়াও বাংলা গদ্যভাষায় লঘু কথ্যভঙ্গি সঞ্চারিত করিবার প্রচেষ্টা। এই দুই প্রচেষ্টাতেই হিন্দুকলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবদান ক্রমে এমন এক সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক ভাষার মাধ্যম সৃষ্টি করে যাহা আধুনিক বিংশ শতকের ভব্য ভাষার পূর্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইহাতে একদিকে যেমন প্রবন্ধের উপযুক্ত সাহিত্যিক ভাষা আদর্শ রূপ পায় সকলের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া, তেমনি আবার কথ্যভঙ্গি আশ্রিত গদ্যভাষার ক্রম পরিণতি হয় প্রধানত রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, নীলমণি বসাক, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও মধুসূদনের মধ্য দিয়া। বাংলা নাটকের সংলাপের গদ্যেও প্রবর্তিত হয় সম্পূর্ণ কথ্য ভাষা।

হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার কালে যে বাংলা গদ্য রচনা সাংস্কৃতিক ভাব প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত ছিল তাহা বিতর্কনিবন্ধ বা তত্ত্বনিবন্ধ গদ্যরচনা মাত্র, রসপ্রাণ সাহিত্য পদ-বাচ্য নয়। রামমোহন রায় ও তৎকালীন লেখকরা বাংলা গদ্যকে যুক্তি-

তর্ক রূপায়ণের প্রচেষ্টায় সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিয়া যুক্তিগুলি সুসমৃদ্ধভাবে স্তরেস্তরে সজ্জিত করিয়া, ব্যঙ্গের তীব্রতায় পাঠকমনকে যুক্তির মর্ম অনুধাবনে সক্ষম করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সমালোচকের দৃষ্টিতে এই প্রচেষ্টায় সাহিত্যের লক্ষণ প্রায় অনুপস্থিত। তাঁহারা পাঠ্য পুস্তকের বাহিরে ব্যাপকভাবে গদ্য রচনার মধ্য দিয়া নবীন উৎসাহীদের সাহিত্য সেবার কর্মে প্ররোচিত করিয়াছেন এবং অসংখ্য সাময়িক পত্র মাধ্যমে সকলের প্রচেষ্টায় গদ্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের প্রয়াস সত্ত্বেও উদাসীন বাংলার জনসাধারণ যে ফার্সিবহুল গদ্যে চিঠিপত্র প্রভৃতি কর্ম চালাইত, তাহার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। গদ্যে নিত্যনূতন সম্পাদনের ও গঠনশীল শৈলীর প্রবর্তনের প্রচেষ্টায় শিক্ষিতগণ প্রয়াসী হন। পাঠ্য পুস্তক ও ধর্মালোচনামূলক পুস্তক এক সাময়িকপত্রের মাধ্যমে এই প্রয়াস চলিতে থাকে। ফলে ভাষা ক্রমশঃ লঘু, সরল, স্বচ্ছল এবং রসাল হইয়া ওঠে এবং পুরাতন সংস্কৃত রচনার ধারা মুক্ত হয়।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার প্রসারের ফলে সাংবাদিকতায় বাঙালীর অগ্রগতি হয় প্রশংসনীয়। ভাষার উন্নতির কিছু নিদর্শন দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে একথার যৌক্তিকতা। ১৮২২ সালের সমাচার দর্পণ হইতে, "কুলীন লোকেরা বিদ্যা ও ধন রহিত। আপন ক্ষমতায় উদর পালন হয় না, ইহাতে—বয়ঃক্রীড়া কিরূপে চলে? কেবল অনায়াস সাধ্য চুলকাটা, পৈতা মোটা, লম্বা কাছা, উড়ে কোঁচা করিয়া লম্পটাভিমানী হয়। তাহারা ইষ্টসিদ্ধির কারণ এক এক বাবুর সহিত বয়স্যতার আলাপ দ্বারা সর্বদা সহবাস করিয়া প্রীতি জন্মায়, সুতরাং আহারাদি চিন্তা দূর হয়।"

১৮৪৭ সালের সংবাদ প্রভাকর হইতে,

"ঠাকুরবংশীয় মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। যেহেতু প্রভাকরের উন্নতি, সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু, তাহা কেবল ঐ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমত ইহাকে স্থাপিত করেন।"

এই দৃষ্টান্ত দুটির ভাষায় ক্রম উন্নতির লক্ষণ স্পষ্ট। দ্বিতীয়টির ভাষা উপভোগ্য সুমার্জিত। ইহার পর হিন্দুকলেজের প্রাক্তন ছাত্র ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীযুক্ত রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রকাশিত সাময়িক পত্রের ভাষা আরও সুবোধ্য হয়। তাঁহারা কেবল জ্ঞানচর্চায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া কিছু কিছু সাহিত্য রচনার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল। তদ্‌ভব শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি কথ্যভাষার রীতি অনুযায়ী কাব্যরচনা, ফার্সির সুবোধ্য মিশ্রণ, কথ্য ও লেখ্য ভাষায় ক্রিয়াপদের প্রয়োগ প্রভৃতি প্রগতিশীলতার পরিচায়ক। নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণের হৃদয়ে প্রবেশ করা এবং সরল ভাষাই সেক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক। ফলে ক্রমশ ভাষাকে লঘু করিয়া আনিবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং পাঠ্য পুস্তকের রচনার ক্ষেত্রেও এই প্রচেষ্টা প্রাধান্য লাভ করে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫০ সালে এই প্রসঙ্গে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা উল্লেখযোগ্য, "কোন কোন স্থলে যদি সংস্কৃত পদ চলিত হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রয়োগ করিলে হানি নাই বরং তাহাতে রচনার পরিপাট্য হয়। কিন্তু যে স্থলে রসবিস্তার কিম্বা দীর্ঘ বক্তৃতা করা অভিপ্রেত নহে, সে-স্থলে অপ্রসিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া সহজ শব্দ ব্যবহার করাই উচিত। যাহারা গৌড়ীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যদি তাঁহারা চলিত ভাষায় বিপরীত শব্দ প্রয়োগ করিতে সর্বদা প্রয়াস করেন, তবে গৌড়ীয় ভাষার কখনও উন্নতি হইবে না। গ্রন্থ রচনার শব্দ এবং চলিত ভাষা ক্রমশ একরূপ হইলেই শ্রেয় সম্ভাবনা। ইতর এবং মূর্খ লোকদিগের মধ্যে চলিত ভাষা লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য আমার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু সাধুভাষার অর্থ, সাধু লোকের বাণী ; অতএব, পণ্ডিতেরা কথোপকথন কালে অভ্যাসবশত যে যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সামান্য বিষয়ের রচনায় তদপেক্ষা কঠিন শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য হয় না।"

কৃষ্ণমোহনের এই অভিমত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ভাষাজ্ঞানের পরিচায়ক। চলিত ভাষাই যে স্বাভাবিক ভাষা এবং শিষ্টজনের কথ্য ভাষাতেই যে আদর্শ গদ্য রচিত হইতে পারে সে সত্য তিনি বুঝিয়াছিলেন। যদিও স্বীয় রচনায় ইহা রূপায়িত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই—তথাপি মাইকেল মধুসূদনের মধ্য দিয়া সফল সার্থক প্রচেষ্টায় সূচনা স্পষ্ট হইয়া উঠে।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোকে ব্যবহৃত কথ্যভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের মধ্যে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। প্যারীচাঁদ সার্থক ভাবে কৃষ্ণমোহনের নীতি অনুসারী হইতে পারেন নাই। অবশ্য তখন অবধি প্রকৃত বাংলা সাধুজনের কথ্য ভাষার স্পষ্ট সার্বজনীন, রূপটিও হয়তো প্যারীচাঁদের নিকট স্পষ্ট হয় নাই। তাই উপভাষাই প্রাধান্য পাইয়াছে। আদর্শ কথ্য ভাষা শিক্ষিত জনের শিষ্ট সমাজে ব্যবহৃত মুখের ভাষা, ইহা জটিল নয়। ইহাতে সূক্ষ্ম ও উচ্চভাব সহজেই রূপায়িত করা যায় সাবলীল ও সরসভাবে। টেকচাঁদ ঠাকুর ইহা সম্পূর্ণ প্রয়োগের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলেও বাংলা ভাষাকে স্বকীয়তা বিকাশে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। ফলে স্বল্পকাল মধ্যে শিক্ষিত সাধারণের মুখের ভাষায় বাংলা গদ্য সাহিত্য ও নাট্য সাহিত্য রচিত হয়।

মধুসূদন তাঁহার নাটকের সংলাপের ভাষায় তৎসম শব্দবহুল গদ্য চলতি ভাষা ব্যবহার করিলেন। আদর্শ বাংলা কথ্য ভাষার স্বরূপ বুঝিয়া নাটক সার্থকভাবে প্রয়োগ মধুসূদনই করিলেন। প্যারীচাঁদ উপন্যাসে কথ্য ভাষার প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন ১৮৫০ সালে এবং মধুসূদন সার্থকভাবে আদর্শ গদ্য ভাষার প্রয়োগ করিলেন শর্মিষ্ঠা নাটকে। ক্রমে দীনবন্ধু মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ গদ্যের ক্রম পরিবর্তনের ধারায় আগামীযুগের পূর্বাভাস সূচিত করিলেন।

প্যারীচাঁদ বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলালে' আংশিক কথ্য ভাষার ও সাধু প্রচলিত সংস্কৃত ভিত্তিক ভাষার প্রয়োগ করিলেও রচনায় সরসতা ও নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়াছেন। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত 'নীলদর্পণ' নাটকে দীনবন্ধু মিত্র তোরাপ, আদুরী ক্ষেত্রমণির ভাষা সুন্দর আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় প্রকাশ করিলেও শিক্ষিত ভব্য চরিত্রের ভাষা স্বাভাবিক হয় নাই। অবশ্য পরবর্তী নাটকগুলিতে বিশেষত ১৮৬৮ সালের 'সধবার একাদশী' নাটকে এই দোষ সংশোধিত হইয়াছে।

১৮৬২ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' অভিনবত্বের স্বাক্ষর রাখে। ইহা কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসীদের কথ্য ভাষা নির্ভর। এই ভাষার মাধ্যমে অবাধে মনের কথা বলা যায়। মুখের ভাষায় ব্যবহৃত ফার্সি বা উর্দু শব্দ তৎসম শব্দের ন্যায় স্বচ্ছন্দে প্রকাশিত হইতে পারে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত সংস্কৃতাশ্রয়ী গদ্য ভাষার সুঠাম দেহটি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। বাংলাগদ্যের পদবিন্যাস রীতি ইহারাই সুষ্ঠুভাবে প্রবর্তন করেন। দেবেন্দ্রনাথের রচনা রামমোহনের তুলনায় পদবিন্যাসের ব্যাপারে উন্নত। আদর্শ সাধু বাংলা-গদ্যে নিখুঁত পদবিন্যাস রীতি বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ প্রবর্তনা। দেবেন্দ্রনাথের গদ্য রচনার ধারা রাজনারায়ণ বসু ও অন্যান্য লেখকের রচনায় অনুসৃত হইয়াছে' ইহাতে শান্ত দৃঢ়তা ও ভারসাম্য রক্ষার সুন্দর প্রচেষ্টাও স্পষ্ট। দেবেন্দ্রনাথের অনুগামীদের মধ্যে রাজনারায়ণ লিখিত 'সেকাল আর একাল' -এর ন্যায় সুখপাঠ্য গ্রন্থ বিরল। শাস্ত্রব্যাখ্যাত্মক প্রবন্ধে উভয়ের ভাষা কিন্তু গুরু গম্ভীর। তাঁহাদের শান্ত অচঞ্চল বাক্যবিন্যাস রীতির প্রভাব বহু লেখকের উপর পড়িয়াছে। বিষয় বস্তুর গাম্ভীর্য, শান্তিপ্রিয় চেতনার প্রভাব তাঁহাদের রচনার মন্থরতা ও আত্মলীন ভাব লইয়া আসিয়াছে।

যুক্তি নির্ভর প্রাবন্ধিকদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ। তাঁহার ভাষা সংস্কৃতানুগ। দৃঢ়বদ্ধ, কিন্তু ক্ষিপ্র ও সংক্ষিপ্ত বাক্য মণ্ডিত। তাঁহার সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব প্রথম রোমান্টিক গল্প সাহিত্যের উপযোগী গদ্য রচনা। ইহা অবশ্য অনুবাদ অথবা ছায়াবলম্বী সাহিত্য। কিন্তু ইহাতে স্বকীয়তার নিদর্শনও বর্তমান। তাঁহার ১৮৫৭ সালে লিখিত (১৮৬২ সালে প্রকাশিত) ঐতিহাসিক উপন্যাস নামে এক রচনা প্রকাশিত হইলে বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসাশ্রয়ী গল্প উপন্যাস সাহিত্যের সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করে। এই প্রসঙ্গে 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামে দুটি রোমান্টিক গল্প আছে (Romance of History হইতে গৃহীত) ভূদেব সংস্কৃত ভাষাগত প্রভাবের একান্ত অনুরাগী হইলেও তাঁহার রচনাশৈলীতে কোন আড়ষ্টতা ছিল না। এইক্ষেত্রে ভূদেবের কোন পূর্বসূরী ছিল না। ইহার উৎসও পাশ্চাত্য সাহিত্য। এই রোমান্টিকতার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপী ক্রিয়াশীল ছিল।

ক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যদিয়া কথ্যভাষা ও সাধু লিখিত ভাষার সুন্দর সমন্বিত রূপটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দুকলেজের চারিত্রিক পরিবর্তন, নামবদল এবং তাহার সামাজিক সাংস্কৃতিক ফল

"বেশ কিছুক্ষণ আমার ও ভূতপূর্ব সভাপতির (বেথুন সাহেব) মধ্যে তীব্র কথা কাটাকাটির পর আমি এতই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে আমি বিদ্যালয়ের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে দেশীয় তত্ত্বাবধান নাই।[১]"

এই আক্ষেপ করিয়া রাজা রাধাকান্ত দেব ৭-১০-১৮৫১ তারিখে চিঠি দিয়াছেন ডকটর হোরেস্ হেম্যান উইলসনকে। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইয়াছিল ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি। রাজা রাধাকান্ত দেবের নাম হিন্দু কলেজের সাহিত শুধুমাত্র জড়িত ছিল বলিলে ভুল হইবে—বস্তুতঃ হিন্দু কলেজ দোষগুণ লইয়া তাঁহারই জীবনের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। হিন্দুকলেজের উদ্যোক্তা রক্ষণশীলদের দৃষ্টি অনুসারী পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শের যে একটি আদর্শরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল তিনি দীর্ঘদিন তাহারই অতন্দ্র দিকপাল হইয়া হিন্দু কলেজ পরিচালনা করিয়াছেন। তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন যে সরকারী অনুদানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুকলেজের তত্ত্বাবধান লইয়া সরকারী হস্তক্ষেপের সূত্রপাত হয় এবং বেথুন সাহেবের সময় হইতেই সরকারী কাউন্সিল অব এডুকেশনের হস্তক্ষেপ অত্যধিক হইয়া হিন্দুকলেজ পরিচালক সমিতির সহিত তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয়। (হিন্দু কলেজের মৌলিক নীতি লইয়াই বিরোধ) এবং সরকারী হস্তক্ষেপ, আর দেশীয়দের স্বাধীন পরিচাললক সমিতির কোন মূল্যই দেয় না।

নীতিগত এই বিরোধ এতই অধিক হইয়াছিল মহিলা বিদ্যালয় স্থাপনার প্রাথমিক অনুষ্ঠানে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন রক্ষণশীল হিন্দুদের এমন কি রাজা রাধাকান্ত দেবকেও আমন্ত্রণ জানান নাই[২]। এবং ইহার অল্পকালের মধ্যেই রাজা রাধাকান্ত দেব স্বয়ং একটি স্ত্রী-শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন।

অথচ যে কয়েকজন ইউরোপীয় আন্তরিকভাবে ভারতের মঙ্গলার্থে শিক্ষাক্ষেত্রে ও অন্যান্যক্ষেত্রে কার্য করিয়াছেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন তাঁহাদেরই অন্যতম। রাজা রাধাকান্ত দেব ও তাঁহার গোষ্ঠীর রক্ষণশীলতাই বেথুনের সহিত নীতি বিরোধের প্রধান কারণ। অন্যথায় বেথুনকে অন্যান্য সংস্কারক ও হিন্দু কলেজীয়দের সহিত সুসমন্বয়ে সংস্কার কর্ম করিতে দেখা যায়। তিনি চতুর সিবিলিয়ান রূপে কোম্পানীর ব্যবসায়ী স্বার্থে বিত্তশালী রক্ষণশীলদের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত না হইয়া, পরোক্ষভাবে, হিন্দুকলেজের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করিয়াছিলেন।

ভারতের উন্নয়ন ও ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষা উভয় প্রয়োজন পূর্তির প্রচেষ্টাই তাঁহার শিক্ষা নীতির বিধায়ক হইয়াছিল। এই বিরোধের পরিণতি হিন্দু কলেজের চরিত্র পরিবর্তনের জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ অবধারিত করে এবং ফলে নামেরও পরিবর্তন করা হয় আবশ্যক বোধে।

প্রথমাবধি হিন্দুকলেজ একান্তভাবেই দেশীয় কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছিল। কোম্পানীর অথবা ইংরাজ উচ্চ পদাধিকারীর কোন শাসনই সেখানে চলিত না। ইহা সেইজন্য একান্তভাবেই ছিল দেশীয়দের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইহার প্রতিষ্ঠা হইতেই দেশীয়দের দলাদলির জন্য তাঁহাদের সম্মিলিত প্রয়াস কখনই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই এবং ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্রুতলয়ে অগ্রগতিও সম্ভব হয় নাই। আবার অর্থসাহায্যের ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুত অর্থ সাহায্য ও প্রকৃত সাহায্যের মধ্যে ব্যবধান অনেক ক্ষেত্রে বড়ই অধিক হইয়া পড়িত বলিয়া কলেজের নির্দিষ্ট আয় হইতে ব্যয় সঙ্কুলান কঠিন হইয়া পড়িলে কলেজ কমিটি ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সরকারের নিকট আবেদন করেন। এই আবেদন মঞ্জুর হইবার সংবাদ পাইয়া রাধাকান্ত দেব সেক্রেটারীকে চিঠি লিখিয়া জানাইলেন,—

"আমাদের সমগ্র প্রার্থনাই সকাউনসিল বড়লাট বাহাদুর মঞ্জুর করিয়াছেন। তাঁহারা কলেজের পৃষ্ঠপোষক হইতে সম্মত"[৩]। কিন্তু ১৭।৪।১৮২৫ তারিখে হিন্দু-কলেজের কোষাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানী দেউলিয়া হইলে কলেজের ৬০ হাজার টাকা উদ্ধারের কোন আশাই রহিল না। কলেজ কর্তৃপক্ষ অর্থ সাহায্যের জন্য সরকারের দ্বারস্থ হইলে সরকার কলেজকে একটি মাসহারা দিতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সর্ত হয় সরকার-তরফ হইতে কমিটিতে এক বা একাধিক প্রতিনিধি থাকিয়া কলেজ পরিচালনকার্যে সহায়তা করিবেন। ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসন সরকার পক্ষে কমিটিতে গৃহীত হইয়া ইহার ভাইস প্রেসিডেন্ট হইলেন।

হিন্দু কলেজ নবনির্মিত সরকারী সংস্কৃত কলেজের দালানে উঠিয়া আসিল ১।৫।১৮২৬ তারিখে এবং এই দিন হইতেই কলেজের আমূল পরিবর্তনের সংঘাত আরম্ভ হইল। ঐ তারিখে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার শিক্ষায় কলেজের রক্ষণশীল গতিহীন আবহাওয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়া দিল। ইহার পরিণতিতে ডিরোজিওকে পদত্যাগ করিতে হয় এবং ছাত্রদেরও নানাভাবে স্বাধীন চিন্তা, চলাফেরা, অশন বসন, সম্বন্ধে বাধানিষেধে বাঁধিবার চেষ্টা হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ-কমিটিতে শেষ অবধি ইহা হিন্দুদের দাবী বলিয়া রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ও রাধামাধব বন্দোপাধ্যায়ের চাপে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেও মত পার্থক্য তীব্র হয়। ইউরোপীয়গণ এইক্ষেত্রে নীরব বাধ্য হইলেন। ডিরোজিওর পদত্যাগ পত্রের যুক্তিগুলি বিচার করিলেও রাধাকান্ত দেব অসম্মত হন। ইহার পর হইতে কলেজের শিক্ষক নির্বাচনে রাধাকান্ত দেব হিন্দু ধর্মীয়দের সংস্কার রক্ষায়

অনুকূলদেরই প্রাধান্য দিতে লাগিলেন[৪]।

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে সরকারী আদেশ অনুযায়ী হিন্দুকলেজ কমিটির সকল সভ্যই জেনারেল কমিটি অব পাবলিক্ ইনস্ট্রাকশন অর্থাৎ সরকার নিযুক্ত শিক্ষা বিষয়ক কমিটির সদস্য হইলেন এবং ইহার কার্য নির্বাহক কমিটিতে দুইজন নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকিলেন। কলেজ কমিটি হইতে রাধাকান্ত দেব ও রসময় দত্ত শিক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলেন।

এইসময় হইতেই আরবী, ফারসী ও সংস্কৃতের মাধ্যমে অনুবাদের সাহায্যে শিক্ষা খরচের অবসান হইল এবং ইংরাজীর প্রাধান্য হইল সর্বক্ষেত্রে। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুকলেজে বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং লর্ড অক্ল্যাণ্ড ব্যক্ত করেন যে, "যদবধি বাংলাভাষাতে বালকদিগের শিক্ষাযোগী উত্তম উত্তম পুস্তকসকল প্রস্তুত না হইবে তদবধি কেবল ইংরাজী ভাষাতে শিক্ষাকর্ম সম্পাদিত হইতে থাকিবেক। যখন ঐ সকল পুস্তক প্রস্তুত হইবে তখন জিলা স্কুলে আর ইংরাজীতে শিক্ষা না দিয়া বাঙ্গলাতে শিক্ষা দেওয়া হইবেক।"

১৮৪১ সালেও হিন্দু কলেজ পরিচালনে পরিবর্তন সাধিত হয়। এতদিন কলেজ পরিচালন ব্যাপারে কমিটির দেশীয় সদস্যদের মতামতই বলবৎ থাকিত (শিক্ষা কমিটির ইহা মনঃপূত না হইলেও)। শিক্ষা কমিটি অপরাপর বিদ্যালয়ের ন্যায় হিন্দুকলেজেও তাঁহাদের নির্ধারিত নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে আনিবার প্রস্তাব করিয়া পরিচালনার বিষয়ে বিশেষ পরিবর্তনের দ্বারা শিক্ষা কমিটির কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। হিন্দুকলেজ পরিচালনার্থ ইহার গভর্নর, ম্যানেজার এবং শিক্ষাকমিটির দুইজন প্রতিনিধি লইয়া ইহারই কর্তৃত্বাধীনে এক কমিটি গঠিত হইল। কিন্তু কর্তৃত্ব এইভাবে দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় শিক্ষা কমিটি ও কলেজ কমিটি উভয়ের মধ্যে এই সময় হইতেই প্রায়ই দ্বন্দ্বের উদ্ভব হইতে থাকে।

ইংরাজী ভাষা সরকারী ভাষা হইলে আইন আদালতে ইংরাজী প্রচলিত হইল এবং সরকারী অর্থও ইংরাজী প্রসারে ব্যয়িত হইতে লাগিল। ইংরাজী শিক্ষার আকাঙ্খা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে ১৮৩৯ সালেই সংস্কৃত কলেজে পুনঃ ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ছাত্রগণ সম্মিলিত দরখাস্ত করেন[৫] এবং ১৮৪২ সালে ইংরাজী শিক্ষা আবার প্রবর্তিত হয়। ১৮৪৪ সালের লর্ড হার্ডিঞ্জের নীতি অনুযায়ী শিক্ষিত ভারতীয়গণকে যতদূর সম্ভব সরকারী কার্যে নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত হয়। ইহার ফলে চাকুরী প্রার্থী ভারতীয়গণ এক নূতন প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে ব্যস্ত হন। নূতন জীবন যাত্রার পদ্ধতির প্রতি তাহাদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে।

ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি হিন্দুদের অনুরাগের স্বল্পতা রক্ষণশীল হিন্দুদের বা ব্রাহ্মদের অবৈতনিক ধর্মভিত্তিক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার নানা প্রচেষ্টা (তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় প্রভৃতি) ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়া বাঙালী সমাজ মানসের

পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট করিয়া দেয়। অপরপক্ষে বারাণসীর সংস্কৃত বিদ্যালয় ও কলিকাতার মাদ্রাসার পরিচালন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ইউরোপীয় তদারকি অনিবার্য করিয়া তোলে। প্রাচ্য ভাষানুরাগে কেহ সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করিতেও উৎসুক হইত না। সংস্কৃত বিদ্যার্থীদিগকে সরকারী বৃত্তিদান করিয়াই উৎসাহিত করিতে হইত।

হিন্দুকলেজেও আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা বা বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য হিন্দুকলেজ বহির্ভূত অহিন্দু-ছাত্রদিগের পাঠ গ্রহণের সুবিধার্থে ক্লাস করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে বহুক্ষেত্রে অ-হিন্দু'দের জন্যও হিন্দুকলেজের দ্বার মুক্ত হইয়া যায়। ইহা দ্বারা হিন্দুকলেজের চারিত্রিক পরিবর্তন নিঃশব্দে হইতে থাকে।

ডাঃ আলেকজেণ্ডার ডাফ ও অপরাপর উৎসাহী পণ্ডিত পাদ্রীদের অদম্য প্রয়াসে এবং রক্ষণশীলদের অযৌক্তিক কঠোরতা ও সামাজিক অত্যাচারে কিছুসংখ্যক বিত্তশালী প্রতিভাবান হিন্দু উচ্চবর্ণের ছাত্র খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে। মাঝে মধ্যেই এই উপলক্ষে হিন্দু কলেজ পরিচালনা মণ্ডলী চঞ্চল হইয়া উঠিতেন এবং সমাজপতিগণ নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেন। ধর্মত্যাগী সেই ছাত্র হিন্দুকলেজ হইতে বহিষ্কৃত হইত ও হিন্দুকলেজের বাধা নিষেধের প্রয়াসও অত্যাধিক হইয়া পড়িত। কলেজ পরিচালনায় সমাজের নানা দলাদলি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিত। সমাজপতিদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কলেজ হইতে হঠাৎ ছাত্রগণকে বিভিন্ন অজুহাতে ছাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইত অথবা অসুস্থতার নামে দীর্ঘদিনের জন্য কলেজ হইতে অনুপস্থিত রাখা হইত। নূতন স্কুল খুলিয়া সরকারের উপর চাপের সৃষ্টিও করা হইত। সরকারও সেই কর্মে এতকাল নতি স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে এবং রক্ষাশীলদের পুর্ণ সহযোগিতার অভাবে শিক্ষারও প্রসার আশানুরূপ হইত না। ডিরোজিও সমস্যা লইয়াই এইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে ২৩।৪।১৮৩১-কমিটির মিটিংএতে সম্পাদক উল্লেখ করেন, "এই ঘটনা সম্বন্ধে বাহিরে আপত্তিকর ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ফলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রায় ২৫ জন ছাত্র বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছে। আরও প্রায় ১৬০ জন ছাত্র অসুখের অজুহাতে কলেজে আগমন বন্ধ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই কলেজ ছাড়িয়া দিবে বলিয়া মনে হয়। বিষয়টি লইয়া কিয়ৎকাল হইল যথেষ্ট আলাপ আলোচনা হইয়াছে। অভিভাবকদের চিঠিপত্র ও অধ্যক্ষদিগের মতামত হইতে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমাদের অবিলম্বে গ্রহণ করা উচিত তাহা ক্রমান্বয়ে প্রস্তাবাকারে এই সভায় পেশ করা হইবে।"

'সমাচার চন্দ্রিকা' আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছে,

"—জনরব হইয়াছে যে শ্রীযুক্তবাবু গোপীমোহন দেব শ্রীযুক্তবাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুক্তবাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ এবং শ্রীযুক্তবাবু আশুতোষ দেব প্রভৃতি অনেক প্রধান লোক বালকদিগকে কলেজ যাইতে নিষেধ করিয়াছেন[৬]।"

ইহাতেই স্পষ্ট হইতেছে যে রক্ষণশীলগণ হিন্দু কলেজকে সামাজিক অস্ত্র হিসাবে

ব্যবহার করিতেন। তথাপি এই পন্থায় নবীনদের ধর্মত্যাগ হইতে রক্ষা করা যাইত না ; কারণ রক্ষণশীলগণ ততক্ষণ সামাজিক অত্যাচার বন্ধ করিতেন না যতক্ষণ এইসব তরুণ ধর্মত্যাগী না হইতেন। সুতরাং প্রকৃতি আধুনিক শিক্ষানুরাগীদের সংস্কার প্রয়াস হইত সর্বদাই পর্যুদস্ত।

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুকলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষিত হন এবং ইহা লইয়া হিন্দু সমাজে এবং তদনুযায়ী হিন্দু কলেজেও ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। কলেজ কমিটির সভায় উপস্থিত তিনজন দেশীয় সদস্যের মধ্যে রাধাকান্ত দেব ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত কৈলাসচন্দ্র বসুকে কলেজের কর্ম হইতে অব্যাহতি দিবার দাবী করেন ; কিন্তু সংখ্যাল্পতা হেতু সে-দাবী অগ্রাহ্য হয়। অবশ্য রক্ষণশীলদের মাধ্যমে ব্যক্ত হিন্দুসমাজের মনোভাব গর্ভনমেণ্টের গোচরে আনিবার জন্য শিক্ষা কমিটিকে অনুরোধ করিতে প্রথমে সকলেই সম্মত হন। পরে শিক্ষা কমিটিতে এই প্রস্তাব উঠিলে ইউরোপীয় সদস্যগণ বিরুদ্ধাচরণ করেন।

১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে গুরুচরণ সিংহ নামে কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্র খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্র দ্বারা ইহা কমিটিকে জানাইলে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সদস্যদের মতামত আহ্বান করা হয়। দেশীয় ও ইউরোপীয় সদস্যরা ছাত্রটিকে কলেজ হইতে অপসারণের পক্ষে মত দিলেন এবং ছাত্র গুরুচরণ সিংহ হিন্দুকলেজ ত্যাগ করে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মূল নীতির ব্যাখ্যা লইয়া শিক্ষা কমিটির ও কলেজ কমিটির প্রেসিডেণ্ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। ইহার ফলেই শেষ অবধি পরবৎসর রাধাকান্ত দেব কলেজের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেন এবং আক্ষেপ করিয়া তদানীন্তন হিন্দুকলেজের অবস্থা ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসনকে পত্র দ্বারা জানান।

কিন্তু এই সময় কলিকাতা মাদ্রাসার ঘটনায় নীতিগত দিক হইতে ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দেখা যায়। কলিকাতা মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্র উর্দুর পরিবর্তে বাংলা শিখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় ইংরাজী বিভাগের সংলগ্ন একটি বাংলা শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং ১-৫-১৮৩৭ তারিখে শ্যামাচরণ সরকার ২৫ৼ টাকা বেতনে বাংলা শ্রেণীর পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন[৭]। অল্পকাল পরেই তাঁহার বেতন হয় ৪০ৼ টাকা।

মাদ্রাসায় ইংরাজী প্রবর্তিত হয় প্রায় সংস্কৃত কলেজের সমসাময়িক কালে। কিন্তু ১৮৫১ সাল অবধি মাত্র দুইজন ছাত্র—আবদুল লতিফ এবং ওহিদুন নবী (Weheedoon Nubee) কেবল মাত্র নিম্নবৃত্তি পাস করে। এই সময়ের মধ্যে হুগলী মহসীন কলেজেও মাত্র দুইজন নিম্নবৃত্তি পরীক্ষা পাস করিয়াছিল (মুসা আলি ও ওয়ারিস আলি)। সুতরাং মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বীতরাগের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ইহার উপর আবার সরকারী ক্ষেত্রে ফারসী ও আরবী প্রচলন

রহিত হইয়া মুসলমানদের বীতরাগ কিছুটা উগ্রপন্থায় বহিঃপ্রকাশ হইতে থাকে। ১৮৫১ সালে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ স্প্রেঙ্গার (Sprengger) মাদ্রাসার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের প্রয়াসী হইলে মুসলমান ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে এবং এক অরাজকতার সৃষ্টি করে ; ইহা দ্বারা উইলিয়াম অ্যাডামের মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা ধারার সহিত যোগাযোগের আশাও ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পূর্বে তিনি রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে—'Learned Musalmans are in general much better prepared for reception of European ideas than learned Hindus'[৮].

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবস্থাও আর পূর্ববৎ থাকিতে পারে নাই। "কলেজের কেবল মানটিই আছে এখন আর কিছুই নাই। তাহার লক্ষ্য, শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে যাহা ছিল এখন আর তাহা নাই।"[৯]

বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হইতে সংস্কৃত কলেজে আসিয়াই সংস্কৃত কলেজের পরিবর্তনের প্রয়াসী হন। তিনি এই প্রচেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন অর্থাৎ তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের উত্তমরূপে ইংরাজী শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। বীক্ষণাগারের বৈজ্ঞানিকের ন্যায় তিনিও পাশ্চাত্য বিদ্যার গবেষণা করিয়াছেন, ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার আদর্শ সমন্বয় করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরের সমগ্র পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদন না পাইলেও ইহা দ্বারা সেই যুগের শিক্ষিতদের মানস চিত্রটি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কালের হিন্দু মানসচিত্র ছিল সীমায়িত শিক্ষা প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশেষত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করণ।

এই সময়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা হয় হিন্দুদের মধ্যে। রাজা রাধাকান্ত দেব তখন আর হিন্দু কলেজ সংশ্লিষ্ট নন। ২৫-৫-১৮৫১ তারিখ চিৎপুরস্থ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি গৃহে রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে পতিতোদ্ধার সভা গঠিত হয়। যেসব হিন্দু ইতিপূর্বে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পুনরুদ্ধারের জন্যই ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিখ্যাত হিন্দু পণ্ডিতদের ইহার সপক্ষে শাস্ত্রীয় বিধানের সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়া দেওয়া হয়। সেকালের এই আন্দোলনকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলা হইয়াছে[১০]। ইহার দ্বারা সংস্কারের বন্ধনকে রক্ষণশীলগণই ঢিলা করিয়া দিলেন। সুতরাং একটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে হিন্দু রক্ষণশীলগণ আপন শক্তির অপ্রাচুর্যতা সম্বন্ধে সচেতন হইলেন এবং অন্যপক্ষে ব্যক্তিমানসে ধর্মশাসন যে আর পূর্ববৎ জয়ের সৃষ্টি করিতে পারে না তাহাও স্পষ্ট হইল। সাম্প্রদায়িক নয় অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাই হইল সে যুগের কামনা।

কলিকাতা মাদ্রাসার ঘটনা লইয়া সরকার চিন্তিত হইয়া একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিলেন এবং F. G. Mouat, তদানীন্তন এডুকেশন কাউন্সিলের

সম্পাদক, তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট দিলেন (৪।৮।১৮৫৩), তাহাতে মাদ্রাসা, হিন্দুকলেজ জাতীয় ধর্ম-ভিত্তিক বিদ্যায়তনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া একটি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্ব সাধারণের পাঠের উপযুক্ত শিক্ষায়তনের (Metropolitan College) স্থাপনার পরামর্শ দেন। ইহাতে হিন্দুকলেজের অসুবিধা হইতে পারে এবং সরকারের নূতন বিদ্যালয় স্থাপনে আর্থিক সংস্থানে এবং উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহের অসুবিধার কথা দৃষ্টিতে রাখিয়া তিনি হিন্দু কলেজকেই সর্ব সাধারণের জন্য খুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সরকারকে পরামর্শ দান করেন। সেই অবস্থায় সরকারীভাবে হিন্দু-কলেজকে গ্রহণ করিলে ইহার নাম পরিবর্তনও প্রয়োজন, সুতরাং সরকারের তত্ত্বাবধানের বিদ্যায়তন হিসাবে ইহার নূতন নামকরণের দ্বারা 'প্রেসিডেন্সী কলেজ' নাম প্রবর্তনের কথাও তিনি বলেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব হিন্দুকলেজ পরিত্যাগ করিবার পর হিন্দুকলেজে হিন্দুদের কর্তৃত্ব নামে মাত্র বিদ্যমান ছিল। ১৮৫৩ সালে আর একটি ঘটনায় সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়। হীরা বুলবুল নামে কলিকাতায় এক পশ্চিমদেশীয় গণিকার পুত্র হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়। ইহা লইয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের অনেকে তীব্র অসন্তোষ করেন। বারাঙ্গনার পুত্রকে হিন্দু সন্তান বলিয়া কলেজে ভর্তি করা যায় কিনা এই বিচার লইয়া হিন্দুকলেজ ম্যানেজিং কমিটি ও সরকারী এডুকেশন কাউন্সিলের মধ্যে মতবিরোধ হয়। ম্যানেজিং কমিটীর হিন্দুদের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে এডুকেশন কাউন্সিল হীরা বুলবুলের পুত্রকে সরাইয়া দিতে অসম্মত হন। হিন্দুরা ইহার বিরুদ্ধে পূর্ব প্রথানুযায়ী আন্দোলন আরম্ভ করেন। রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজা রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ দেব প্রমুখ নেতাদের সহযোগিতায় ২।৫।১৮৫৩ তারিখে চিৎপুর সিঁদুরিয়াপটীর রামগোপাল মল্লিকের গৃহে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মতিলাল শীলের শীলস্ ফ্রি কলেজ ও গুরুচরণ দত্তের ডেভিড হেয়ার একাডেমি ইহার সহিত সম্মিলিত হয়। রাধাকান্ত দেব হইলেন পরিচালক কমিটীর সভাপতি, পৃষ্ঠপোষক—মতিলাল শীল। পরিচালক কমিটীতে রহিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ দেব প্রভৃতি। হিন্দুকলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল রিচার্ডসন হইলেন অধ্যক্ষ। ১৮৫৮ সালে শেষ অবধি দেশীয়দের দলাদলি ও অনুরাগের জন্য এই কলেজ একটি স্কুলে পরিণত হয়।

১৮৫২ সালে হিন্দুকলেজ পরিচালক সমিতির মিটিং হয় মাত্র ৫ বার এবং তাহাতেও সদস্যাদের অনুপস্থিতি কলেজে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করে। সরকার ২১।১০।১৮৫৩ তারিখে প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১১।১।১৮৫৪ তারিখে হিন্দু কলেজের শেষ মিটিং হয়। বিরোধিতা সত্ত্বেও সরকার হিন্দু কলেজকে গ্রহণ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিবর্তিত করেন। হিন্দু-

কলেজের সিনিয়ার বিভাগ প্রেসিডেন্সী কলেজ হয় এবং জুনিয়ার বিভাগ 'হিন্দু স্কুল' রূপে থাকিয়া যায়। সরকার প্রেসিডেন্সী কলেজের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৫।৬।১৮৫৫ তারিখ।

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুন হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে পরিচিত হয় এই পরিবর্তন শুধু মাত্র নামান্তর নয়, রূপান্তরও বটে। সরকার প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয়ের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন এবং এ-বিদ্যালয়ে সকল শ্রেণীর ছাত্রের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা হয়। সরকারী পরিচালনা না হইলে এই বিদ্যায়তন অগণিত সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া স্বীয় মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিত : সকল শ্রেণীর ছাত্রের জন্য ইহার দ্বার উন্মুক্ত না হইলে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করা অসম্ভব হইত।

পূর্বে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ পরিচালক গোষ্ঠীর জন্যই সবসাধারণের বস্তু হইতে পারে নাই। পরিচালকগোষ্ঠী ধর্মীয় গোঁড়ামি ত্যাগ করিতে না পারায় এবং সমাজপতি হইবার জন্য বিদ্যায়তন সর্বদাই ধর্মীয় আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হইত। ইহার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা সমগ্র দেশের মধ্যে যে পরিবর্তনের জোয়ার আসিয়াছিল তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পরিবর্তনের কর্মে সহযোগিতা করিতে অসমর্থ হওয়ায় প্রতিপদে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইত এবং সামগ্রিক উন্নয়নে কখনও কখনও প্রতিবন্ধক হইত। প্রথমাবস্থায় ইংরাজ সরকার স্বীয় জাতির স্বার্থের সহায়ক বলিয়াই রক্ষণশীলদের এই পশ্চাদগামী পন্থা সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে শাসন ব্যবস্থায় বহু উচ্চ ও সাধারণ কর্মচারী প্রয়োজন হওয়ায় তাঁহাদের উদাসীন শিক্ষা নীতি পরিবর্তনে প্রয়াসী হন। রেলপথ প্রচলিত হওয়ায় ইঞ্জিনিয়ার, আইনজ্ঞ, ডাক্তার ও সাধারণ কর্মচারী ছাড়াও কুশল কারিগরী কর্মীর প্রয়োজনে শিক্ষা ব্যবস্থার নব রূপায়ণে প্রয়াসী হইতে হইল সরকারকে। ইহার কেন্দ্র কলিকাতার ন্যায় নগরেই সম্ভব এবং সেই ক্ষেত্রে নব শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে হিন্দু কলেজকেই রূপান্তরিত করা আর্থিক ও অন্যান্য দিক হইতে সুবিধাজনক বলিয়া সরকার মনে করেন।

১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ অবধি ইংলণ্ডেও প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয় নাই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের রূপায়ণে ভারতে শিক্ষা ক্ষেত্রে সুদূর পরিবর্তনের জন্য প্রয়াসী হইয়া ১৯-৭-১৮৫৪ তারিখে বোর্ড অব কনট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উডের (Charles Wood) শিক্ষা সনদ পাঠান হয়। ইহার রচনায় ডঃ আলেকজেণ্ডারের প্রভাবের কথা অনুমিত হয়। ফলে সরকারী শিক্ষা নীতির রূপায়ণের সুবিধার্থে হিন্দুকলেজের চারিত্রিক পরিবর্তন হয় অবশ্যম্ভাবী। ইহার সংক্ষিপ্তসার এইরূপ[১১],

১। ভারতীয়রা সর্বপ্রকার চাকুরীর ও বৈষয়িক সুবিধা প্রাপ্ত হইবে—ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে। ইউরোপীয়রা ভারতে কাঁচামাল পাইবে প্রচুর এবং ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয় করিবে ভারতীয়রা। শিক্ষিত হইলে কোম্পানী স্বল্প

বেতনের কর্মচারী পাইবে।

২। এদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রচেষ্টা, দেশীয় আইন কানুনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চার সুবিধা করা হইল।

ক। অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় রক্ষা করা হইল। প্রতি প্রদেশে পৃথক শিক্ষা বিভাগ খোলা হইল।

খ। বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার প্রস্তাব হইল এবং তাহা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ-প্রধানত পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা ডিগ্রী প্রদানের জন্য।

গ। উচ্চস্তরে শিক্ষার গুরুত্ব অধিক না করিয়া যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সেখানে মাতৃ ভাষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা রহিল।

ঘ। গ্রাণ্ট-ইন-এইড মারফৎ বিদ্যালয়ে সাহায্য দানের ব্যবস্থায় যোগ্যতার মান হইল নিম্নরূপ,

১। ভাল ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কিনা।

২। স্থানীয় ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু কিনা।

৩। তাঁহারা ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করেন। ইহাই বিচার্য বিষয় হইবে। গ্র্যাণ্ট ইন এইড শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা, গৃহ ও আসবাব নির্মাণ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের উন্নতি বিষয়ক কার্যের জন্য দেওয়া হইবে।

৫। শিক্ষক নিয়োগের বিধি ইংলণ্ডের ন্যায় হইবে।

৬। নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষকের যোগ্যতাই প্রধানত বিচার্য।

৭। স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

উডের ডেসপ্যাচের প্রত্যক্ষ ফল,

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

২। গ্রাণ্ট-ইন-এইড প্রথা প্রবর্তনের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচারে উৎসাহ।

৩। সাধারণ সংস্থা-চালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া বেসরকারী স্কুলে অনুদানের সম্প্রসারণই লক্ষ্য হয়।

৪। মাতৃভাষায় মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন। কিন্তু ব্যাপকভাবে প্রয়োগ না হওয়ায় কল্যাণকর দিক বহুলাংশেই উপেক্ষিত থাকে।

চার্লস উডের শিক্ষা সনদের মূলে ছিল বাংলার শিক্ষা সংসদের সভাপতি চার্লস ক্যামেরনের (Charles Hay Cameron) শিক্ষা বিষয়ক আবেদন পত্র[১২]। ইহার মূল উদ্দেশ্যের সারমর্ম হইতেই ভারতে ইংরাজের শিক্ষা সম্বন্ধে ভবিষ্যত দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইবে,

—ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানশিক্ষার পথে অন্তরায়গুলি প্রধানত,

১। ব্রিটিশ ভারতে ইউরোপের ন্যায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় নাই যাহা শিক্ষার জন্য ডিগ্রী দেওয়া যায়।

২। ভারতীয় যুবকদের যাঁহারা ইউরোপীয় বিদ্যাশিক্ষক, তাঁহারা কোম্পানীর

কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নন বলিয়া তাঁহারা বিদ্বান ও প্রতিভাবান হইলেও, ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের বিশেষ সামাজিক মর্যাদা নাই।

৩। ভারতীয় যুবকদের জাতিধর্ম নির্বিশেষে ইংলণ্ডে যাইয়া উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ নাই। সুতরাং আমার নিবেদন এই যে,

ক। ব্রিটিশ ভারতে একটি বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হোক।

খ। সিভিল ও মেডিকেল সার্ভিসের ন্যায় শিক্ষা বিভাগেও উচ্চ পদস্থ সরকারী পদের প্রবর্তন হউক।

গ। ইংলণ্ডে এমন দু-একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হউক যেখানে এই দেশের যুবকেরা উচ্চপদের উপযুক্ত হইবার ন্যায় শিক্ষা পাইতে পারে।

ক্যামেরণ সাহেব বিদ্যাচর্চায় হিন্দুকলেজের এতকালের বিশুদ্ধ অনাবিল প্রেরণা ও বাসনার কথা চিন্তাও করেন নাই। ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্য শাসনের প্রয়োজনীয়তার কথাই চিন্তা করিয়া ডিগ্রী প্রদানের শিক্ষা ব্যবস্থার কথাই বলিয়াছেন। ইহার ফলে পরবর্তীকালে ভারতে দ্রুত ইংরাজী শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার প্রসার হইয়াছে, চাকুরীমুখীন মানস সৃষ্টি করা হইয়াছে, এবং প্রকৃত শিক্ষা অবহেলিত হইয়াছে। তথাপি কেবলমাত্র শিক্ষাপ্রসারে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া অর্থ নৈতিক স্বাবলম্বনের দ্বারা ও পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় লাভ করিয়া স্বীয় সমাজ বন্ধন অস্বীকার করিবার সাহসী হইল নব্য শিক্ষিতের দল। সমাজপতি ও ধর্ম নায়কদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ নির্মূল না হইলেও সেখানেও দ্বন্দ্বের প্রসার হইয়া সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাবনা সহজ করিতে সাহায্য করে।

কিন্তু রক্ষণশীলদের হাত হইতে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল তানটি বিচ্যুত হইলে হিন্দু-কলেজ জীবনে ধর্ম লইয়া স্বপ্নের অবসান হয়। রক্ষণশীলদের ও দেবেন্দ্রনাথের উদারপন্থীদের সম্মিলন হয় নানা ক্ষেত্রে। সমাজে নানা পরিবর্তনের সূচনা বিশেষত আর্থিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেখা দেয়। এমনকি ইংরাজের সভ্যতার ও ভারত শোষণের নিন্দায় সোচ্চার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও এই শিক্ষার নূতন সনদে উল্লিখিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করেন,

"এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার যে কল্পনা স্থির হইয়াছে তাহা অতি উত্তম, ইংলণ্ড দেশে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যে প্রকার বিদ্যাশিক্ষা হইয়া থাকে এদেশীয় লোকে তাহার কোন বিষয়ই শিক্ষা করিতে অক্ষম নহে, কেবল শিক্ষা অভাবে ও রাজপুরুষদিগের দয়ার অভাবেই তাহারা সে সমস্ত বিষয় জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তত্রস্থ প্রজাদিগকে তদুপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিলে এতদিন তাহারা নানা বিষয়ে উপযুক্ত হইত।"[১৩]

ঈশ্বরগুপ্তের উচ্ছাস বাঙালীর প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়া নব দিগন্তের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়াছে। ইহা প্রধানত সম্ভব হইয়াছে হিন্দুকলেজের পরিবর্তনের মাধ্যমেই। ফলে শিক্ষার প্রসারও অতিদ্রুত হইতে থাকে। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে সমাচার

দর্পণও হিন্দুকলেজের পন্থানুসরণে আরও কলেজ স্থাপনার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাইয়া এই রূপই লিখিয়াছিল, "গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে এদেশে ইংলণ্ডীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষাকরণার্থে যে উদ্যোগ হইতেছে তাহা অত্যাশ্চর্য্য।"[১৪] শিক্ষার প্রথম ধারা বদলের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বাহী এই আলোচনার পর বহু পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার ধারা বদলের আবার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং তাহারই সন্ধান দিয়াছে সংবাদ প্রভাকর। সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে বিরাট পরিবর্তন হইবে এই বহুল জন শিক্ষায় তাহা স্পষ্ট।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফল ঃ

হিন্দুকলেজের সর্বপ্রধান প্রতিভূ ইয়ংবেঙ্গলেরা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সামাজিক প্রগতির প্রয়াসে ছিল অত্যুৎসাহী, উদ্দাম, আপোসহীন। সেকালের সমাজ তাহাদের উদ্দাম ভাঙনের রব ও প্রতিপক্ষের 'হায় হায়' ধ্বনিতে ছিল সরগরম। ক্রমে কিন্তু ভাঙনের সহিত গঠনের আবশ্যকতাও তাহারা উপলব্ধি করিতে থাকেন। কালের ও দেশের উর্দ্ধে হইতে তাহারা ক্রমে মাটির স্পর্শে আসিয়া বিভিন্ন সভা সমিতি, পত্র-পত্রিকা মাধ্যমে শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের নানা সমস্যা সর্বসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে সক্ষম প্রত্যেকটি প্রগতি আন্দোলনের প্রচেষ্টার উদ্ভব হয় সমাজ জীবন হইতে। যুক্তিবাদী আধুনিক ব্যক্তিত্ব ও এইরূপ ব্যক্তিত্বের সম্মিলিত গোষ্ঠী সেই দ্বন্দ্বের নিরসনের প্রচেষ্টায় সাড়া দিয়া অগ্রসর হন। তাই কখন দেখা যায় ইয়ংবেঙ্গলরা রক্ষণশীলদের সহিত মিলিত হইয়াছেন বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে, কখন সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় সচেষ্ট ব্রাহ্ম সমাজের সহিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মেও হিন্দু কলেজীয়গণ অগ্রগামী রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং তাহাদের বহুকর্মে সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের ফলে কুলগত-ধর্মগত বৃত্তির পরিবর্তন, যাহা পূর্বেই আয়ত্ত হইয়াছিল, তাহা হইল দ্রুততর। বিদ্যার প্রসার পল্লী সমাজেও প্রসারিত হইয়া পল্লীর স্থিতিশীলতায় চাঞ্চল্য আনয়ন করে এবং নাগরিক জীবনের প্রভাব প্রসারিত হইতে থাকে। নগরগুলি সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং নবযুগের মানুষ হয় নগরমুখী। কারণ সেখানে কুলগত মর্যাদার মূল্য অনেকাংশেই হ্রাস পাইয়াছে। পরাধীনতার জন্য স্বাভাবিক যুগসম্মত বিকাশ সম্ভব না হইলেও বিচ্ছিন্ন ও বিরোধ বহুল অসমবিকাশের ধারার মধ্যেও সমাজ জীবনে পরিবর্তন হইল দ্রুতলয়ে। প্রায় সেই কালেই প্রেসিডেন্সী কলেজ, হিন্দুস্কুল, উত্তরপাড়া স্কুল, সংস্কৃত কলেজ, কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুল প্রভৃতি হইতে ১৬২ জন ছাত্র এনট্রান্স পাশ করিয়াছেন।[১৫] ইহাদের মধ্যে ছিলেন ভবিষ্যৎ ভারতের সংস্কৃতির প্রবর্তকগণ-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এবং তাহাদের

একজন প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক, প্রবীণ ইয়ংবেঙ্গল কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।[১৬]

হিন্দুকলেজ হইতে মুক্ত হইয়া রাজা রাধাকান্ত দেবও সামাজিক সংস্কারের প্রচেষ্টায় 'পতিতোদ্ধার সভা' গঠন করিলেন তাহা হিন্দু সমাজে নূতন সচেতনতার সঞ্চার করে। ধর্মান্তরিত হইতেও যে কেহ আবার হিন্দু সমাজে স্থান পাইতে পারে ইহা পূর্বে কখনও গ্রাহ্য হয় নাই, বিশেষজ্ঞ রাধাকান্ত দেব জাতীয় রক্ষণশীলদের জন্যই। কিন্তু এখন সেই বাধা দূর করিলেন স্বয়ং রক্ষণশীল নেতাই।

১৮৫১ সালের ২৯ অক্টোবর 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারতবাসীয় সভা' স্থাপিত হয় ইয়ংবেঙ্গলদের ও ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ প্রচেষ্টায়। কিন্তু তাহাতেও রাজা রাধাকান্ত দেব বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও সাড়া দিয়াছিলেন। তিনি হইলেন সভাপতি এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক।

লর্ড মেকলে কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ পার্থক্য বিচারালয় হইতে দূরীকরণের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইলেও ১৮৪৯ সালে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন আবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। আবার ১৮৫৭ সালে আইন সচিব ও পরবর্তী জীবনে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সার জন পিটার গ্রাণ্ট তৃতীয়বার এই আইন প্রনয়ণের চেষ্টা করিলে ব্ল্যাক অ্যাক্ট সমর্থন করিয়া ভারতবর্ষীয় সভা ৭-৪-১৮৫৭ কলিকাতা টাউন হলে বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান করেন। তাহাতেও রাজা রাধাকান্ত দেব সমর্থন জানাইয়া ছিলেন। এই সভায় কিশোরীচাঁদ মিত্র, দিগম্বর মিত্র ও জর্জ টমসন বক্তৃতা করেন।

নীলদর্পণ লইয়া বিচারের সময় বিচারপতি স্যার ওয়েলস বাঙালী-জাতির চরিত্রের উপর দোষারোপ করেন। নীলদর্পণ বিচারের ক্ষেত্রে বাঙালীরা পাদরি লং সাহেবকে সর্বপ্রকারে সমর্থন করেন এবং ২৬-৮-১৮৬১ তারিখে রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ভারতীয়দের এক বিরাট জনসভা হয়। ইহার সাফল্যের বিবরণ 'সোমপ্রকাশ' দিয়াছে, .. "লং সাহেবের বিচার কালে সর ওয়েলস্ যাবতীয় বাঙালীকে গালি দিযাছিলেন বলিয়া এতদ্দেশী সমুদায় প্রধান লোক একত্রিত হইয়া শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে এক সভা করিয়া সর ওয়েলেসের দুঃস্বভাবের বিষয় স্টেট সেক্রেটারীর গোচর করিলেন। প্রায় ২০,০০০ লোক এই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই আবেদন পত্র গোপনে মুদ্রিত হইয়া স্বাক্ষরার্থ প্রায় একমাস চতুর্দিকে প্রেরিত হয়, ইংলিশমান হরকরা সম্পাদক এক খণ্ডের জন্য ৫০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, এরূপ একতা হইয়াছিল যে, তথাপি কেহ এক খণ্ড দেন নাই। সব চার্লস উড আবেদনের উত্তর দান কালে ওয়েলসকে সাবধান করিয়া দিলেন।[১৭]" .. ফলে নীলকরদের স্বার্থমূলক অন্যান্য আইন বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই। ভারত সচিব সার চার্লস উডের ভারতহিতৈষী কর্মের জন্য ভারতবর্ষীয় সভা তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদানের জন্য ১৪-৩-১৮৬৩ তারিখ সম্মিলিত হয়—হিন্দু-মুসলমান প্রধানেরা মিলিতভাবে এই প্রচেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছিলেন।

যে রক্ষণশীল তত্ত্বাবধান হিন্দু কলেজে একমাত্র হিন্দু-রক্ষণশীল স্বার্থকেই বজায় রাখিতে সমাজ সংস্কারের প্রয়াসকে বাধা দিতেছিল—ধর্ম সম্পর্কহীন সরকারী তত্ত্বাবধানে অবস্থার পরিবর্তন এমন হইল যে সেই রক্ষণশীলগণ অনেকক্ষেত্রে স্বীয় গোষ্ঠীর অসহায়তা উপলব্ধি করিয়া জাতীয় সমন্বয়ের প্রয়াসে ব্রতী হইল। জাতীয়তা সম্বন্ধে এই ধারণাও পাশ্চাত্য শিক্ষারই ফল। অবশ্য এই হিন্দু জাতীয়তা-মূলে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতের মধ্যে কৌলীন্যের স্বীকৃতি লাভের প্রচেষ্টা। তথাপি ইহা রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করিল এবং ক্রমে তাহা ইংরাজ বিরোধিতায় পর্যবসিত হইল।

ব্রাহ্ম সমাজের মাধ্যমে বেদের অভ্রান্তবাদেরও প্রভাব অস্বীকৃত হইল। ব্রাহ্মদের মধ্যেও জাত-পাত লইয়া বিভেদ হইল। নব্যদল কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান ধর্মীয়দের মানুষ বলিয়াই মান্য করিতে লাগিলেন এবং হিন্দুদের মধ্যেও জাতিভেদ দূরীকরণের প্রয়াসী হইলেন। ইহাদের প্রয়াসেই বিশেষত অসবর্ণ বিবাহ স্বীকৃত হইল। ইয়ংবেঙ্গল বহু পূর্বেই ইহার আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন—কিন্তু সফল হইল নব পরিস্থিতিতে হিন্দুকলেজের চারিত্রিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ইংরাজী শিক্ষার দ্রুত প্রসারনে। ইহারা (নব্যগণ) স্বামী-স্ত্রী একত্রিত হইয়া সমাজে গমনাগমনের মধ্য দিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার স্বীকৃতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১০-৩-১৮৭৭ তারিখের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রথম ভারতীয় মহিলা এনট্রান্স পাশের স্বীকৃতি পান। ইহার জন্য বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এই সমাবর্তন উৎসবের ভাষণে আশা প্রকাশ করা হয় নারী শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের। ফলে নারী-পরীক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত হইল। ১০-৩-১৮৮৩ সালে সমাবর্তন উৎসব ভাইস চ্যানসেলার মিঃ রেনল্ডস ভাষণে বলেন, "বাংলাদেশে ৫০ হাজার বালিকা প্রাথমিক ও অন্যান্য পাঠ লইতেছে। বাংলা অন্য প্রদেশ হইতে বিশেষ অগ্রণী।" সেকালে অনার্স পাওয়া অর্থে এম, এ পাশ বুঝা যাইত। সেই অর্থে চন্দ্রমুখী বসু অনার্সে প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া প্রথম ভারতীয় মহিলা এম, এ হইলেন ;[১৮]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এনট্রান্স উত্তীর্ণকারীদের মধ্যে একজন ও ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই, সি, এস। তিনি এই সময়ের দুই গোষ্ঠীর (প্রাচীন ও নব্য) চিন্তাধারার দ্বন্দ্বের সুন্দর রূপটি তুলিয়া ধরিয়াছেন তাঁহার রচিত 'আমার বাল্যকথা' গ্রন্থে,

"আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, 'তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি নাকি ?' আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল, তা আমার আদবে ভাল লাগিত না। আমার মনে হত এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয়, মুসলমান রীতির অনুকরণ।[১৯]

স্ত্রীভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তিনি প্রয়াসী। স্বীয় পরিবারে স্ত্রীকেও সুপ্রতিষ্ঠিত মহিমায় দেখিবার বাসনা এই নব্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী পুরুষের মধ্যে জাগরিত হইয়াছে। তাই তিনি আপনার স্ত্রীকেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় দিতে চান। কেবল অবরোধ হইতেই উদ্ধার নয়, বিলেতেও আসিয়া তাহার নারী মহিমার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন, কারণ এই মধ্যযুগীয় প্রথার দূরীকরণ না হইলে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই তিনি স্ত্রীকে লিখিয়াছেন,

"আমি একবার ভাবিয়াছিলাম তুমি যদি কোনরকম করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া এখানকার উন্নত সমাজের মধ্যে বাস করিতে পার তবে আমার এখানে যাহা কিছু শিক্ষা ও উন্নতিলাভ হইয়াছে তুমিও তাহার ভাগী হইতে পার। এই অভিপ্রায়ে তোমাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার কোন উপায় করিয়া দেন, বাবা মহাশয়কে লিখিলাম। কিন্তু আমার সমুদয় যত্নই ব্যর্থ হইল। বাবা মহাশয় চান আমি যেন অন্তঃপুরের মান মর্যাদার উপরে হস্তক্ষেপ না করি।"[২০]

রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর পূর্বেও বিলাত আসিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে দেশে পরিবর্তন সম্ভব হয় নাই। কারণ তাঁহারা সেই পরিবর্তন আনিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছেন সামন্তযুগীয় ধ্যানধারণার জন্য এবং নারীরও মধ্যযুগীয় মনোভাবের মোহ কাটে নাই বলিয়া। নব্য শিক্ষার গুণে ব্যক্তিত্বের বোধ জাগ্রত হইয়াছে এবং ধর্ম শাস্ত্র নির্ধারিত সংস্কৃতি ও সৌন্দর্য বোধেরও হইয়াছে পরিবর্তন। ধর্ম নিরপেক্ষ সৌন্দর্যবোধ প্রাধান্য পাইয়াছে। নারী শিক্ষার মাধ্যমেই ইহার দ্রুত প্রসার সম্ভব হইয়াছে। তাই দেখি স্বামী ও স্ত্রী দুই জনই নব যুগের রূপায়ণে প্রয়াসী। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতৃত্বের দাবী, সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদার প্রশ্ন লইয়া বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় প্রগতি রুদ্ধ হয় নাই।

এই পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও উপযুক্ত স্বামীর আধুনিক সহধর্মিনীর ন্যায় প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। ইহাদের সংগ্রামের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই সেকালের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। ইহারা ইয়ংবেঙ্গলদের ন্যায় সরবে প্রতিবাদ করিয়া আবহাওয়া বিষাক্ত করেন নাই। বরং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার জন্য ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যক্ষভাবে নব-জীবনবেদকে রূপায়িত করিয়াছেন আরও দৃঢ়ভাবে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বোম্বাই প্রদেশে কর্মক্ষেত্রে ইংরাজ সিভিলিয়নদের রীতিতে পারিবারিক জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় আসিলে তাহাদের চালচলনে বাঙালী সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইত। লাট প্রাসাদে বিলাতী প্রথা অনুসারে তাহাদের নিমন্ত্রণ হইত এবং উভয়েই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন। প্রথমবার স্ত্রীকে লইয়া লাট সাহেবের বাড়ী গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহার বিবরণ লিখিয়াছেন সত্যেন্দ্রনাথ,

"সে কি মহাব্যাপার। শত শত ইংরেজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী সেখানে

একটিমাত্র বঙ্গবালা। তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে প্রকাশ্য স্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।"[২১]

প্রসন্নকুমার ঠাকুর হিন্দুকলেজের প্রথম যুগের ছাত্র এবং হিন্দু কলেজের পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতম নেতা। ইয়ংবেঙ্গলের আন্দোলনের শিকার তিনিও হন। কিন্তু নারী-স্বাধীনতার এই প্রচণ্ড নীরব আঘাত তাহার নিকট চরম। হিন্দুকলেজের কেহই এতদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই এবং এত সুদূর প্রসারী আঘাতও কেহ দেয় নাই। কলিকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কেন্দ্র হইয়া উঠে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের নব্য শিক্ষিতগণ। আরও অদ্ভুত তাহাদের সামাজিক প্রথাভাঙনের প্রয়াস। এখন আর সামাজিক অবরোধের কোনই মূল্য নাই। হিন্দু কলেজের দ্বারা আর সমাজের সামগ্রিক প্রয়াসে বাধা সৃষ্টি করিবারও উপায় নাই।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন তাই এইযুগে হয় দ্রুত এবং ইহার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল ঠাকুর পরিবার। এইরূপ আচরণ যে ঠাকুর পরিবারে আমূল পরিবর্তন আনিয়া দেয় আচার ব্যবহারে, পোষাক পরিচ্ছদে ও মানসিকতায় তাহার পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সৌদামিনী দেবীর পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে, "আমাদের বাড়ীতে মেজদাদাই এ সমস্ত উল্‌টাইয়া দিলেন। আমরা যখন শেমিজ জামা জুতা পরিয়া গাড়ি চড়িয়া বাহির হইতে লাগিলাম তখন চারিদিক হইতে যে কিরূপ ধিক্‌কার উঠিয়াছিল তাহা এখনকার দিনে কল্পনা করা সহজ নহে।[২২] কিন্তু সেই প্রচেষ্টাই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন আনিয়া দেয় দ্রুতলয়।

শিক্ষা এতদূর প্রসারিত হইয়াছিল যে কেবলমাত্র বয়স্কদের কথাই নয়, এখন শিশুদেরও সাহিত্যরসের আস্বাদ দিবার প্রয়াসী হন এইসব পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণ। ঠাকুরবাড়ী হইতেই শিশুদের জন্য 'বালক' নামে একটি পত্রিকার প্রবর্তন হয় ১৮৮৫ সালে।

হিন্দুমেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র। ইহার প্রথম অধিবেশন হয় ১২-৪-১৮৬৭ তারিখ চৈত্র সংক্রান্তির দিন, বাংলা ১২৭৩ সালে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সর্বসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উদ্রেক করা। এইজন্য সঙ্গীত, অভিনয়, স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী প্রভৃতি ছিল ইহার বিশেষ অঙ্গ। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলার প্রথম উদ্বোধন সভায় ইহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন, "আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম কার্য্যের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য মাতৃভূতির জন্য।"

* * *

অর্থনৈতিক পরিবর্তনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনেরও দ্রুততা আনিয়া দেয়। ইহার সহিত দেখা যায় নগরমুখী মানবস্রোত। পল্লীগ্রাম আর মানুষকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না। আর্থিক সঙ্গতি সহরে এবং নব মর্যাদাও নগরে। তাই সেইদিকেই গতি।

মানুষ আর ধর্ম লইয়া সংস্কারের প্রাধান্যকে স্বীকার করিতে পারিতেছে না। নবশিক্ষিতদের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন হইয়াছে। তাহারা আর্থিক দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধানে আধুনিক বস্তুবাদী যুক্তির আশ্রয়ী হইয়াছেন। গত জন্মের দোহাই দিয়া আর দুরবস্থাকে হাসিমুখে মানিয়া লইতে তাহাদের যুক্তিবাদী মন সায় দেয় না। সুতরাং হিন্দু সমাজের পুরাতন রীতিনীতি ও প্রথার চাপে তাঁহারা নূতন পরিবেশে ও উন্নত আর্থিক সংস্থান সত্ত্বেও দুরবস্থার গ্রাসমুক্ত হইতে না পারিয়া দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। সমাজ মানসে ইহার প্রতিফলন হইয়াছে। তাঁহারা পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থার বিচারে ব্যস্ত। সেকালে একান্নবর্তীতা সম্বন্ধে ১২৮০ সালের সোমপ্রকাশ লিখিয়াছে,[২৩] "ইহা যে লোকের দারিদ্রতা বৃদ্ধির অন্যতর কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে একদিকে দশজন নিষ্কর্মা, অথবা অল্লোপার্জক, একজন উপার্জনশীল ও পরিশ্রমী ব্যক্তির গলগ্রহ হইয়া থাকে।" সমগ্র সমাজেরই যেন ইহা অভিশাপ। পাশ্চাত্য সমাজ এইদোষ মুক্ত হইয়া সকলকেই শ্রমশীল ও উদ্যমশীল করিয়াছে। যৌথপ্রথা মধ্যযুগীয় সমাজেরই উপযুক্ত। আধুনিক শিক্ষায় ইহার অবদান আবশ্যকীয়।

সোমপ্রকাশ বিভিন্ন সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সে যুগের আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত করিয়াছে। এই প্রথাগুলি বাংলার পুরাতন বাধাস্বরূপ।

'বাল্যবিবাহ'—আর্থিকক্ষেত্রে ইহার দুইটি অপকার।

১। পুত্রকন্যাদিগের উপার্জনের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না।

২। ব্যয় বৃদ্ধি।

অর্থাৎ স্বল্প শিক্ষায় উপার্জন কম, কিন্তু স্বল্প বয়সে বিবাহে সন্তানের স্রোত হয় অপ্রতিহত এবং ফলে পরিবারে দারিদ্র্য ও অর্থকষ্ট স্বাভাবিক।

ব্যয়বহুল সামাজিক প্রথা,—পুত্র কন্যার বিবাহ, পিতামাতার শ্রাদ্ধ, বিভিন্ন ব্রত ও পূজা অনুষ্ঠান দ্বারা মধ্যযুগীয় মর্যাদা বোধের রক্ষার্থে বহু অর্থ ব্যয় হয়। ফলে অর্থ সঞ্চয়ের দ্বারা মূলধনের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং কোন উদ্যমশীল প্রয়াসে অর্থ নিয়োগ করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের প্রয়াস কমিয়া যায়। সামাজিক মর্যাদাবোধের মিশ্রণের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে সচেতন না হইলে সমাজে ব্যক্তি, পরিবার এবং জাতির বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

চিরবৈধব্য ঃ—ইহার জন্য সমাজে ব্যভিচারের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এই নৈতিক দিক ছাড়া একান্ত বাস্তব আর্থিক দিকটিও অতি জটিল। বহু নিরুপায় বিধবার ভরণপোষণের ভার বহন করিতে আত্মীয়স্বজন হয় আর্থিক দুর্দশার সম্মুখীন।

জাতিভেদ এবং জাত্যাভিমান,

সোমপ্রকাশ লিখিয়াছে, "যদিও ইংরাজী শিক্ষা বহুল প্রচার হওয়াতে ক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমতা হইয়া আসিতেছে এবং অনেক উচ্চজাতির লোক

জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও হীনজাতিদিগের চিরাবলম্বিত অনেক কার্য অবলম্বন করিতেছেন, তথাপি এখনও অনেকে জাত্যাভিমান নিবন্ধন অশেষ কষ্ট ও সাংসারিক অসচ্ছল সহ্য করেন, কিন্তু কষ্ট নিবারণের উপায় থাকিতে নীচ ও হেয় বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।"

ইংরাজী শিক্ষায় পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু তাহা আশানুরূপ নয়, ইহাতেই ক্ষোভ—ইহার সহিত বাঙালীর আর্থিক অবনতির আরও কয়েকটি সামাজিক কারণ ব্যাধির উপসর্গের ন্যায় স্পষ্ট হইয়াছিল। সোমপ্রকাশের এই যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ সেকাল সম্বন্ধে এবং বাঙালী সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদের বিপরীত তথ্যেরই সন্ধান দেয়। প্রচলিত বিশ্বাস ছিল বাঙালী সর্বত্র সম্প্রসারণশীল। কিন্তু সোম-প্রকাশের অভিমত,

"বাঙ্গালী ঘরে পড়িয়া অনাহারে মরিবে, তথাপি বাহিরে যাইয়া আহারান্বেষণ করিবে না।" শিল্পবাণিজ্যে বাঙালীর উদ্যমের অভাবের পথ লইয়া সেকালের সংবাদপত্রও মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। সোমপ্রকাশের মতে এই অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার এক কারণ উদ্যমহীনতা এবং 'ঘরমুখো' স্বভাব।

বিবাহবাধ্যতা, "বাঙ্গালীর বিবাহপ্রিয়তা ও বাধ্যতা বাঙ্গালীর দারিদ্রের প্রধান সহায়।" বাংলা দেশে বহু বিবাহ এবং বাল্য বিবাহের কারণ ইহাই। এবং এই সামাজিক কুপ্রথা স্বাধীন কর্মপ্রবৃত্তি হ্রাস করিয়া দিয়াছে।

কৌলিন্যপ্রথা, ইহা ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণেতর জাতিতেও সম্প্রসারিত হইয়াছিল মর্যাদাবোধ হেতু এবং তাহা হইতে বাঙালী সমাজে পণ প্রথার অবাধ প্রচলন হইতে থাকে। এই সামাজিক নিয়মে বাধ্য হইয়া অনেককে প্রভূত ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে আর্থিক মেরুদণ্ড দুর্বল করিয়াছিল।

জাতিভেদ ও কর্মভেদ, ইহা সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে বাংলাদেশে ক্রমে শিক্ষা প্রসারে হ্রাস পাইতেছিল।

সোমপ্রকাশ গবর্ণমেণ্টের বিদেশপ্রিয়তা, বিজাতীয়তা ও ধর্মান্ধতাকেও বাঙালীর অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য দায়ী করিয়াছে। ইহা অকাট্যযুক্তি। সেকালের শিক্ষিতদের দৃষ্টি ইংরাজের জটিল রাজনীতির সম্বন্ধে স্পষ্ট বিশ্লেষণে সামর্থ্য দিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার দ্রুত প্রসারে আধুনিকতার পূর্ব রূপটি সম্বন্ধে বাঙালীকে সচেতন করিয়া দিয়াছে। হিন্দু কলেজের স্থাপনার যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা সার্থক হইয়াছে। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের প্রসারে দেশের সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন সম্ভব লইয়াছে, সেই বিদ্যায়তন হইতে তথা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে ধর্ম প্রভাব উঠাইয়া লওয়াতে। শিক্ষাকে সর্বজনীন ও আধুনিক করিবার প্রয়াসেই রেনেসার পরিণতি সম্ভব হইয়াছে।

পাদটীকা ঃ

ভূমিকা ঃ

১. Sir Jadunath Sarkar : History of Bengal, Vol-II, Dacca, 2nd Impression, July 1972, p-497.

২. Tapan Kumar Ray Chowdhury : Bengal Under Akbar and Jahangir, Ch. 5 & 6, Calcutta, 1953, p-175.

৩. Ram Krishna Mukherjee : The Rise and Fall of the East India Company, First Indian Edition—1973,p-140.

৪. Dr. B. B. Majumdar : History of Indian Social and Political Ideas, Calcutta, 1967, (Introduction p-1).

৫. রামরাম বসু ঃ লিপিমালা, ভূমিকা, ১৮০২ সালের সংস্করণ।

৬. The English Works of Raja Rammohan Roy, Calcutta,

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

১. Rev. J. Long : The Hand Book of Bengal Mission, p-441, 451, referred by Dr. S. K. De in 'Bengali Literature' p-51, 54-55.

২. Ram Comul Sen : Dictionary in English and Bengali, Serampore, 1834, Introduction.
"In 1774 the Supreme Court was established here, and from this period a knowledge of the English Language appeared to be desirable and necessary".

৩. Ibid.

৪. India Gazette : 20.12.1822.

৫. Rev. J. Long : Hand Book of Bengal Mission, 1848, p. 79-80, 90-92.

৬. কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণ, ১৮১৮-১৯, ১৮১৯ পৃঃ ৪।

৭. কিশোরী চাঁদ মিত্র : 'হিন্দু কলেজ এবং তার প্রতিষ্ঠাতা'-বক্তৃতা, প্যারীচাঁদ মিত্রের ডেভিড হেয়ার জীবনী, ১৮৭৭ গ্রন্থের ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ কলিকাতা। পৃঃ ১৮৭।

৮. Journal of Behar and Orissa Research Society, Vol. XVI, (letter dated 18.5.1816 from E. H. East to J. Harrington), pt. II, p. 154-75.
৯. The Govt. Gazette : 21.2.1831.
১০. Ibid.
১১. Ibid.
১২. Peary Chand Mitra : A Biographical sketch of David Hare, p. 86.
(Quoted from J. Karr : A Review of Public Instructions in the Bengal Presidency, 1 & 2, Cal-1853).
১৩. The Calcutta Christian Observer-June-1832.
১৪. রাজনারায়ণ বসু : বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম সং কলিকাতা, ১২৮৯ সাল, পৃঃ ১৩৯।
১৫. ঐ পৃঃ ১৩৮।
১৬. ঐ পৃঃ ১৪০।
১৭. ঐ পৃঃ ১৪০।
১৮. যোগেশ চন্দ্র বাগল : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, কলিকাতা, ১ম সং, ভাদ্র ১৩৪৮, পৃঃ ৫০।
১৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৩২। সমাচার দর্পণ – ৩-২-১৮২৭ লিখিয়াছে, "১৩ হইতে ১ কেলাস অর্থাৎ পংক্তি পর্য্যন্ত ছাত্রেরা……"।
২০. Asiatic Journal : Nov. 1832 (Asiatic Intelligence) p. 115.
২১. Ibid.
২২. Report of the General Committee of Public Instruction, 1837, p-4.
২৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ১৯-২০।
২৪. রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, কলিকাতা, ২য় সং, কার্ত্তিক ১৩৬৩, পৃঃ ৫৭-৫৮।
২৫. ইণ্ডিয়া গেজেট ১৭-২-১৮৩০।
২৬. যোগীন্দ্রনাথ বসু : মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ১০০-১০১।
২৭. এডুকেশান গেজেট : ২২-৯-১৮৭১, (হিন্দু হিতৈষিণী হইতে উদ্ধৃত)।
২৮. অমৃতবাজার পত্রিকা : ২৯-২-১৮৭২।
২৯. ঐ

৩০. রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, কলিকাতা, ২য় সং, কার্ত্তিক ১৩৬৩ পৃ: ৭৬।
৩১. রাজনারায়ণ বসু : সহাধ্যায়ী পৃ: ৭১।
৩২. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ২য় সং, ১৯৫৭, পৃ: ১১৯।
৩৩. রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত, শৈশব ও তৎকালিক শিক্ষা, কলিকাতা, ৩য় সং, ১৯৫২, পৃ: ৪৫।
৩৪. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সং, ১৯৫৭, পৃ: ৯৯, ১০০।
৩৫. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় : আত্মচরিত, যোগেশচন্দ্র বাগল : উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ১ম, সং, ভাদ্র-১৩৪৮, পৃ: ১০১।
৩৬. Bradly Birt : Poem of H. L. V. Derozio-A Forgotten Anglo-Indian Poet, Introduction, Oxford University Press, 1923.
৩৭. আর্য্যদর্শন : কার্ত্তিক-১২৯১।
৩৮. যোগেশ চন্দ্র বাগল : উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, ১ম সং, ভাদ্র ১৩৪৮, পৃ: ১২৭ ;
৩৯. Peary Chand Mitra : A Biographical Sketch of David Hare, Cal. 1877, p.-27-33.
৪০. রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, কলিকাতা, ২য় সং, কার্ত্তিক ১৩৬৩, পৃ: ৭৬।
৪১. Thomas Edwards : Life of H.L.V. Derozio, (Statement of Harimohan Chattopadhyaya, Clerk, Hindu College).
৪২. India Gazette : 17.2.1830.
৪৩. Bengal Spectator : 1.9.1843.
৪৪. Thomas Edwards : Biography of Henry Derozio, 1884, p.-40.
৪৫. S. C. Sanyal : History of Press in India, Calcutta Review, January 1911, p.-28.
৪৬. India Gazette : 17.2.1830.
৪৭ B. B. Majumdar : History of Indian Social and Political Ideas, Jan.-1961, p-52.
৪৮. Mukherjee's Magazine-1861, p-251.
৪৯. হিন্দু পেট্রিয়ট : ২১-১-১৮৫৮।

৫০. বেঙ্গল স্পেকটেটর : ১-৯-১৮৪২।
৫১. কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কার্যবিবরণীর পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত ডেভিড হেয়ারের চিঠি – তারিখ ১১-১১-১৮২৪।
৫২, সমাচার দর্পন : ১৮-৬-১৮৩১।
৫৩. Proceedings of Calcutta School Society (1818-1831).
৫৪. Ram Gopal Sanyal : A General Biography of Bengal Celebrities, Calcutta-1889.
৫৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৫।
৫৬. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সং, ১৯৫৭, পৃঃ ১৩০-১৩১।
৫৭. হিন্দু পেট্রিয়ট : ২১-১-১৮৫৮।
৫৮. সম্বাদ ভাস্কর : ২৮-২-১৮৫৪
৫৯. ঐ ১৪-১-১৮৫১।
৬০. Ramchandra Ghosh : A Biographical Sketch of Rev. K. M. Banerjee, Calcutta-1893, p.-24-26.
৬১. Proceedings of the Calcutta School Society (1818-1831).
৬২. যোগেশ চন্দ্র বাগল : উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, ১ম সং, ভাদ্র ১৩৪৮, পৃঃ ৭৮।
৬৩. ঐ পৃঃ ৭৯।
৬৪. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সং, ১৯৫৭, পৃঃ ১০৯।
৬৫. বেঙ্গল হরকরা : ১৩-২-১৮৪৩।
৬৬. The Friend of India : 16.2.1843.
৬৭. সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ৭-২-১৮৫১।
৬৮. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সং, ১৯৫৭, পৃঃ ১৩১-১৩২।
৬৯. ইণ্ডিয়া গেজেট : ৫-২-১৮৩০, ৮-২-১৮৩০।
৭০. বেঙ্গল হরকরা : ৯-৩-১৮৪৩।
৭১. গবর্নমেণ্ট গেজেট : ২১-২-১৮৩১।
৭২. ঐ
৭৩. বিনয় ঘোষ : বিদ্রোহী ডিরোজিও, ১ম সং, বাক সাহিত্য, মার্চ-১৯৬১, পৃঃ ৮১।
৭৪. Calcutta Quarterly Magazine and Review, 1833, p.-519.
৭৫. The Calcutta Monthly Journal, 1835, Asiatic News,

p.-170, 171.

৭৬ বেঙ্গল হরকরা : ১৩-২-১৮৪৩।

৭৭. রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত, কলিকাতা, ৩য় সং, ১৯৫২, পৃঃ ১১১।

৭৮. ঐ পৃঃ ১১২।

৭৯. ঐ

৮০. ঐ

৮১. কুমারদেব মুখোপাধ্যায় : ভূদেবচরিত, ১ম ভাগ, কলিকাতা, ভাদ্র ১৩৭৫, পৃঃ ১২, ১৩।

৮২. বিনয় ঘোষ ; সাময়িক পত্রে বাংলা সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী – ১৯৬২, পৃঃ ৪৩১।

৮৩. ঐ

৮৪. সংবাদ প্রভাকর : সম্পাদকীয় ৩১-৫-১৮৫২।

৮৫. ঐ ২-৮-১৮৫২

৮৬. The Bengal Annual-1831.

৮৭ শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সং, ১৯৫৭, পৃঃ ১১৪।

৮৮. ঐ পৃঃ ১১৬।

৮৯. ঐ পৃঃ ১১৫।

৯০. রামগোপাল ঘোষ লিখিত পত্র ৩-৩-১৮৪২ (শিক্ষা সমাজের ১৮৪২-৪৩ রিপোর্ট হইতে গৃহীত)।

৯১. সংবাদ প্রভাকর : ১৮-৪-১৮৪৯।

৯২. সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় : ৭-১২-১৮৬৫।

৯৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সং, ১৯৫৭, পৃঃ ১১৮।

৯৪. আর্য্যদর্শন : কার্তিক ১২৯১।

৯৫. গভর্মেণ্ট গেজেট ১৪-২-১৮৩১।

৯৬. আর্য্যদর্শন : কার্তিক, ১২৯১।

৯৭. সমাচার দর্পণ : ১০-৯-১৮৩১।

৯৮. হিন্দু পেট্রিয়ট : ২৩-৫-১৮৭০।

৯৯. মাসিক পত্রিকা ১লা ভাদ্র ১২৬১ সাল।

১০০. মন্মথ ঘোষ : কর্মবীর কিশোরীচাঁদ, কলিকাতা, ১৩৩৩, পৃঃ ১০৭।

১০১. ঐ

১০২. Presidency College Register, Calcutta-1927 (Radhanath Sikdar).

১০৩. The Hindu Patriot : 23.5.1870.
"He (Radhanath) was particularly fond of Greek and Roman Literature and wrote several articles from Plutarch, Xenophon etc. for the Patrika."

১০৪. The Hindu Patriot : 18. 4. 1864 (Quoted from 'Hills' Magazine of Dehradun).

১০৫. Report of the Operation and Expenditure connected with the Trigonometrical Survey of India, 15.4.1851, p.-18.

১০৬. The Nature : 10.11.1904 (Mount Everest – The Story of a Long Controversy – p.-43).

১০৭. The Hindu Patriot : 18. 4. 1864 (Quoted from 'Hills' Magazine of Dehradun).

১০৮. Ibid : 25.4.1864.

১০৯. Peary Chand Mitra : On the Soul : Its Nature and Development, Introduction, 1881.

১১০. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সং, ১৯১৭, পৃঃ ১৩০।

১১১ প্যারীচাঁদ মিত্র রচনাবলী সং ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মদ খাওয়া বড়দায় জাত থাকার কি উপায়', কলিকাতা, ১৩৭৮, পৃঃ ১৪৩।

১১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চারিত্রপূজা, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃঃ ৮৬, ৮৭।

১১৩ শিবনাথ শাস্ত্রী : আত্মচরিত, ১ম সং, ১৩৫৯, কলিকাতা, পৃঃ ১১৫।

১১৪ ঐ

১১৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চারিত্রপূজা, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃঃ ৯৯।

১১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চারিত্রপূজা, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃঃ ৮৫, ৮৬।

১১৭ তত্ত্ববোধিনী সভার ১৭৬৮ শকের সাম্বৎসরিক আয়ব্যয় স্থিতির নিরূপণ পুস্তক, ভূমিকা, পৃঃ ৩।

১১৮. তত্ত্ববোধিনী সভার ১৭৬৮ শকের সাম্বৎসরিক বিবরণ।

১১৯. Petition regarding Laws enacted to prevent infractions of monopoly of Salt, 1853, signed by Devendranath Tagore, as Secretary.

১২০, Bengal Spectator : 25.4 1843.

১২১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ১২৪-৫।

১২২. বেঙ্গল স্পেকটেটর : ২৫-৪-১৮৪৩।

১২৩. The Proceedings of the Bethun Society, 1859-60.
(Introduction : "In pursuance of a circular issued by Dr. Mouat, Secretary of the College and of the Govt. Council of Education, a meeting of native gentlemen was held in the Theatre of the Medical College on Thursday 11th December, 1851·······After a lengthened conversation, in which Babu Debendranath Tagore, Dr. Chukerbutty, Dr. Sprenger, Rev. J. Long and others took part, it was unanimously resolved that "A Society be established for the consideration and discussion of questions connected with Literature and Science.")

১২৪. First Annual Report of the 'British India Association', para-3.

১২৫. রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত, ৩য় সং, ১২১২, পৃঃ ৪৩, ৪৪ ।

১২৬. ঐ ৪৮ ।

১২৭. ঐ পৃঃ ৪৯ ।

১১৮. Sibnath Shastri : Men I have seen, p.-96.

১২৯. ঐ পৃঃ ৮৪ ।

১৩০. যোগীন্দ্রনাথ বসু : মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত, ৩য় সং, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পত্র উদ্ধৃত, পৃঃ ৬৫৬ ।

১৩১. ঐ, স্বাধীন বা অবাধ বাণিজ্য', পৃঃ ১২২ ।

১৩২. যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর দ্বারা মাইকেল মধুসূদন দত্তকে লিখিত পত্র, সাহিত্য সাধক চরিতমালা-২৩, ৪র্থ সং, ১৩৬২, পৃঃ ৪৬ ।
"I feel sure that my decendents (should I have any) will thus be proud to think that the manuscript in the author's autograph of the first Blank Verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the Poet himself."

১৩৩. সোমপ্রকাশ : ৬-৮-১৮৬০ ।

১৩৪. যোগীন্দ্রনাথ বসু : মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'জীবনচরিত', ৪র্থ সং, পৃঃ ১০০, ১০১ ।

১৩৫. ঐ ১৮৬১ সালে মধুসূদন দত্তের লিখিত রাজনারায়ণ বসুকে পত্র পৃঃ ৪৯০-৯১ ।

১৩৬. ঐ পৃঃ ৪৮৩।

১৩৭. যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ১-১২-১৮৯২ তারিখ গৌরদাস বসাককে লিখিত চিঠি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত : মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ৪র্থ সং, ১৩৬২, পৃঃ ৪৪।

১৩৮. রাজেন্দ্রলাল মিত্র : বিবিধার্থ সংগ্রহ, জুলাই আগষ্ট ১৮৫৯, ৬ষ্ঠ পর্ব্ব, ৬৪ খণ্ড, পৃঃ ৭৯-৮৮।

১৩৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ১৯-২০।

১৪০. এডুকেশন গেজেট ২২-৯-১৮৭১।

১৪১. অমৃত বাজার পত্রিকা : ২৯-২-১৮৭২।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

১. সোমপ্রকাশ : ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫।

২. সমাচার দর্পণ : জানুয়ারী ১৮৩০।

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক, চরিতমালা নং ৬, ৫ম সং, মাঘ ১৩৬২, পৃঃ ১৫।

৪. প্রয়োগ পরিজাতধৃত 'স্মৃতি'।

৫. শিবনাথ শাস্ত্রী ; আত্মচরিত, ১৩৫৯, পৃঃ ৩১-৪০।

৬. রামরাম বসু : লিপিমালা, ১৮০২, ভূমিকা।

৭. ব্রাহ্মসমাজ ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৭৯৭ শকাব্দ, পৃঃ ৪৫।

৮. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত। (পুনর্মুদ্রণ ১৩৬০), পৃঃ ১৩-১৪।

৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য সাধক চরিতমালা-১৬, ৫ম সং, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, পৃঃ ৬১-৬২।

১০. ইণ্ডিয়া গেজেট : ১-১১-১৮৩১।

১১. Rev. Alexander Duff : Indian and Indian Mission, Edin. p.-631-32.

১২. H. J. S. Cotton : India in Transition, London, 1885, p.-15. "The Bengalee Baboos now rule public opinion from Peshawar to Chittagong."

১৩. বিনয় ঘোষ : সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫-৪০।

১৪. সোমপ্রকাশ ১৮৬৮-৬৯।

১৫. যোগেশচন্দ্র বাগল : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, ১ম সং, ভাদ্র ১৩৪৮, পৃঃ ১৩১।

১৬ The Calcutta Courier, Saturday Evening, 20. 12. 1834.

(Quoted from the Bengal Hurkaru).
১৭. Ram Gopal Sanyal : A General Biography of Bengal Celebrities, 1889, Calcutta.
১৮. Education Records, Voll. II, 1839, p.-313.
১৯. দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন চরিত, ১ম সং। পৃঃ ৫৫-৫৬।
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চারিত্রপূজা বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃঃ ২৩।
২১. সমাচার দর্পণ ৭-৩-১৮২৯।
২২. Educational Records, Vol. II, 1839, p.-320.
২৩. P. C. Mitra : The National Magazine – 1908 (Education in Bengal).
২৪. মন্মথ নাথ ঘোষ : কর্মবীর কিশোরী চাঁদ, কলিকাতা ১৩৩৩, পৃঃ ৯৬, ৯৭।
২৫. রাজনারায়ণ বসু : সহাধ্যায়ী, পৃঃ ৬১, ৬২
২৬. K. K. Datta : Dawn of Renascent India, Nagpur, 1950, p.-24.
২৭. বিমলেন্দু কয়াল : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পৃঃ ১২।
২৮. স্কুল সোসাইটিকে ১৮।১১।১৮২৪ তারিখে লিখিত ডেভিড হেয়ারের চিঠি। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কার্যবিবরণীর পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত।
২৯. বেঙ্গল স্পেকটেটর : ১।৮।১৮৪৩।
৩০. The Calcutta Monthly Journal, 1835, Asiatic News – 'Public Library Meeting.'
৩১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সং, ১৩৭৭, পৃঃ ৩৪।
৩২. রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ২য় সং, ১৩৬৩, পৃঃ ৫৭, ৫৮।
৩৩ ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কর্তৃক লর্ড ডালহৌসিকে লিখিত চিঠি ২৯।৩।১৮৫০
৩৪. Calcutta Review, January – June 1849.
৩৫. K. K. Datta : Dawn of Renascent India, Nagpur, 1950, p.-82-83 (Quoted from Calcutta Review – p.-249).
৩৬. Ibid – (Quoted from Adams 3rd Report – p.-300, 305), p.-83, 84.
৩৭. Ibid – (Referred to K. M. Banerjee's Native Female Education) p.-83, 84.
৩৮. সোমপ্রকাশ : ২০।২।১৮৬১।
৩৯. যোগেশ চন্দ্র বাগল : বেথুন সোসাইটি, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬৯, ৪র্থ সংখ্যা।

৪০. বিনয় ঘোষ : বিদ্রোহী ডিরোজিও, কলিকাতা, ১ম সং, মার্চ ১৯৬১, পৃঃ ৯৩।
৪১. বেঙ্গল স্পেক্টেটর : ১।৯।১৮৪৩।
৪২. কুমারদেব মুখোপাধ্যায় : ভুদেব চরিত, ১ম ভাগ, ১৩২৪ সাল, পৃঃ ১২, ১৩।
৪৩. Ibid – p.-1164-5.
৪৪. Hindu Patriot : 18.4.1864.
৪৫. Friend of India : 16.3.1843.
৪৬. Bengal Harukaru : 13.2.1843, 2.3.1843.

Dakshinaranjan Mukhopadhyay attributed the poverty of India to Foreign subjection – "for the gratification of their love of gold, seldom, unhappily actuated by the philanthrophic desire of promoting the welfare of the native races"……'It is undeniable, that if all our forests and mountains were peopled and turned into cities and villages, the internal resources of India are so vast and aboundant, that if the country were governed according to a free and generous policy, it would be found………… capable of affording the inhabitants the means of plentifully supplying themselves with comforts……".

৪৭. Friends of India : 16.2.1843.

The Paper observed :

"It is public opinion and not the fear of legal consequence, which keeps the Bench in England pure. That opinion is wanting here and nothing can supply the absence of it – no penalties, no rewards………The more they (the educated Bengalees) examine the state of courts, the more will they discover, that the remedy of existing evils lies more in hands of the people, than of the government ; that if public opinion in the circle of native society be once enlisted in the side of truth, honesty and justice, the defects cf the Europian functionaries – and they are by no means few – will be little felt. Without this aid, the most strenuous efforts of the most benevolent administration must be comparatively inefficient."

৪৮. বেঙ্গল স্পেকটেটর : ১, ৯, ১৬ এবং ১৭ অক্টোবর ১৮৪৩ সংখ্যাগুলি।

৪৯. জ্ঞানান্বেষণ : ২১।৪।১৮৩৮

৫০. ঐ

৫১. ঐ : ২৬।১।১৮৩৯

৫২. Maurice Dobb : Studies in the Development of Capitalism, Lond. 1947, p.-295.

৫৩. সোমপ্রকাশ, ৩৭ সংখ্যা। সম্পাদকীয়, ৬ শ্রাবণ, ১২৭৫ সাল।

৫৪. Bengal Harald : 13.6.1829.

৫৫. The Calcutta Monthly·Journal, 1835, Asiatic News, p.-43, and The Bengal Hurkaru.

৫৬. Ibid : p.-170-171.

৫৭. Ibid.

৫৮. বিনয় ঘোষ : বিদ্রোহী ডিরোজিও, বাক্‌সাহিত্য, ১ম সং, ১৯৬১, পৃঃ ২৬।

৫৯. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সং, ১৯৫৭, পৃঃ ৯৯-১০০।

৬০. সমাচার দর্পণ : ১৭।১০।১৮১৯

৬১. ঐ ২১।১।১৮৩৯

৬২. বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ : ১ম ভাগ, ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৭১, পৃঃ ৭১।

৬৩. ঐ

৬৪. ক্যালকাটা জার্নাল : ১৮।৫।১৮১৯

৬৫. বেঙ্গল স্পেকটেটর : এপ্রিল ১৮৪২

৬৬. Dr. B. B. Mazumdar : History of Indian Social and Political Ideas, Book Land Pvt. Ltd., Jan. 1967, p.-13.

৬৭. Pandita Ramabai : The High Caste Hindu Woman, 1887, ed., p.-116.

৬৮. Widow Remarriage Papers, M. S. Records, National Archives of India—Letter dated, Fort William, 24.7.1837, from R. Macan to G. P. Grant.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

১। যোগেশ চন্দ্র বাগল : সাহিত্য সাধক চরিতমালা-২০, ৫ম সং, ১৩৬১, পৃঃ ১৭।

২. J. A. Richy : Selections From Educational Records, Part II, (1840-59) p.-52-62.

৩. Raja Radhakant Deb Bahadur, K.C.S.I.—A Brief Account

of His Life and Character – 1880, p.-53.

৪. Radhakant Deb's letter dated 6.7.1831, to Hiadu College Headmaster, Mr. G. T. F. Speed. Raja Radhakant Deb particularly wrote :–

"Allow me therefore to recommend that you should pay strict attention equally to study and morals of the Hindoo students and adhere to the rules and regulations passed to the effect and be careful to check any evils similar to those for which one of the teachers was recently removed……"

৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ১৮, ষষ্ঠ সং, ১৩৭৭, পৃঃ ১৭।

৬. সমাচার চন্দ্রিকা : ২৬।৪।১৮৩১।

৭. ১৮৪০-সালের শিক্ষা বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট, পৃঃ ১১৫।

৮. William Adam : Reports on the State of Education in Bengal (1835 & 1338) edited by Anath Nath Basu, Calcutta University – 1941, p.-429.

৯. ক্যালকাটা রিভিউ : ১৮৪৬, খণ্ড ৫, সং ৯, পৃঃ ৮৬-১২৩।

১০. ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া : ৫।৬।১৮৫১

১১. Report of the Indian Education Commission, 1882, p.-122-3.

১২. Parliamentary Papers, First Report of the Select Commitee of the House of Commons (1253), App. no. 7, p.-510-11.

১৩. সংবাদ প্রভাকর : ১৭।৭।১৮৫৩

১৪. সমাচার দর্পণ : ৭।৩।১৮২৯

১৫. University of Calcutta Minutes for the year – 1857, p.-65.

১৬. ঐ পৃঃ ১২৪।

১৭. সোমপ্রকাশ : ১৪।৪।১৮৬২।

১৮. সমাবর্তন ভাষণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫।৩।১৮৮৪

১৯. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাল্যকথা, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ গ্রন্থমালা ৪, ২য় সং, ১৯৬৭, পৃঃ ৫।

২০. ঐ ২।৭।১৮৬৪ তারিখের চিঠি। পৃঃ ৫৮।

২১. ঐ : আমার বাল্যকথা, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থমালা ৪, ২য় সং, ১৯৬৭, পৃঃ ৬।

২২. সৌদামিনী দেবী : পিতৃস্মৃতি, প্রবাসী, ফাল্গুন-১৩১৮।

২৩. সোমপ্রকাশ : ৪র্থ সংখ্যা, ২৪ অগ্রহায়ণ-১৮২০ সাল।

শব্দসূচি